শুধু হাসির গল্প

বিশ্বনাথ দে

সম্পাদিত

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ
৭ই আশ্বিন
১৮৮১ শকাব্দ

পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর সেন
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস
৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

ছোটদের জন্য যাঁরা
হাসির গল্প লিখেছেন
লিখছেন ও লিখবেন
তাঁদের উদ্দেশে।

এই প্রসঙ্গে

ছোটদের বইতে ভূমিকার অছিলায় একটি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখার পক্ষপাতি আমি নই। তবু, এ সংকলনের সম্পাদক হিসাবে আমার কিছু বক্তব্য থাকা স্বাভাবিক এবং একটি কৈফিয়ত থাকা উচিত মনে করেই কিছু না লেখার থেকে বিরত হলাম। যদিও জানি, এ বইতে, বিশেষতঃ এই পৃষ্ঠা কটিই ছোটদের অনাদরণীয় হবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমার যা বক্তব্য তা হলো আলোচ্য সংকলনের পাঠক ও তার বয়ক্রমের পরিমাপ সম্পর্কে। এ বই ছোটদের বই বললেই সব বলা হয়ে গেল এ কথা মনে করা খুবই অহেতুক হবে। কারণ, এর বিষয়বস্তু ও রচনারীতিকে সমষ্টিগত ভাবে 'শিশু সাহিত্য' শিরোনামা পর্যায়ভুক্ত করা গেলেও, আরো অনেক কিছুই ব্যক্ত করার আছে।

শিশুর বয়স অনুসারে শিশু সাহিত্যের রঙ বদল হয় ক্ষণে ক্ষণে। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নতর আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও রচনারীতির প্রয়োজন হয়। শৈশবের প্রথম স্তরে শিশুমনে আসন জুড়ে থাকে সেই চিরউজ্জ্বল ঘুমপাড়ানি গান ও ছড়ার সমষ্টি—যার সুরে সুরে অণুরণনে শিশু একসময়ে ধ্বনি মাধুর্যের সঙ্গে পরিচিত হতে সক্ষম হয়। ছন্দ, মিল ও অনুপ্রাসে ঘেরা এই শিশুসাহিত্য—যার পাঠক সে হতে পারেনা, হয় শ্রোতা—এর মেয়াদ অবিলম্বিত। একই শিশু শ্রোতা থেকে উন্নীত হয় পাঠকে। ঘুমপাড়ানি গান ও ছেলেভুলানো ছড়ার আওতা পেরিয়ে এসে সেই শিশুই আবৃত্তি করে খেলার ছড়া। কিন্তু এই কাব্যজাতীয় ছন্দোবন্ধ রচনার পরেই আসে পুরোপুরি গল্পের যুগ। অবোধতার সিঁড়ি ডিঙিয়ে এলেও গল্পের প্রথম-স্তরে শিশু মনে থাকে একটি কল্পনার বিস্তৃত তেপান্তর। যেখানে ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানো আর রাজপুত্র-রাজকন্যা-ডাইনি-রাক্ষসির অবাধ পদসঞ্চার।

ছোটদের গল্পে বাস্তব অবাস্তবের ভেদ না থাকা স্বাভাবিক। কারণ, শিশুমন স্বভাবতই হবে কল্পনাপ্রবণ। অসম্ভবকে অসম্ভব ও আজগুবিকে আজগুবি মনে না করতে পারাটাই শৈশবের প্রধান আকুতি। আর এই গল্প শাখাই নানা ভঙ্গিমায় কালক্রমে শিশুকে কৈশোরে উত্তীর্ণ করে এনে মুষ্টিমেয় যে কয়টি উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে—তারই একটি উজ্জ্বলতর শাখা হলো—হাসির গল্প।

আলোচ্য সংকলনখানিও হাসির গল্পের; এবং যাদের হৃদয়, মন, শিক্ষা ও চিন্তা-ধারা কৈশোরের শেষ সীমানায় উপস্থাপিত, তাদের উপলক্ষ্য করেই এর গঠন। সুতরাং এ বইকে চিরাচরিত প্রথায় শিশুসাহিত্যগ্রন্থ রূপে অভিহিত করা গেলেও,

প্রকৃতপক্ষে একে কিশোর সাহিত্য বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে মনে করতে পারি।

হাসির গল্প কথাটি শুনতে খুব সহজ মনে হলেও, লেখা অত্যন্ত কঠিন। ছোটদের মুখে হাসি ফোটাবার কলা-কৌশল সকলের আয়ত্বাধীনে থাকে না। কারণ, হাসির গল্পের জাত আলাদা, তার প্রকাশভঙ্গীও ভিন্নতর। হাসির গল্পে হাস্যকর বিষয়বস্তু যেমন থাকা প্রয়োজন—গল্পবস্তু থাকার প্রয়োজনও তার থেকে কিছু কম নয়। এই দুটি সংগুণের সমন্বয় ঘটলেই একটি সার্থক হাসির গল্প জন্মলাভ করতে পারে।

এখন কথা হলো, ছোটদের জন্য সেই সার্থক হাসির গল্প লিখিয়ে আমাদের দেশে কবে, কখন আবির্ভূত হন সে প্রশ্ন যদি কেউ করেন তাহলে আমি সুকুমার রায়ের নামই সর্বাগ্রে করতে পারি। কারণ, কখনো-সখনো কোথাওনা-কোথাও একটি দুটি ভালো হাসির গল্পের রচনাকার হয়তো সুকুমার রায়ের পূর্বেও উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু ছোটদের গল্পে (কবিতার কথা এক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হলো) শুধুমাত্র সুপাচ্য হাস্যরস বিতরণে প্রযত্নবান—এমন মানুষ সুকুমার রায়ের পূর্বে সুবিরল ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না।

এক কথায়, সুকুমার রায়কে আমি বাংলা শিশু সাহিত্যের হাস্যরসাত্মক শাখার পথিকৃৎ বলে অভিহিত করতে পারি।

কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে এ সংকলনের শুরু বঙ্কিমচন্দ্রে হলো কেন—এ প্রশ্ন চিন্তাশীল সমালোচক ও সাহিত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে জাগরিত হওয়া খুব ন্যায়সঙ্গত হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যুগন্ধর সাহিত্যস্রষ্ঠা হলেও শিশু সাহিত্যিক নন। ছোটদের জন্য কিছু লেখার কথা তাঁর অচিন্তনীয় ছিল কি না, সে গবেষণায় প্রলিপ্ত হবার বাসনা আমার নেই। তবে এটুকু অবশ্যই বলা যেতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র ছোটদের জন্য পৃথক ভাবে কিছু না লিখলেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে কোথাও কোথাও ছোটদের প্রণিধানযোগ্য অংশ ছড়িয়ে রয়েছে। আর ঠিক সেইরকম একটি উজ্জ্বল অংশ তাঁর লোক রহস্যের গ্রাম্য কথা পর্যায়ের লেখা থেকে পৃথক করে এই সংকলনের শীর্ষ মুকুটরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই নন, মনোযোগী পাঠক আলোচ্য সংকলনের লেখক-সূচীর দিকে এক নজর তাকালেই এমন কয়েকজনের নাম এখানে দেখতে পাবেন—যাঁরা মূলতঃ শিশুপাঠ্য সাহিত্যের রচনাকার না হয়েও একটি দুটি রসোত্তীর্ণ হাসির গল্প রচনায় পারঙ্গম হয়েছেন।

শিশু-সাহিত্যের রচনাকার যে শুধু শিশু-সাহিত্যিকরাই হবেন—একথা আমার অযৌক্তিক মনে হয়েছে। তাই ছোটদের দিকে তাকিয়ে রচিত না হলেও ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রভাতকুমারের গল্প দুটি এ সংকলনে সংযোজিত করতে পেরেছি শেষ পর্যন্ত। চীনে ভূতের কাটা হাত ফেরত নিতে আসা ও অবশেষে হাত ফিরে পেয়ে পৌষ-পার্বণের রাত্রে পিঠে খাওয়ার মধ্যে একটি নতুনতর বিষয়বস্তু এ সংকলনের পাঠক লক্ষ্য করবেন, আবার 'আই ডোণ্ট নো' কথাটির যথার্থ মানে করতে

গিয়ে একজন গ্রাম্য শিক্ষকের জীবনে যে ট্র্যাজেডি শেষ পর্যন্ত এসেছিল, তাও যে কোনো বয়সের পাঠকের মনে রেখাপাত করতে পারবে গভীর হাস্যরসের মাধ্যমে।

সুকুমার রায়কে বাংলা শিশু-সাহিত্যের হাস্যরসাত্মক শাখার পথিকৃৎ রূপে ধরে নিলেও, এ কথা বলা যায় যে তাঁর পূর্ববর্তী ছোটদের গল্প লিখিয়েরাও উল্লেখযোগ্য হাসির গল্প ক্বচিৎ লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লক্ষ্মীনারাণকে স্মরণ করা যেতে পারে—যে, দই দুয়ে আনবে বলে আগেভাগেই গরুকে তেঁতুল খাইয়ে রাখে, কিম্বা উপেন্দ্রকিশোরের পাড়াগেঁয়ে ফলারে বামুন—যে একদা পাকা বাড়িকে পাকাফলার মনে করে কঠিন নিরেট দেওয়ালেই কামড় দেবার চেষ্টা করেছিল।

হাসির গল্প যে কোনো বিষয় নিয়েই যে সার্থকতার সীমানায় পৌঁছতে পারে এমন নজির এ সংকলনে সুপ্রচুর। অবনীন্দ্রনাথের ভোম্বলদাসকে, শিয়াল পণ্ডিতের বোকা বানানোর মধ্যে যে হাস্যরস প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, ঠিক সেই বস্তুরই সাক্ষাৎ মিলবে ললিতমোহনের 'রামায়ণ গানে' কিম্বা সরলাবালার 'খট্টাঙ্গ পুরাণে', শরৎচন্দ্রের দুরন্ত ছেলে লালুর গল্পে অথবা হেমেন্দ্রপ্রসাদের 'আবু করিমের চটী-জুতা'য়—একজোড়া জুতার জন্য যে বেচারী আবুর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

এ সবই সুকুমার রায়ের পূর্ববর্তী রচনাকারদের কথা— যাঁরা কেউই শুধু হাসির গল্পের লেখক হিসাবে তাদের সৃষ্ট শিশু-সাহিত্যকে একটি বিশেষ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করে তুলতে পারেননি সুকুমার রায়ের মত, যদিও এঁরাই একসময় ছিলেন শিশুচিত্তের যথার্থ প্রতিপালক। এবং এঁদের মধ্যে অঙ্গুলিমেয় কয়েকজনের গ্রন্থাদি তো আজও জুড়ি-যুক্ত হতে পারেনি। কারণ সে সব রচনা সাম্প্রতিক কালে ক্লাসিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আজকাল নতুনতর বিষয়বস্তুর সহায়তায় হাসির গল্প লেখা হচ্ছে। শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত হাসির গল্পের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের অবাধ গতিবিধি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে প্রেমেন্দ্র মিত্র বিরচিত 'ঘনাদা' পর্যায়ের গল্পগুলিতে। ছোটদের হাসির গল্পের সবচেয়ে আধুনিক রূপ প্রেমেন্দ্র মিত্রই দিতে পেরেছেন—তাঁর এই পর্যায়ের লেখাগুলির মাধ্যমে (যদিও আলোচ্য সংকলনে তাঁর রূপকথা আশ্রিত একটি ব্যঙ্গ রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। ভিন্নতর বিষয় বস্তুতে রচিত হাসির গল্পের এটিও একটি সার্থক নিদর্শন)।

আর লিখেছেন লীলা মজুমদার—যাঁর লেখায় বিষয়গত বৈচিত্র্য বেশী প্রকট হয়ে না উঠলেও গল্প শোনানোর অভিনবত্ব লক্ষ্য করা সহজ।

এ সংকলনের আরো দুটি লেখার নাম উল্লেখ করা আমার একান্ত কর্তব্য। একটি পরিমল গোস্বামীর 'চেনা অচেনা' ও অন্যটি বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'। গল্পদুটিকে সরল হাসির গল্প না বলে যদি ব্যঙ্গ গল্প বলি তবেই

বোধহয় ঠিক বলা হবে। পরিমল গোস্বামীর গল্পের বিষয়বস্তু হলো দু জন অভিন্নহৃদয় 'পেন ফ্রেণ্ড' যারা কোনদিন পরস্পর সাক্ষাৎ করার সুযোগ পায় না কিন্তু ট্রেনের কামড়ায় যখন দু জনের দেখা হলো তখন ঝগড়া ছাড়া আর কিছুই হলো না এবং বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন একটি আধুনিক ধনী পরিবারের কথা— যাঁরা বই কেনেন শুধু ড্রইং রুমের শোভা বৃদ্ধির জন্য—পড়বার জন্য নয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী গল্পটি,—আমার ধারণা শুধু ছোটদেরই নয়—বাংলা সহিত্যে একটি সার্থক ব্যঙ্গ রচনা হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য।

আধুনিককালে ছোটদের হাসির গল্প রচনাকারদের মধ্যে যাঁর গতি অপ্রতিহত, তিনি হলেন শিবরাম চক্রবর্তী। হাসির গল্প, বিশেষতঃ ছোটদের হাসির গল্পকে নিয়ে তাঁর মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কেউই করেন নি। শিবরাম চক্রবর্তীর লেখার চরিত্রগত বিশেষত্ব হলো প্যানিং। এক্ষেত্রে তিনটি শব্দকে আশ্রয় করে আশ্চর্য ভাবে একটি রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প তিনি তৈরি করেছেন। ছোটদের হাসির গল্প রচয়িতার এ গুণ ইতিপূর্বে বাংলা দেশে আর কারো ছিল না এবং বর্তমানে শিবরাম চক্রবর্তী ছাড়া আর কারো নেইও।

আধুনিক কালে চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটদের জন্য প্রধানতঃ হাসির গল্পই লিখেছেন. ছোটদের মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টাই তাঁরা করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হতেও পেরেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে এ সংকলনের ছেদ টানা হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, এর পরেও কিছু লেখক ছোটদের জন্য সার্থক হাসির গল্প লিখেছেন এবং পরবর্তী সংস্করণে তাঁদের সে লেখা সন্নিবেশিত করার বাসনাও আমার আছে। একথা যেন কেউ মনে না করেন যে, বর্তমান সংকলনে যাঁদের লেখা আছে তাঁরাই কেবল ছোটদের হাসির গল্প লিখেছেন। এ'রা ছাড়াও ছোটদের হাসির গল্পের রচয়িতা আছেন এবং তাঁদের লেখা সংযোজিত না হওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আমার অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়েছে একথা মনে করার কোন কারণ নেই।

এ সংকলন সম্পাদনা কার্যে আমার বহু হিতাকাঙ্খী বন্ধু সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ রাণা বসু, কল্যাণ ভট্টাচার্য, মৃণাল দত্ত, মাধবী মুখোপাধ্যায়, শ্যামল দত্ত ও পারমিতা সেনের নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য বলে মনে করছি। এই বিষয়ে চিত্তজিৎ দের কাছেও আমি ঋণী।

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স এর শ্রীসুপ্রিয় সরকার 'মৌচাকে'র পুরানো ফাইল ও প্রচুর বই দিয়ে লেখা সংগ্রহের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন; তাঁকে এবং এ সংকলনে লেখা প্রকাশ করার অনুমতি দানের জন্য লেখক ও লেখার স্বত্বাধিকারী-দের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গল্প দুটির জন্য

বিশ্বভারতী ও শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি অনুগৃহিত। ললিতমোহন ভট্টাচার্যের লেখাটি তাঁর পুত্র স্বর্গত অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের কাছে পেয়েছিলাম। বইখানি তিনি দেখে যেতে পারলেন না এই যা দুঃখের।

পরিশেষে আর একটি কথা—যা সব প্রথমের। একটি হাসির গল্প-সংকলকের গুরুদায়িত্ব আমার দ্বারা পালিত হবে, এ কথা যিনি মনে করেছিলেন—তিনি হলেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়—যাঁকে কোন ভাষাগত কৃতজ্ঞতা জানাবার বাসনা আমার নেই, কারণ কৃতজ্ঞতা জানাবার মত সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে আমার নয়।

শুধু একটি সংশয় আছে, তাঁর দেওয়া সেই গুরুদায়িত্ব আমি সত্যিই খুব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পেরেছি কি ?

—বিশ্বনাথ দে

সূচীপত্র

ভূ ধাতু

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; আমি ছাতি মাথায়, গ্রাম্য পথ দিয়া হাঁটিতেছি। বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিল। তখন পথের ধারে একখানি আটচালা দেখিয়া, তাহার পরচালার নিচে আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, ভিতরে কতকগুলি ছেলে বই হাতে বসিয়া পড়িতেছে। একজন পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পড়াইতেছেন। কান পাতিয়া একটু পড়ানটা শুনিলাম। দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ।

পণ্ডিত মহাশয় একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল দেখি, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কি হয়?'

ছাত্রটি কিছু মোটাবুদ্ধি, নাম শুনিলাম, 'ভোঁদা।'

ভোঁদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, 'আজ্ঞে ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভুক্ত হয়।'

পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের মূর্খতা দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে 'মূর্খ' 'গর্দভ' প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত বাক্যে অসংস্কৃত করিলেন।

ছাত্রও কিছু গরম হইয়া উঠিল, বলিল, 'কেন পণ্ডিত মহাশয়! ভুক্ত শব্দ কি নাই?'

পণ্ডিত। থাকিবে না কেন? ভুক্ত কিসে হয় তা কি জানিস্ না?

ছাত্র। তা জানিব না কেন? ভাল করিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিলেই ভুক্ত হয়।

পণ্ডিত। বেল্লিক! বানর! তাই কি জিজ্ঞাসা করছি?

তখন ভোঁদার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহার পার্শ্ববর্তী ছাত্র রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাম, তুমিই বল দেখি, ভুক্ত শব্দ কি প্রকারে হয়?'

রাম বলিল, 'আজ্ঞে, ভুজ ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া ভুক্ত হয়।'

পণ্ডিত মহাশয় ভোঁদাকে বলিলেন, 'শুনলি রে ভোঁদা, তোর কিছু হবে না।'

ভোঁদা রাগিয়া বলিল, 'না হয় না হোক্—আপনার যেমন পক্ষপাত।'

পণ্ডিত। পক্ষপাত আবার কি রে হনুমান!

ভোঁদা। ওর কপালে 'ভুজো', আমার কপালে ভূ?

পণ্ডিত মহাশয় রাগ করিয়া ভোঁদাকে এক ঘা প্রহার করিলেন, এবং আদেশ করিলেন, 'এখন বল্ ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি হয়?'

ভোঁদা। আজ্ঞে তা জানি না।

পণ্ডিত। জানিস্ নে? ভূত কিসে হয় জানিস্ নে?

ভোঁদা। আজ্ঞে তা জানি। মলেই ভূত হয়।

পণ্ডিত। শুওর! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত ক'রে ভূত হয়।

ভোঁদা এতক্ষণে বুঝিল। মনে মনে স্থির করিল, মরিলেও যা হয়, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলেও তা হয়। তখন সে বিনীত ভাবে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি শ্রাদ্ধ করিতে হয়?'

পণ্ডিত মহাশয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বিরাশী সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন।

ছাত্র পুস্তকাদি ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি চলিয়া গেল।

তখন বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ভোঁদার মাতার গৃহ বিদ্যালয় হইতে বড় বেশী দূর নয়। ভোঁদা গৃহপ্রবেশ কালে কান্নার স্বর দ্বিগুণ বাড়াইল, এবং আছাড়িয়া পড়িল। দেখিয়া ভোঁদার মা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে, বাবা?'

ছেলে বলিল, 'এখন কি হয়েছে বাবা! এমন ইস্কুলে আমাকে পাঠিয়েছিলে কেন?'

মা। কেন, কি হয়েছে বাবা?

ছেলে। এখন বলেন, কি হয়েছে বাবা! শিগ্‌গির তোমার ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক। আমি শ্রাদ্ধ করি।

মা। সে আবার কাকে বলে?

ছেলে। শিগ্‌গির তোমার ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক। শিগ্‌গির হোক।

মা। সে কি মরাকে বলে?

ছেলে। তা না তো কি? আমি তাই বলতে পারি নাই বলে পণ্ডিত মশাই আমায় মেরেছে।

মা। আমার এই একরত্তি ছেলের আর কত বিদ্যে হবে! যে কথা কেউ জানে না, তাই বলতে পারেনি বলে ছেলেকে মারে? আজ আমি একবার দেখবো।

এই বলিয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মা পণ্ডিত মহাশয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন। আমিও পিছু পিছু চলিলাম।

অধিক দূর যাইতে হইল না। তখন পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যেই উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। তখন ভোঁদার মা বলিল, 'হ্যাঁগো পণ্ডিত মহাশয়, যা কেউ জানে না আমার ছেলে তাই বলতে পারেনি ব'লে কি এমনি মার মারতে হয়?'

পণ্ডিত। ওগো এমন কিছু শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কেবল জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলাম ভূত কেমন ক'রে হয়।

ভোঁদার মা। ভূত হয় গঙ্গা না পেলেই। তা ওসব কথা ও ছেলেমানুষ কেমন ক'রে জান্‌বে গা? ওসব আমাদের জিজ্ঞাসা কর।

পণ্ডিত। ওগো সে ভূত নয়।

ভোঁদার মা। তবে কি গো ভূত?

পণ্ডিত। সে সব কিছু নয় গো, তুমি মেয়েমানুষ কি বুঝবে? বলি একটা ভূত শব্দ আছে।

ভোঁদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনেছি। তা ও ছেলেমানুষ, ওকে কি ওসব কথা বলে ভয় দেখাতে আছে?

আমি দেখিলাম যে, এ পণ্ডিতে পণ্ডিতে সমস্যা, শীঘ্র মিটিবে না। আমি এ রঙ্গের অংশ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, 'মহাশয় ও স্ত্রীলোক, ওর সঙ্গে বিচার ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে বরং এ বিষয়ের কিছু বিচার করুন।'

পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া, একটু সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, 'আপনি প্রশ্ন করুন।'

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, ভূত ভূত করিতেছেন, বলুন দেখি ভূত কয়টি?'

পণ্ডিত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ভাল, ভাল। পণ্ডিতে পণ্ডিতের মতই কথা কয়।'

তারপর আমার দিকে ফিরিয়া এমনই মুখখানা করিলেন, যেন বিদ্যার বোঝা নামাইতেছেন। বলিলেন, 'ভূত পাঁচটি।'

তখন ভোঁদার মা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, 'তবে রে, এই বিদ্যায় আমার ছেলে মারিস্! ভূত পাঁচটা! পাঁচ ভূত না বারো ভূত?'

পণ্ডিত। সে কি বাছা! ও ঠাকুরটিকে জিজ্ঞাসা কর, ভূত পঞ্চ।

ভোঁদার মা। বারো ভূত নয় তো আমার এতটা বিষয় খেলে কে? আমি কি এমনই দুঃখী ছিলাম?

ভোঁদার মা তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তখন তাহার পক্ষাবলম্বন পূর্বক বলিলাম, 'উনি যা বলিলেন, তা হইতে পারে। অনেক সময় শুনা যায়, অনেকের বিষয় লইয়া ভূতগণ আপনাদিগের পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করে। কখন শোনেন নাই, অমুকের টাকাটায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতেছে?'

কথাটা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, আমি ব্যঙ্গ করিতেছি, কি সত্য বলিতেছি। কেননা বুদ্ধিটা একটু স্থূল। তাঁকে একটু ডেকাপনা দেখিয়া আমি বলিলাম, 'মহাশয় ও বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ ত সকলই

অবগত আছেন। মনু বলিয়াছেন—

'কৃপণানাং ধনঞ্চৈব পোষ্যকুষ্মাণ্ডপালিনাং
ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ।' *

পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃত জ্ঞান ঐ ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত পর্যন্ত। কিন্তু এদিকে বড় ভয়, পাছে সেই শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে, বিশেষতঃ ভোঁদার মার সম্মুখে আমার কাছে পরাস্ত হয়েন—অতএব যেমন শুনিলেন, 'ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ'—অমনই উত্তর করিলেন, 'মহাশয় যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন। বেদেই ত আছে, 'অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলী তরুঃ।'

শুনিয়া ভোঁদার মা বড় তৃপ্ত হইল। পণ্ডিত মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিল, 'তা বাবা। তোমায় এত বিদ্যা, তবু আমার ছেলেকে মার কেন?'

পণ্ডিত। আরে তোর ছেলেকে এমনই বিদ্বান করিব বলিয়াই ত মারি! না মারিলে কি বিদ্যা হয়?

ভোঁদার মা। বাবা! মারিলে যদি বিদ্যা হয়, তবে আমার বাড়ির কর্তাটির কিছু হল না কেন? ঝাঁটাই বল, কোঁস্তাই বল, আমি ত কিছুতেই কসুর করি না!

পণ্ডিত। বাছা, ওসব কি তোমাদের হাতে হয়? ও আমাদের হাতে।

ভোঁদার মা। বাবা! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসুর নাই। দেখবে?

এই বলিয়া ভোঁদার মা একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয়, এইরূপ হঠাৎ অধিক বিদ্যালাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, সেখান হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। শুনিয়াছি, সেই অবধি পণ্ডিত মহাশয় আর ভোঁদাকে কিছু বলেন নাই। ভূ ধাতু লইয়া পাঠশালায় আর গোলযোগ হয় নাই।

ভোঁদা বলে, 'মা এক বাঁকারিতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূত ছাড়া করিয়াছে।'

* কৃপণদিগের ধন আর যাঁহারা পোষ্যপুত্ররূপ কুষ্মাণ্ডগুলি প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগের ধন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

পিঠে পার্বণে চীনে ভূত

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

রাধামাধব গুপ্ত তাঁহার মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মাতুল ব্রহ্মদেশে কোন স্থানের ডাক্তার ছিলেন। অস্ত্র চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। বৃদ্ধ-বয়সে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি দেশে আসিয়াছেন। দেশে আসিয়া প্রথমে তিনি তীর্থদর্শন করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। এখন কলিকাতায় আসিয়া বাসা করিয়াছেন। রাধামাধব সেই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

রাধামাধব নিজেও পাস করা ডাক্তার। কলিকাতায় নহে, অন্য স্থানে তিনি ডাক্তারী করেন। মাতুল মাতুলানীকে তিনি প্রণাম করিলেন। দেখিলেন যে, মাতুল মাতুলানী দুইজনেরই শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখে যেন কালি মারিয়া দিয়াছে। দুই জনেই সর্বদা অতি বিমর্ষভাবে থাকেন। মনে মনে যেন সর্বদাই কিরূপ একটা ভয়—কিরূপ একটা দুশ্চিন্তা। রাধামাধব আরও দেখিলেন যে, তাঁহার মাতুলের মস্তকটি মুণ্ডিত, মাথায় চুল নাই।

তিনি মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বর্মায় আপনি যে স্থানে ছিলেন, সে স্থানের জলবায়ু কি ভাল ছিল না? আপনারা দুই জনেই অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। দেখিলে বোধহয়, যেন আপনাদের শরীরে কোন একটা রোগ আছে।'

মাতুল উত্তর করিলেন—'না আমাদের শরীরে কোন রোগ নাই।' তিনি কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন।

পরদিন মামা জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাধামাধব, তুমি যে স্থানে ডাক্তারী কর, সে স্থানে দু'পয়সা হয় তো?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'প্রথম প্রথম বেশ দু'পয়সা হইত। তারপর কোথা হইতে সে স্থানে এক অবতার উপস্থিত হইল, সে অবধি আমার আর বড় কিছু হয় না।'

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন—'অবতার কিরূপ?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'গেরুয়া কাপড় পরা একটা লোক। সেও চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। রোগীকে কখনও ডাক্তারী, কখনও হোমিওপ্যাথি, কখন কবিরাজি, কখন হাকিমি, কখন স্বপ্নলব্ধ ভৌতিক ঔষধ প্রদান করে। রোগীর নিকট ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী, কুণ্ডলিনী প্রভৃতি নানা বিষয়ে গল্প করিয়া সে বলে যে—'আমি ভূত নামাইতে পারি, মৃত ব্যক্তির

আত্মাকে ডাকিতে পারি।' যে পর্যন্ত এই অবতারটি সে স্থানে আসিয়াছে, সেই অবধি আমার পসার প্রতিপত্তি একেবারে গিয়াছে।'

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন—'সে লোকটা ভূত প্রেত সম্বন্ধে যে সমুদয় গল্প করে, তাহা কি মিথ্যা?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—' সমুদয় মিথ্যা। ভূত আবার কোথায়? ভূত বলিয়া জগতে কোনরূপ বস্তু নাই।'

মাতুল বলিলেন—'বটে! যদি দেখিতে পাও?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'ভূত দেখিবার নিমিত্ত রাত্রিকালে একলা শ্মশানে মশানে অনেক ঘুরিয়াছি। একদিন দুইদিন নয়, তিন বৎসর কাল এরূপ চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ভূতের চিহ্নমাত্রও আমি দেখিতে পাই নাই। ভূতের গল্প সব অলীক। ভূত বলিয়া জগতে কিছুই নাই।'

মাতুল বলিলেন—'যদি প্রত্যক্ষ তোমাকে দেখাইতে পারি?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'তাহা হইলে আপনার নিকট আমি চিরঋণী হইয়া থাকিব। পরকালের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই। যদি ভূত দেখিতে পাই, তাহা হইলে পরকাল সম্বন্ধে আমার মনের সন্দেহ দূর হয়।'

মাতুল বলিলেন—'না তুমি ছেলেমানুষ, তাই ওরূপ কথা বলিতেছ! কাজ নাই, শেষে একটি বিপদ ঘটিবে।'

রাধামাধব মাতুলকে জোর করিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন—'যদি যথার্থই আপনি আমাকে ভূত দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে দেখাইতেই হইবে। আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না। আপনার কোন ভয় নাই। আমার মন বিচলিত হইবে না।'

মামা ভাগিনেয়তে যখন এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মাতুল যখন দেখিলেন যে, রাধামাধব তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না, তখন তিনি বলিলেন—'তবে আমার সঙ্গে এস।'

রাধামাধবকে লইয়া মাতুল বড় একটা ঘরের দ্বারে গিয়া তালা খুলিলেন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাধামাধব দেখিলেন যে দেয়ালের গায়ে দুই দিকে কাঠের আলমারি আছে। আলমারিতে দুই স্তর কাঠের সেলফ্, আর তাহার উপর অনেকগুলি ছোট বড় শিশি রহিয়াছে। কোন শিশিতে মানুষের পা, কোনটিতে চক্ষু, কোনটিতে পাথুরী, কোনটিতে অস্থি, মনুষ্যদেহের নানারূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে।

মাতুল বলিলেন—'এ আমার বাই। আমি নিজহাতে যত কিছু কাটিয়াছি কুটিয়াছি, তাহা স্পিরিটে রাখিয়া দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আরও অনেক অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ ছিল। আমার বাড়িতে একবার আগুন লাগিয়া তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।'

ঘরে একখানি কোচ ছিল। মাতুল বলিলেন—'এই কোচের উপর তোমায় আমি বিছানা করিয়া দিতেছি। এই ঘরে একলা শুইতে পারিবে? একটি ল্যাম্প আনিয়া দিতেছি। ল্যাম্প জ্বলিতে থাকুক, অন্ধকারে থাকিয়া কাজ নাই।'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'স্বচ্ছন্দে আমি এই ঘরে একলা শুইয়া থাকিব।

মাতুল বলিলেন—'বেশ কথা! তুমি কিছু দেখিবে, কি না দেখিবে, সে কথা এখন তোমাকে বলিব না।'

মাতুল নিজ হাতে কোচের উপর বিছানা করিয়া দিয়া বলিলেন—'রাধামাধব, এখন আমি চলিলাম, পাশের ঘরেই আমি শয়ন করি। আবশ্যক হইলে আমাকে ডাকিবে।'

মাতুল প্রস্থান করিলে, রাধামাধব ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর, ঘরের অন্যান্য দ্বার জানালা ভালরূপ বন্ধ আছে কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। অবশেষে ল্যাম্পের আলো কমাইয়া দিলেন। ল্যাম্প মিটমিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের সকল বস্তু স্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতে লাগিল।

কোচের উপর রাধামাধব শয়ন করিলেন ও একঘণ্টা পরই তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না। সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরের ভিতর ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ হইতেছিল। সেই দিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে, আলমারির ধারে ধারে একজন পুরুষমানুষ বেড়াইতেছে। নিজহাতে রাধামাধব ঘরের দ্বার জানালা বন্ধ করিয়াছিনে। বাহির হইতে ঘরের ভিতর লোক আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

'এ মানুষ নহে, এ ভূত'—রাধামাধবের মনে নিশ্চয় এইরূপ বিশ্বাস হইল। ভয়ে প্রাণের ভিতর তাহার গুরগুর করিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ফেলেন আর কি!—এমন সময় মনকে দৃঢ় করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'পৃথিবীতে ভূত নাই, থাকিলেও তাকে আমি ভয় করি না। চিরকাল লোকের নিকট আমি এইরূপ মুখে শাপট করিয়াছি। আজ যদি ভয়-বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া ফেলি তাহা হইলে সকলের নিকট আমি হাস্যাস্পদ হইব। অতএব প্রাণ থাকে আর যায়, কিছুতেই আমি চীৎকার করিব না।

রাধামাধব এইরূপ মনকে আশ্বাস দিয়া, ভূত কি করে, চুপ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

আলমারির উপর যে সমুদয় শিশি সাজান ছিল, ভূত একে একে সেই

সমুদয় শিশি অতি মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। ঘরের অপর পার্শ্ব হইতে শিশি দেখিতে দেখিতে ভূত রাধামাধবের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাধামাধব দেখিলেন যে, ভূতটির মাথা নেড়া। তাহার পশ্চাৎ দিকে লম্বা বেণী ঝুলিতেছে। বিনুনি দেখিয়া রাধামাধব ভাবিলেন—এটা দেশীভূত নহে, চীনে ভূত।

আলমারির ধারে ধারে ঘরের দুইদিক ঘুরিয়া ভূত একে একে সমস্ত শিশি-গুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। যখন সমুদয় শিশি দেখা হইয়া গেল, তখন সে ঘোর দুঃখসূচক এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল; তাহার চক্ষু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। তাহার পর কোচের নিকট আসিয়া রাধামাধবের সম্মুখে দাঁড়াইল ও অতিশয় ক্ষুণ্ণ-মনে আপনার হাত দুইটি তুলিয়া যেন কি দেখাইল। হাত দুইটি নহে, দেড়টি হাত। রাধামাধব দেখিলেন যে, তাহার দক্ষিণ হাতের আধখানি আছে। জামার আস্তিন কেবল কনুই পর্যন্ত উঠিল। অবশিষ্ট ভাগ ঝুলিয়া পড়িল; কারণ তাহার ভিতর হাত ছিল না। ভয়ে রাধামাধব অচেতনপ্রায় হইলেন। তাঁহার সর্ব শরীর ঘর্মে সিক্ত হইয়া গেল। চীৎকার করিয়া ফেলেন আর কি!—এমন সময় ভূত অদৃশ্য হইয়া গেল।

সে রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হইল না।

প্রভাত হইলে মাতুলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাতুল বলিলেন—'রাত্রিতে তুমি যে কিছু দেখিয়াছ, তোমার মুখ দেখিয়া তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। ইহার সবিশেষ বিবরণ আজ দিনের বেলা তোমাকে আমি প্রদান করিব।'

সেইদিন আহারের পর মামা ভাগিনেয় একস্থানে বসিয়া গল্পগাছা করিতে লাগিলেন। মাতুল বলিলেন—'বর্মায় যে স্থানে আমি কাজ করিতাম, সে স্থানের হাসপাতাল আমার অধীনে ছিল। নিম্নপদস্থ ডাক্তারগণ বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্রচিকিৎসা করিতে বড় সুবিধা পান না, কিন্তু এই হাসপাতালে আমার সে সুবিধা ছিল। অনেক বড় বড় অস্ত্র-চিকিৎসা আমি করিয়াছি। কোন লোকের অঙ্গচ্ছেদন করিয়া, সেই কর্তিত অঙ্গটি স্পিরিটপূর্ণ শিশির ভিতর রাখা আমার বাই ছিল। যে ঘরে গত রাত্রিতে তুমি শয়ন করিয়াছিলে, সেই ঘরে সেইরূপ অনেকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। বর্মা, চীনের নিকট, চীনদেশের অনেক লোক এদেশে বাস করিয়াছে। একদিন একজন চীনেম্যান আমার হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম যে তাহার দক্ষিণ হাতটির কনুই পর্যন্ত পচিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম যে—হাতটি কাটিয়া

না ফেলিলে কিছুতেই তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না। প্রথম সে কথায় সে সম্মত হইল না। তাহার পর যখন দেখিল যে হাত না কাটিলে তাহার প্রাণ কিছুতেই বাঁচিবে না, তখন সে অগত্যা সম্মত হইল। অজ্ঞান করিয়া কনুই পর্যন্ত আমি তাহার হাত কাটিয়া ফেলিলাম। তাহার পর সেই হাত যথা-রীতি সুরাপূর্ণ শিশিতে রাখিলাম। জ্ঞান হইবামাত্র চীনে রোগী আপনার কাটা হাত দেখিতে চাহিল। পাছে ভয় পায়, সেজন্য প্রথম আমি তাহাকে দেখাইতে চাহিলাম না। কিন্তু কাটা হাত দেখিবার জন্য সে এত কাতর হইল যে, তাহাকে না দেখাইয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। শিশিটি বাম হাত দিয়া সে অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। তাহার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রাখিয়া দিল। সেইদিন হইতে শিশিটি সে চক্ষুর আড়াল করিতে দিত না। আর দিনের মধ্যে অনেকবার তাহাকে খাটের উপর তুলিয়া অতি স্নেহের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিত। কিছুদিন পরে সে আরোগ্য লাভ করিল। হাসপাতাল হইতে যাইবার পূর্বে আমি তামাশা ছলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ডাক্তারকে বিদায় করিবে না?'

চীনে উত্তর করিল—'আমি দুঃখী লোক। আমি আপনাকে কি দিতে পারি?'

আমি বলিলাম—'তোমার হাতটি আমাকে প্রদান কর।'

তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল। সে বলিল—'মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন। হাতটি আমি আপনাকে দিতে পারিব না। আমার যখন মৃত্যু হইবে, তখন দেহের সহিত এই হাতটিরও কবর দিতে হইবে। আমি এই হাতটিকে নুন দিয়া রাখিব। তাহা করিলে পচিয়া যাইবে না। আমার মৃত্যু হইলে আমার আত্মীয়-স্বজন ইহাকেও দেহের সহিত গোর দিবেন।'

পুনরায় তামাশা ছলে আমি বলিলাম—'তোমার নিকট অপেক্ষা আমার নিকট হাতটি আরও ভাল অবস্থায় থাকিবে। কারণ, এরূপ বস্তু ভালরূপে রাখি-বার নিমিত্ত আমার নিকট মসলা আছে। আর কিরূপে রাখিতে হয়, তাহাও আমি জানি। তোমার নিকট থাকিলে হাতটি নিশ্চয় পচিয়া যাইবে। পচা হাত লইয়া শেষে কি পরলোক যাইবে?'

আমার কথাগুলি লোকটির মনে লাগিল। উৎফুল্ল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিল—'আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আসিয়া হাতটি প্রার্থনা করিলে যদি ইহা ফিরাইয়া দিতে আপনি প্রতিজ্ঞা করেন তাহা হইলে আপনার নিকট রাখিয়া যাইতে পারি।'

আমার কুবুদ্ধি! আমি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। একবার নহে, লোকটি বার বার আমাকে তিন সত্য করাইল। তাহার পর শিশিটি আমার হাতে দিয়া সে প্রস্থান করিল। অন্যান্য শিশির সঙ্গে আমি সে শিশিটিও রাখিয়া দিলাম।

আমি যে বাড়িতে বাস করিতাম, তাহা কাষ্ঠ-নির্মিত ছিল। কিছুদিন পরে আমার বাড়িতে আগুন লাগিল। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে, অনেকগুলি শিশিও নষ্ট হইয়া গেল। তাহার মধ্যে চীনেম্যানের হাত-সম্বলিত শিশিটিও ধ্বংস হইয়া গেল। যাহা হউক, চীনের কথা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম! তাহার হাতের কথা, অথবা আমার প্রতিজ্ঞার কথা,—একবারও আমার মনে উদয় হয় নাই।

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে দুইজন চীনেম্যান আসিয়া আমাকে বলিল—'মোঙ নামক যে চীনের হাত আপনি কাটিয়াছিলেন, গত রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আপনার নিকট হইতে সেই হাতটি লইয়া কবরে দিতে সে বার বার অনুরোধ করিয়াছে। সেই হাতের নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি।'

আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল! হাতটি ফিরাইয়া দিতে আমি বার বার তিন সত্য করিয়াছিলাম। সেই সত্য হইতে আজ আমি ভ্রষ্ট হইলাম। কি আর করিব? দৈবক্রমে হাতটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি সেই কথা তাহাদিগকে বলিলাম। বিরস বদনে তাহারা চলিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রিতে ঘরে শয়ন করিয়া, আমি নিদ্রা যাইতেছি। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ঘরে অল্প অল্প আলো জ্বলিতেছে। সহসা কে চুল ধরিয়া শয্যা হইতে আমাকে তুলিয়া বসাইল! আমি চাহিয়া দেখিলাম যে, একজন চীনে আমার বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আরও দেখিলাম যে, সে আর কেহ নহে, সে সেই মোঙ,—যাহার হাত আমি কাটিয়াছিলাম। ভয়ে বিহ্বল হইয়া আমি কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। কেবল গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ আমার খাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চীনে কুপিত কটাক্ষে আমার দিকে চাহিয়া ঘোরতর ভর্ৎসনাসূচক ভংগী করিয়া, তাহার দক্ষিণ হাতের আধখানা অর্থাৎ কেবল বাহুটি আমাকে তুলিয়া দেখাইল। তাহার পর, ঘর হইতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। পরে যে ঘরে শিশি থাকে, সেই ঘরে খুট্ খাট্ শব্দ হইতে লাগিল। পরে অবগত হইয়াছি যে, প্রত্যেক শিশি নিরীক্ষণ করিয়া সে আপনার হাতের অনুসন্ধান করে। শিশিতে আপনার হাত দেখিতে না পাইয়া বাড়ির অন্যান্য ঘর সে পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করে। আজ কয় বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রিতে এইরূপ করিতেছে। প্রথমে শয্যা হইতে সে আমাকে উত্তোলন করে, তাহার পর কুপিত ও ভর্ৎসনা ভাবে সে আমাকে তাহার হাতের আধখানি দেখায়, তাহার পর শিশিগুলিকে দেখিয়া

বেড়ায়, তাহার পর অন্যান্য ঘর অনুসন্ধান করে। রাত্রিকালে সহসা মাথার চুল ধরিয়া তুলিলে আমার বড় কষ্ট হয়। সেই জন্য মাথাটি আমি নেড়া করিয়াছি। এখন সে হাত ধরিয়া আমাকে উত্তোলন করে। যাহা হউক, তোমার মামী ও আমি এই রোগে আজ কয় বৎসর ভুগিতেছি। এই রোগের জন্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, দেশে আসিয়াছি। কিন্তু চীনে ভূত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত আমি না করিয়াছি—এমন কাজ নাই। তন্ত্র, মন্ত্র, জড়ি, বড়ি, কবচ, মাদুলী, ঝাড়ান, কাড়ান, ভূত নামানো, চণ্ডু নামানো, যাহা কিছু আছে সব করিয়াছি। দেশে আসিয়া চীনের নামে শ্রাদ্ধ করিয়াছি, গয়াতে পিণ্ড দিয়াছি, গরীব দুঃখীকে দান করিয়াছি, এক তীর্থস্থান হইতে অন্য তীর্থস্থানে পলায়ন করিয়া বাস করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যেখানে যাই না কেন, চীনে ভূত সেখানেই আমার সঙ্গে সঙ্গে যায়। আর একটি আশ্চর্য কথা এই যে, শিশিগুলি যদি আমি সঙ্গে না লইয়া যাই, তাহা হইলে উপদ্রবের আর পরিসীমা থাকে না। রাত্রিতে আমাকে শয্যা হইতে তুলিবার পর যদি সে শিশি দেখিতে না পায়, তখন ঘোরতর কুপিত হইয়া সে আমার ঘরের দ্রব্যাদি ভাঙিতে থাকে, বাড়িতে ইট পাটকেল বৃষ্টি করিতে থাকে। সে জন্য যেখানে যাই না কেন, শিশিগুলি আমাকে সঙ্গে রাখিতে হয়। আর কোন উপায় নাই। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। এখন মৃত্যু হইলেই আমি যেন বাঁচি।'

রাধামাধব মাতুলের কথাগুলি শুনিলেন। মাতুলকে নানারূপে আশ্বাস প্রদান করা ব্যতীত তখন তিনি আর কিছু বলিলেন না। তাহার পর রাত্রিকালে শয়ন করিয়া স্থির করিলেন—'এই ভূতটাকে আমি ঠকাইতে চেষ্টা করিব।'

পরদিন রাধামাধব মাতুলকে বলিলেন—'এ ঘোর বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি একটা উপায় ভাবিয়াছি। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে কিছুদিন এই স্থানে থাকিয়া চেষ্টা করিয়া দেখি।'

মাতুল সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

যাঁহারা কলিকাতার হাসপাতালে কাজ করেন, সেইরূপ ডাক্তারের সহিত রাধামাধব এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি একটি মড়ার হাত চাহিয়া লইলেন। হাতটি শিশিতে করিয়া মাতুলের অন্যান্য শিশির সহিত রাখিয়া দিলেন। কি হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সে-রাত্রিতে পুনরায় সেই কোচের উপর তিনি শয়ন করিলেন। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মাতুলের ঘরে তিনি ভূতের শব্দ পাইলেন। তাহার পর, চীনে ভূত যথারীতি সেই শিশির ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যথারীতি একে

একে সমুদয় শিশিগুলি সে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। যে শিশির ভিতর রাধামাধব সেই হাতটি রাখিয়াছিলেন, ভূত আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শিশির ভিতর হাত দেখিয়া আনন্দে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল। শিশিটি সে বাম হাতে তুলিয়া মনোযোগ পূর্বক দেখিতে লাগিল। কিছু-ক্ষণ দেখিয়া রাগে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। রাগে সে শিশিটি দূরে ভূমির উপর নিক্ষেপ করিল। শিশিটি ভাঙিগয়া গেল। ভূত অদৃশ্য হইল।

রাধামাধবের চেষ্টা বিফল হইল। ভূত প্রতারিত হইল না। কেন এরূপ হইল, রাধামাধব তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, বাঙগালী অথবা হিন্দুস্থানীর হস্ত দ্বারা ভূতকে ভুলাইতে পারা যাইবে না। আসল চীনেম্যানের হাত চাই। কিন্তু হাসপাতালে চীনে-ম্যানের হাত সহজে পাওয়া যায় না। তথাপি রাধামাধব নিরাশ হইলেন না। এইরূপ একটি হাতের জন্য বন্ধুদিগকে তিনি বলিয়া রাখিলেন। দৈবক্রমে এই সময় একজন চীনে সূত্রধর তেতলার ভারা হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। সে একবারে মরে নাই। তাহার একটি হাত চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই হাতটি ছেদন করা হইল। রাধামাধব সেই হাতটি পাইলেন। পূর্বের মত হাতটি শিশিতে রাখিয়া পুনরায় তিনি কোচের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর ভূত যথারীতি উপস্থিত হইয়া শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। হস্ত সম্বলিত শিশি দেখিয়া আজও প্রথম তাহার মনে আনন্দ হইল। কিন্তু আজও সে পূর্বের ন্যায় কুপিত হইয়া শিশিটি আছ-ড়াইয়া ফেলিয়া দিল। শিশিটি ভাঙিগয়া গেল।

রাধামাধবের চেষ্টা এবারও বিফল হইল। কেন এমন হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে মাতুল ও তিনি হাতটি ভূমি হইতে তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দেখিয়া মাতুল বলিলেন,—'ওঃ বুঝিয়াছি! এটা বাম হাত। চীনে ভূতের দক্ষিণ হাত গিয়াছে। বামহাত দেখিয়া সে জানিতে পারিয়াছে যে, এটা জাল হাত, তাহার নিজের হাত নহে। সেই জন্য সে রাগ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।'

রাধামাধব বুঝিলেন যে ইহাই প্রকৃত কারণ বটে। সেই দিন হইতে চীনে-ম্যানের দক্ষিণ হাতের জন্য তিনি সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক মাস গত হইয়া গেল। তথাপি এরূপ হাতের যোগাড় করিতে পারিলেন না। এমন সময় চীনের লড়াই আরম্ভ হইল, কলিকাতা হইতে যে সমুদয় জাহাজ চীন-দেশে গমন করে সেইরূপ জাহাজের একজন খালাসির সহিত রাধামাধব আলাপ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—'আরকপূর্ণ একটি শিশি তোমাকে দিতেছি। অস্ত্রাঘাতে হত হইয়াছে, এরূপ চীনে পুরুষ মানুষের দক্ষিণ

হাত যদি তুমি এই শিশির ভিতর করিয়া আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি একশত টাকা পুরস্কার দিব।'

খালাসি সম্মত হইল। অস্ত্রাঘাতে সে সময় অনেক চীনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ একটি হাতের যোগাড় করিতে খালাসিকে অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। দুই মাস পরে সেই আরকপূর্ণ শিশি করিয়া একজন চীনেম্যানের দক্ষিণ হস্ত সে রাধামাধবকে আনিয়া দিল।

শিশিটি রাধামাধব অন্যান্য শিশির সহিত রাখিয়া পূর্বের ন্যায় সেই ঘরে শয়ন করিয়া রহিলেন। পূর্বের ন্যায় যথাসময়ে ভূত আসিয়া একে একে শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। পূর্বের ন্যায় আজও সে হস্ত সম্বলিত শিশিটি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু আজ তাহার মুখে ক্রোধের লক্ষণ উদয় হইল না; আজ সে ক্রোধে শিশিটি আছড়াইয়া ফেলিল না। আনন্দের উপর আনন্দে আজ তাহার মুখশ্রী প্রফুল্ল হইতে প্রফুল্লতর হইতে লাগিল। অবশেষে শিশিটি হাতে লইয়া আনন্দে সে ঘরের ভিতর দুপ্ দাপ্ ধুপ্ ধাপ্ নৃত্য করিতে লাগিল। নাচিতে, নাচিতে সে 'ফিং ফাং ফোঁ, পিং পাং পোঁ' বলিয়া গান করিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে গাহিতে শিশিটি হাতে করিয়া ঘর হইতে সে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। রাধামাধব তাড়াতাড়ি মাতুলকে ডাকিয়া এই সুসমাচার প্রদান করিলেন। কিন্তু চীনে ভূত তখনও বাটী হইতে যায় নাই। মাঝের একটি ঘরে তখন সে এক প্রকার চপর চপর শব্দ করিতেছিল। মাতুল, মাতুলানী ও রাধামাধব সেই ঘরের দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। সে ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দ্বারের ফাঁক দিয়া সকলে দেখিলেন যে, ঘরের মাঝখানে বসিয়া চীনে ভূত—থালা ও অনেকগুলি বাটি হইতে কি সব আহার করিতেছে। মাতুলানী তখন হাসিয়া বলিলেন,—'আজ পৌষ সংক্রান্তি। আজ আমি নানারূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলাম। তাই মনে করিলাম যে—'আহা! এই চীনে ভূতটি প্রতিদিন আমাদের বাটীতে আসে; তাহাকে কিছু দিব না! তাই থালা ও বাটীতে নানারূপ পিঠে ও পরমান্ন তাহার জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। মনের আনন্দে বসিয়া বসিয়া সে তাই খাইতেছে।'

পিষ্টকাদি আহার করিয়া চীনে ভূত পরম পরিতোষ লাভ করিল। তাহার পর সে চলিয়া গেল।

সেই দিন হইতে মাতুলের বাটীতে আর চীনে ভূতের উপদ্রব হয় নাই। মাতুল ও মাতুলানীর শরীর ও মন সুস্থ হইল, পরম সুখে তাঁহারা দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

মাতুল এখন মাথায় চুল রাখিয়াছেন।

লক্ষ্মীনারাণ

শিবনাথ শাস্ত্রী

লক্ষ্মীনারাণ এক বামুনের ছেলে। দেহটি কুস্তির পালোয়ানের মত, কিন্তু মাথাটি যেন একটি ছোট হুঁকার খোল। কাজেই লক্ষ্মীনারাণের বুদ্ধিশুদ্ধি বড় কম। কিন্তু তার মা সে কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'আমার লক্ষ্মীর পেটে পেটে বুদ্ধি আছে, বয়স হলে ফুটবে।' কবে যে লক্ষ্মীর বয়স হবে তাহাও বুঝিতে পারা যায় না; দেখিতে দেখিতে বিশ বাইশ বৎসর হইয়া গেল, তবুও লক্ষ্মীর বয়স হইল না; সে সংসারের কোন কাজেই আসিল না। কাজের মধ্যে গরুর খড় কাটে ও প্রাতে গরুগুলি গোয়াল হইতে বাহির করিয়া নাড়িয়া বাঁধে। বলিতে কি লক্ষ্মীনারাণ ঐ গরুগুলি-কেই অনেকটা আপনার মত দেখিতে পায়; এবং ঐ গরুগুলির সঙ্গেই তার যা বনে। নতুবা পাড়ার ছেলেদের জ্বালায় সে পাড়ায় বাহির হইতে পারে না। বাহির হইলেই যেমন চিলের পিছে ফিঙে লাগে, তেমনি ছোঁড়ারা তার পিছনে লাগে; এবং বিধিমতে তাকে জ্বালাতন করে। পিছন দিক দিয়া আসিয়া তার কাছা খুলিয়া দেয়, তার হুঁকোর খোলের মত মাথাটিতে টোকর মারে; তার দুই কাঁধে হাত দিয়া লাফাইয়া ঘোড়ায় চড়ার মত পিঠে চড়িয়া বসে। কারণ লক্ষ্মীনারাণকে ক্ষেপাইতে সকলে ভালবাসে; সে ক্ষেপিলে খোনা নাকে যে সব গালাগালি দেয়, ও তার আকৃতি-প্রকৃতি যেরূপ দাঁড়ায় তা দেখিলে হাসিয়া পেটের নাড়িতে ব্যথা হয়।

লক্ষ্মীনারাণ বোকা বলিয়া তার পিতা তাকে একেবারেই আমলে আনেন না। তাকে বাদ দিয়া সংসারের কাজ করেন; কোনও কাজের ভার তার উপর দেন না। এজন্য পতি-পত্নীতে বড় বিবাদ হয়। লক্ষ্মীর মা বলেন, 'এক আধটু সংসারের ভার না দিলে ছেলেটা মানুষ হবে কি করে? তোমরা ওকে চেন না, ও আমার মনে করলে দশ টাকা আনতে পারে।' লক্ষ্মীর পিতা বলেন, 'হাঁ, যা নয় তাই, ওকে আবার কাজের ভার দেব, ওটা কি মানুষ?' লক্ষ্মী যখন এই সকল কথা শোনে, তখন মায়ের বাক্যে সায় দিয়া মনে মনে ভাবে, আমি কি না করতে পারি! লক্ষ্মী কিন্তু সংসারের একটা কাজ করে, গরু দুহিয়া থাকে।

একবার বাড়িতে একটা কাজ উপস্থিত। দশজন লোক খাবে। সকাল সকাল প্রথম বাজারে যাইতে পারিলে ভাল জিনিস পাওয়া যায়। লক্ষ্মীর পিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, কাকে বাজারে পাঠান। তিনি নিজে নানা

কাজে পড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না। লক্ষ্মীর মা বারবার বলিতেছেন, 'একটু বেলা হলে না হয় তুমি যেও, এখন না হয় লক্ষ্মীকে পাঠাও না কেন?' কর্তা মহাশয় দুই চারিবার বলিলেন, 'হাঁ, লক্ষ্মী যাবে, ও গিয়ে করবে কি?' কিন্তু শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন—'লকে, লকে, এদিকে আয়, এই একটা টাকা নিয়ে বাজারে যা; আট আনার মাছ কিনে কারু হাতে পাঠিয়ে দিস; তারপর প্রথম হাটে ভাল তরি-তরকারি যা পাবি কিনে আনিস।'

আজ লক্ষ্মীনারাণকে দেখে কে? টাকাটি টেঁকে গুঁজিয়া, দুই হাত দুলাইয়া, গরবে গরবে পা ফেলিয়া সে বাজারের দিকে চলিল। পথে যদি বালকেরা ডাকে, 'কিরে লকে, কোথা যাচ্ছিস?' উত্তরই দেয় না, ফিরে তাকায় না; যদি কেহ ভদ্রভাবে বলে 'কি ভাই লক্ষ্মীনারাণ, কোথা যাচ্ছ?' তবে উত্তর দেয়, 'বাঁজারে যাঁচ্ছি মাঁছ কিঁনতেঁ।' ঘটনাক্রমে লক্ষ্মীনারাণও বাজারে উপস্থিত, অমনি এক মেছুনি এক চুপড়ি কৈ মাছ আনিয়া নামাইল। খুব বড় বড় কৈ দেখিয়া লক্ষ্মীর জিভে জল আসিল। একথা না বলিলেও সকলের বোঝা উচিত যে লক্ষ্মীনারাণ আর কিছু না পারুক, খাইতে পারে; এবং দেখিয়াছে যে মা তাকে বড় বড় কৈ মাছের ঝোল করিয়া খাওয়াইতে ভাল-বাসেন। সুতরাং কৈ দেখিয়াই লক্ষ্মীর মনে হইল, কৈ মাছ কিনতে হবে। লক্ষ্মী জেলের মেয়েকে বলিল, 'আঁট আঁনার কৈঁ দেঁত।' এই বলিয়া টাকাটি তাহাকে দিল। মেছুনি যাহা দিল তাহাই লইয়া লক্ষ্মী চলিয়া যায়, আট আনা যে ফিরাইয়া লইতে হইবে সেদিকে খেয়াল নাই। জেলের মেয়ে নিজের গরজে ডাকিয়া ভাংগানি পয়সা ফিরাইয়া দিল। তখন লক্ষ্মী বলিল, 'তাঁইত তঁরি তঁরকারি কিঁনতে হবেঁ।' এখন মাছগুলি বাড়িতে পাঠাইতে হইবে। কাহাকে দিয়া পাঠাইবে? লক্ষ্মী চেষ্টা করিলে বাজারের চেনা চাষা লোক ঢের পাইত, তাহাদের কাহাকেও দুইটা পয়সা দিলে মাছগুলি বাড়িতে পেঁৗছাইয়া দিয়া আসিতে পারিত। লক্ষ্মী যখন কোন কর্তব্য নির্ধারণ করিতে বসিত, তখন যদি কোন একটা বিষয় স্মরণ হইত, তাহা হইলেই অনেক সময় বিপদ ঘটিত। তখনি একটা নূতন আজগুবী বুদ্ধি যোগাইত, এবং সে তৎক্ষণাৎ কাজে তাহা না করিয়া থাকিতে পারিত না। তার এই উদ্ভাবনী শক্তিতে সময়ে সময়ে মুশকিল বাধাইত। তাহার প্রমাণ এখনি পাইবে। সে দেখিল মাছগুলি জীয়ন্ত আছে, তখনি স্মরণ হইল যে উজুইয়ের কৈ কানে হাঁটিয়া জল হইতে ডাঙায় উঠে। সেই কথা স্মরণ হইয়া হঠাৎ এক নূতন বুদ্ধি তার মনে যোগাইল। তাহাদের বাড়ি হইতে বাজার পর্যন্ত একটি খালের মত ছিল। সে ভাবিল, মাছগুলি খালে দিলে ত আমাদের ঘাটে উঠিতে পারে! অমনি সে খালের জলে মাছগুলি ছাড়িয়া দিয়া বলিল, 'সোঁজা আঁমাদেঁর

ঘাটে গিয়ে উ'ট্‌বি।'

মাছ ত পাঠান হইল। তারপর লক্ষ্মী বাজারে প্রবেশ করিল। যেই প্রবেশ করা অমনি দেখিল এক কুম্ভকার এক বাজরা কলিকা নামাইতেছে। স্মরণ হইল যে গৃহে কাজকর্ম হইলে হুঁকা কলিকা প্রভৃতি কেনা হয়। পিতা তরি-তরকারি কিনিতে বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মীনারাণের শাস্ত্রে কলিকাগুলিও তরি-তরকারির মধ্যে; সুতরাং তৎক্ষণাৎ আট আনা দিয়া এক বোঝা কলিকা কিনিয়া লোকের মাথায় দিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। আজ সে পিতাকে পরাস্ত করিবে, দেখাইবে যে কেমন কাজের ছেলে, তাই আবেগে চলিয়াছে। পথে যদি কেহ ডাকে বা দাঁড়াইতে বলে, দাঁড়ায় না—বলে, 'আঁমি বাঁজার ক'রে যাঁচ্ছি, ঘ'রে কাঁজ আঁছে।' বাড়ি পৌঁছিয়া তার কি দশা হইল সকলেই বুঝিতে পার। ঘরের কাজকর্ম কোথায় রহিল! পতি-পত্নীতে ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল।

ইহার পরে লক্ষ্মীনারাণের পিতা আর তাকে কোনও কাজকর্মের ভার দিতেন না। আবার বহু দিন কাটিয়া গেল। আবার একবার গৃহে কাজকর্ম উপস্থিত। অনেকগুলি লোক খাওয়ান হইবে। তৎপূর্বদিন গোয়ালাকে আট আনা পয়সা পাঠাইয়া আধ মণ দৈ পাঠাইবার জন্য বলিতে হইবে। পিতা ভাবিলেন এ-ত আর বাজার করা নয়, কেবল গোয়ালার বাড়িতে গিয়া আট আনা পয়সা দিয়া আসা বৈ ত নয়, তা কি তার লক্ষ্মীনারাণ পারিবে না? ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি লক্ষ্মীনারাণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'লকে! এদিকে আয় ত, এই আট আনার পয়সা অমুক গোয়ালাকে দিয়ে বলে আয় কাল প্রাতে আধ মণ দই দিতে হবে।'

আবার লক্ষ্মীনারাণের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে আট আনার পয়সা টেঁকে গুঁজিয়া বাহির হইল। পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল যে রাজাদের একটা হাতী আসিতেছে। হাতী দেখিয়াই লক্ষ্মীনারাণের হাতী চড়িতে সাধ হইল। মাহুতকে বলিল, 'মাঁহুত. হাঁতী চ'ড়াবি?' মাহুত দেখিল বোকা বামুনের ছেলে, জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দিবে?' লক্ষ্মীনারাণ বলিল, 'আঁট আঁনা দি'ব।' মাহুত ভাবিল, বেশ ত উপরি লাভ জুটিল। সে তৎক্ষণাৎ হাতী বসাইয়া লক্ষ্মীনারাণকে উপরে তুলিয়া লইল। হাতী যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন যদি লক্ষ্মীনারাণের ভাব কেহ দেখিত তবে নিশ্চয় পাগল হইত। রাজপুত্রই বা কোথায়? এমনই গৌরবে বসিয়াছে। পথে বালকদের কোলাহল, 'ওরে ভাই, লকে হাতীর উপর চড়েছে।' 'ওরে লকে, হাতীর উপর কি করে চড়লি?' লক্ষ্মীনারাণ কাহারও কথা শুনিতেছে না; কোনও দিকে দেখিতেছে না, কেবল আপনাকে রাজপুত্র ভাবিতেছে; তার ছোট মাথাটি

একেবারে ঘুরিয়া গিয়াছে।

মাহুত কিয়দ্দূর গিয়া লক্ষ্মীনারাণকে নামাইয়া দিল। তখন দৈয়ের বায়নার কথা লক্ষ্মীনারাণের মনে হইল। অগ্রেই বলিয়াছি তার উদ্ভাবনী শক্তি আশ্চর্য। একটু ভাবিয়াই এমন একটা কৌশল বাহির করিল, যাহা শুনিলে তোমরা তাহার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সে অনেকবার দেখিয়াছিল যে মা দুধে তেঁতুল দিয়া ঘরে দৈ পাতেন। সেই কথাটা স্মরণ করিয়া মনে মনে একটা উপায় স্থির করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। সন্ধ্যার সময় ভাঁড়ার হইতে তেঁতুল লইয়া, গোয়ালে প্রবেশ করিয়া সমুদয় গরুকে তেঁতুল খাওয়াইয়া দিল।

রাত্রে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওরে লকে, গোয়ালাকে বায়না দিয়েছিস তো?' উত্তর — 'হ'বে হ'বে ভ'য় পাঁও কে'ন? ঠিক স'ময়ে দৈ' পে'লেই ত হ'লো।' পরদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা জমিতে লাগিল। বাজার হইতে সন্দেশ প্রভৃতি আসিল, দৈ আর আসে না। পিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন—'ওরে লকে, দৈ কৈ? বায়না দিয়েছিস ত?' শেষে লক্ষ্মীনারাণ বিরক্ত হইয়া জননীকে বলিল, 'আঁ তোঁমরা জ্বাঁলাতন ক'রে তু'ললে; ভাঁড়টা দাঁও ত দৈ' দুঁয়ে আঁসি।' শুনিয়াই ত জননী অবাক!—'দৈ দুয়ে আনুবি কিরে?' লক্ষ্মী উত্তরে বলিল, 'ওঁগো, কাঁল রাঁত্রে স'ব গ'রুকে তে'তুল খাঁইয়ে রে'খেছি।' বুঝিতেই পার ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল। গৃহকর্তা পাগলের মত হইয়া উঠিলেন! দাঁতে ঘষিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীনারাণকে ও তাহার মাতাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'ওরে হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, আট আনা পয়সা যে দিলাম তার কি করলি?' এত গালাগালিতে লক্ষ্মীনারাণের বড়ই ক্রোধের উদয় হইয়াছে। সে এক একবার হাতী চাঁড়বার বিষয় স্মরণ করিতেছে, অমনি রাজপুত্রের ভাবটা মনে আসিয়া পড়িতেছে। শেষে আর সে গালাগালি সহ্য করিতে না পারিয়া, গম্ভীর ভাবে গৃহের বাহির হইয়া পিতাকে বলিল, 'যাঁ ক'রেছি, তাঁ তোঁমার জ'ন্মেও ক'রনি।' পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করেছিস্ কি?' উত্তর, 'তোঁমার চৌদ্দ গ'ণ্ডা পুঁরুষে তাঁ ক'রেনি।' পিতা— 'ওরে হতভাগা, কি করেছিস বল্ না?' লক্ষ্মী— 'যাঁও যাঁও, অঁমন মুঁখ ক'রোনা ব'লছি। রাঁজপুত্র যাঁ ক'রে তাঁ ক'রেছি।' পিতা—'কি রাজপুত্রের কাজটা করলি?' উত্তর—'আঁমি হাঁতী চ'ড়েছি।' এই বলিয়া রাজপুত্রের মত গরবে গরবে পা ফেলিয়া আবার ঘরের ভিতর গেল।

বাচস্পতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাদামশায়, তুমি তোমার চার দিকে যে-সব পাগলের দল জমিয়েছিলে, গুণে হিসেব ক'রে তাদের বুঝি সব নম্বর দিয়ে রেখেছিলে?

হ্যাঁ, তা করতে হয়েছে বই কি। কম তো জমে নি।

তোমার পয়লা নম্বর ছিলেন বাচস্পতি মশায়, তাঁকে আমার ভারি মজা লাগে।

আমার শুধু মজা লাগে না, আশ্চর্য লাগে। কারণ বলি—কবিতা লিখে থাকি। কথা বাঁকানো-চোরানো আমাদের ব্যবসা। যে শব্দের কোনো সাদা মানে আছে তাকে আমরা ধ্বনি লাগিয়ে তার চেহারা বদল করি। সে একরকমের জাদুবিদ্যা বললেই হয়। কাজটা সহজ নয়। আমাদের বাচস্পচি আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন যখন দেখলুম তিনি একেবারে গোড়াগুড়ি ভাষা বানিয়েছেন। কান দিয়ে ধ্বনির রাস্তায় তার মানের রাস্তা খুঁজতে হয়। আমাদের কাজটাও অনেকটা তাই, কিন্তু এতদূর পর্যন্ত নয়। আমরা তবু ব্যাকরণ অভিধান মেনে চলি। বাচস্পতির ভাষা চলত সে-সমস্তই ডিঙিওয়ে। শুনলে মনে হত যেন কী একটি মানে আছে।— মানে ছিল বই কি। কিন্তু, সেটা কানের সঙ্গে ধ্বনি মিলিয়ে আন্দাজ করতে হত। আমার 'অদ্ভুত-রত্নাকর' সভার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন বাচস্পতি মশায়। প্রথম বয়সে পড়াশুনা করেছিলেন বিস্তর, তাতে মনের তলা পর্যন্ত গিয়েছিল ঘুলিয়ে। হঠাৎ এক সময়ে তাঁর মনে হল, ভাষার শব্দগুলো চলে অভিধানের আঁচল ধ'রে। এই গোলামি ঘটেছে ভাষার কলিযুগে। সত্যযুগে শব্দগুলো আপনি উঠে পড়ত মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই মানে আনত টেনে। তিনি বলতেন, 'শব্দের আপন কাজই হচ্ছে বোঝানো, তাকে আবার বোঝাবে কে। একদিন একটা নমুনা শুনিয়ে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। বললেন, আমার নায়িকা যখন নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে 'দিন রাত তোমার ঐ হিদ্‌হিদ্ হিদিক্কারে আমার পাঁজঞ্জুরিতে তিড়িতঙ্ক লাগে', তখন তার মানে বোঝাতে পণ্ডিতকে ডাকতে হয় নি। যেমন পিঠে কিল মেরে সেটাকে কিল প্রমাণ করতে মহামহোপাধ্যায়ের দরকার হয় না।

সভাপতি একদিন বিষয়টা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওহে বাচস্পতি, সেই ছেলেটার কী দশা হল?

বাচস্পতি বললেন, সে ছেলেটার বুঝকিন্ গোড়া থেকেই ছিল বুঝভুম্বুলে গোছের। তার নাম দিয়েছিলাম বিচ্‌কুম্‌কুর।

মথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ও নামটা কেন?

বাচস্পতি বললেন, সে যে একেবারেই বিচ্‌কুম্‌কুর। পাঠশালার পেডেণ্ডোকে দেখলেই তার আন্‌তারা যেত ফুস্‌কলিয়ে। বুকের ভিতর করতে থাকত কুড়ুক্কুর কুড়ুক্কুর। এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুস্‌কে যাবে, এ কথাটা বলেছিল পাড়ার সব-চেয়ে যে ছিল পেড়াম্বর হুড়ুম্‌কি। একটু রসুন— বুঝিয়ে বলি। পেডেণ্ডো কথাটা বালি দ্বীপের কাছে পেয়েছি। তাদের মুখের পণ্ডিত শব্দটা আপনিই হয়ে উঠেছে পেডেণ্ডো। ভেবে দেখুন, কত বড়ো ওজন, ওর বিদ্যের বোঝা ঠেলে নিয়ে যেতে দশ-বিশ জন ডিগ্রিধারী জোয়ানের দরকার হয়। আর পণ্ডিত— ছোঃ, তুড়ি দিয়ে তুড়তুড়ুং ক'রে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

অটলদা বললেন, বাচস্পতি, তোমার আজকেকার বর্ণনাটা যে একেবারেই চলতি গ্রাম্য ভাষায়। এ তোমাকে মানায় না। সেই সেদিন যে সাধু ভাষা বেরিয়েছিল তোমার মুখ দিয়ে, যার সধ্বংস্যনিত হার্দিক্যে বুদবুধিদের মন তিংতিড়ি তিংতিড়ি ক'রে ওঠে, সেই ভাষার একটু নমুনা আজ এদের শুনিয়ে দাও। যে-ভাষায় ভারতের ইতিহাসটি গেঁথেছে, যার গুরুভার হিসেব ক'রে বলেছিলে ডুণ্ডুম্মানিত ভাষা, তার পরিচয়টা চাই। শুনে এদের সকলের আন্‌তারা ফাঁচ্‌কলিয়ে যাক।

বাচস্পতি মশায় শুরু করলেন, সম্মম্‌মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেঙ্কটাকৃণ্ট ত্বরিৎ-ভ্রম্যন্ত পর্যুগাসন উখ্‌রংসিত—

একজন সভাসদ বললেন, বাচস্পতি মশায়, উখ্‌রংসিত কথাটা শোনাচ্ছে ভালো, ওর মানেটা বুঝিয়ে দিন।

পণ্ডিতজি বললেন, ওর মানে উখ্‌রংসিত।

তার মানে?

তার মানে উখ্‌রংসিত।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, তার মানে হতেই পারে না। মেরে-কেটে একটা মানে দিতেও পারি।

কী রকম।

ভিরভ্রিংগট্ট।

আর বলতে হবে না, স্পষ্ট বুঝেছি, ব'লে যান।

বাচস্পতি আবার শুরু করে দিলেন, সম্মম্‌মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেঙ্কটাকৃণ্ট ত্বরিৎভ্রম্যন্ত পর্যুস্গাসন উখ্‌রংসিত নিরংকরালের সহিত—

মথুরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কেমন মশায়, বুঝেছেন তো নিরংকরাল—

একেবারে জলের মতো। ওর চেয়ে বেশি বুঝতে চাই নে—মুশকিল হবে।

বাচস্পতি আবার ধরলেন, নিরংকরালের সহিত অজাতশত্রু অপরিপর্যম্মিত গর্গরায়ণকে পরমন্তি শয়নে সমুসদ্গারিত করিয়াছিল।

এই পর্যন্ত ব'লে বাচস্পতি মশায় একবার সভাস্থ সকলের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। বললেন, দেখুন একবার, সহজ কাকে বলে। অভিধানের প্রয়োজনই হয় না।

সভার লোকেরা বললে, প্রয়োজন হলেই বা পাব কোথায়?

বাচস্পতি মশায় একটু চোখ টিপে বললেন, ভাবখানা বুঝেছেন তো?

মথুরবাবু বললেন, বুঝেছি বই কি। সমুদ্রগুপ্ত অজাতশত্রুকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন। আহা, বাচস্পতি মশায়, লোকটাকে একেবারে সমুসদ্—গারিতে করে দিলে গো— একেবারে পরমন্তি শয়নে।

বাচস্পতি বললেন, ছোটোলাট একবার এসেছিলেন আমাদের পাড়ার স্কুলে বুটের ধুলো দিয়ে যেতে। তখন আমি তাঁকে এই বুগবুলবুলি ভাষার একটা ইংরেজি তর্জমা শুনিয়েছিলুম।

সভাস্থ সকলেই বললেন, ইংরেজিটা শোনা যাক।

বাচস্পতি পড়ে গেলেন, দি হাব্বারফ্লুয়াস ইন্‌ফ্যাচুফুয়েশন অব আকবর ডর্বোন্ডিক্যালি ল্যাসেরটাইজড্ দি গর্ব্যান্ডিজম্ অফ হুমায়ুন।— শুনে ছোটোলাট একেবারে টরেটম্ বনে গিয়েছিলেন; মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুস্‌কায়িত। হেড পেডেণ্ডোর টিকির চার ধারে ভেরেণ্ডম্ লেগে গেল, সেক্রেটারি চৌকি থেকে তড়তং করে উৎখিয়ে উঠলেন। ছেলেগুলোর উজবুস্মুখো ফুড়ফুড়োমি দেখে মনে হল, তারা যেন সব ফিরিচুঙ্গুসের একেবারে চিক্‌চাকস্ আমদানি। গতিক দেখে আমি চংচটকা দিলুম।

সভাপতি বললেন, বাচস্পতি, এইখানেই ক্ষান্ত দাও হে, আর বেশিক্ষণ চললে পরাগগলিত হয়ে যাব। এখনি মাথাটার মধ্যে তাজ্ঝিম্ মাজ্ঝিম্ করছে।

বাচস্পতি আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে সভাপতির ভাষা এতদিনে ওঁদের মুখবুদ্‌বুদী শব্দে রঝম্ গঝম্ করে উঠত।

পাকা-ফলার

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পাড়াগাঁয়ে এক 'ফলারে বামুন' ছিল। তাহাকে যাহারা নিমন্ত্রণ করিত, তাহারা সকলেই গরীব; দৈ-চিড়ের বেশি কিছু খাওয়াইবার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

ব্রাহ্মণ শুনিয়াছিল যে, দৈ-চিড়ের ফলারের চাইতে পাকা ফলারটা ঢের ভাল। সুতরাং এর পর যে ফলারের নিমন্ত্রণ করিতে আসিল, তাহাকে বলিল, "পাকা ফলার খাওয়াতে হবে।" সে বেচারা গরীব লোক, পাকা ফলার কোথা হইতে দিবে? তাই সে বিনয় করিয়া বলিল, "মশাই, পাকা ফলার দেওয়া কি যার তার কাজ ? রাজারাজড়া হ'লে তবে পাকা ফলার দিতে পারে।" শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "তবে রাজা যেখানে থাকে, সেইখানে গিয়ে পাকা ফলার খাব।"

ব্রাহ্মণ পাকা ফলার খাইবার জন্য রাজার বাড়ি চলিয়াছে। পথে যাহাকে দেখে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁগো, রাজার বাড়িটে কোন্ খানটায়?" একজন তাহাকে রাজার বাড়ি দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে পাকা বাড়ি দেখচো, ঐটে।"

ব্রাহ্মণ 'পাকা ফলার' যেমন খাইয়াছে, 'পাকা বাড়ি'ও তেমনি দেখিয়াছে, সুতরাং 'পাকা বাড়ির' কথা শুনিয়া সে ভারি আশ্চর্য হইয়া রাজার বাড়ির দিকে তাকাইল। সে দেশে সব লোকেরই কুঁড়ে ঘর; খালি রাজার একটি সুন্দর পাকা বাড়ি ছিল। রাজার বাড়ি দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া লাল পড়িতে লাগিল। সে গদ্‌গদস্বরে বলিল, "পাকা বাড়ি? আহা! পাকা বাড়িই বটে! না হবে কেন, সে যে রাজা, তাই সে অমন বাড়িতে থাকে। ওটা তয়ের কর্তে না জানি কত ক্ষীর, ছানা আর চিনি লগেছিল!"

ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিল যে, রাজার বাড়িটা সমস্তই খালি ক্ষীর, ছানা আর চিনি দিয়া গড়া। আর উহার খানিকটা উদরস্থ করিতে পারিলেই তাহার পাকা ফলার খাওয়া হইবে। তবে আর দেরি কেন?

এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি গিয়া রাজার বাড়ির একটা কোণ কামড়াইয়া ধরিল; আবার তখনই "উঃ—হুঃ—হুঃ" করিয়া ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল, "তাই ত, এই পাকা ফলারের এমন নাম!" আর খানিক ভাবিয়া সে বলিল, "ওঃহো, বুঝেছি। নারকেলের মত আর কি! ওটা ওর খোলা; আসল জিনিসটা ভিতরে আছে।"

এই বলিয়া সে আগের চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে কামড়াইতে আরম্ভ করিল।

তাহার দুটো দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, তাহাতেও গ্রাহ্য নাই। কামড়াইতে কামড়াইতে সে সেই কোণের অনেকখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, আর মনে করিতেছে যে, "আর বেশী দেরি নাই। এর পরই পাকা ফলার আসবে।"

এমন সময় কোথা হইতে মস্ত পাগড়ীওয়ালা এক দারোয়ান আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল! "আরে ঠাকুর, ক্যা করতে হো? মহারাজকে ইমারত খা ডালতে হো? চলো তুম হামারে সাথ!" এই বলিয়া দারোয়ান তাহাকে রাজার নিকট লইয়া চলিল।

দারোয়ানের কাছে সকল কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "কি ঠাকুর, ওখানে কি করছিলে?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "মহারাজ, আমি পাকা ফলার খাচ্ছিলুম। খোলাটা না ভাঙতে ভাঙতেই এই বেটা দারোয়ান আমাকে ধ'রে এনেছে!"

এই কথা শুনিয়া রাজা মহাশয় হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, আর বেশ বুঝতে পারিলেন যে ঠাকুরের পেটে অনেক বুদ্ধি! যাহা হউক, তাহার সাদাসিধে কথাগুলি রাজার বেশ ভাল লাগিল। সুতরাং তিনি হুকুম দিলেন যে,—"এই ব্রাহ্মণকে পেট ভরিয়া পাকা ফলার খাইবার মত ময়দা, ঘি আর মিঠাই দাও।"

ব্রাহ্মণ মনের সুখে রাজাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে ময়দা, ঘি আর মিঠাই লইয়া ঘরে ফিরিল। আসিবার সময় বলিয়া আসিল যে, পাকা ফলার খাইয়া আবার রাজা মহাশয়কে আশীর্বাদ করিতে আসিবে।

পরদিন সকালে রাজা মহাশয় মুখ হাত ধুইয়া সভায় আসিয়াই সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঠাকুর, কাল পাকা ফলার খেলে কেমন?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "মহারাজ, অতি চমৎকার খেয়েছি! পাকা ফলার কি আর মন্দ হতে পারে! গুড়োগুলো আগে গলায় বড্ড আটকাচ্ছিল। জল দিয়ে গুলে নিতে শেষে তরল হ'ল; কিন্তু অর্ধেক খেতে না খেতেই বমি হয়ে গেল।"

ময়দা আর ঘি দিয়া লুচি তৈয়ার করিতে হয় ব্রাহ্মণ বেচারা তাহা জানিত না। কাজেই সে ঐ কাঁচা ময়দাগুলাকেই ঘি আর মিঠাই দিয়া মাখিয়া খাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। সহজে তরল হয় না দেখিয়া আবার তাহার সঙ্গে জল মিশাইয়াছে। খাইতে তাহার খুবই ভাল লাগিয়াছিল; তবে পেটে রহিল না, এই যা দুঃখ।

রাজা দেখিলেন, লুচি নিজে তৈয়ার করিয়া খাইতে হইলে আর ব্রাহ্মণের ভাগ্যে পাকা ফলার ঘটিতেছে না। সুতরাং তিনি তাঁহার রসুয়ে বামুনদের একজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এখান থেকে ময়দা, ঘি নিয়ে, তোমার বাড়িতে লুচি ত'য়ের ক'রে এই ঠাকুরকে পেট ভ'রে পাকা ফলার খাইয়ে দাও।"

রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনকে তাহার বাড়ি দেখাইয়া বলিল, "আমি খাবার তৈয়ের ক'রে রাখবো, বিকেলে আপনি এসে খাবেন। আমি বাড়ি থাকবো না, আমার ছেলে আপনাকে খেতে দেবে অখন।" ব্রাহ্মণ রাজী হইয়া বাড়ি গিয়া বিকাল বেলার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রসুয়ে বামুনের সেই ছেলেটা ভাল লোক ছিল না; একটা চোরের সঙ্গে তাহার বন্ধুতা ছিল। রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনের জন্য লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া তাহার ছেলেকে বলিল, "সেই লোকটি এলে তাকে বেশ ক'রে খাওয়াস্!" তাহার ছেলে বলিল, "তার জন্যে কিছু চিন্তা করো না, আমি তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াবো অখন।" এই কথা শুনিয়া রসুয়ে বামুন রাজবাড়িতে রান্না করিতে চলিয়া গেল। রোজ সে এই সময়ে রান্না করিতে যায় আর প্রায় দুপুর রাত্রে ফিরিয়া আসে।

রসুয়ে বামুন চলিয়া গেলে পর, তাহার ছেলে ফলারে বামুনের খাবারের আয়োজনে মন দিল। দু-সেরের বেশী লুচি আর তাহার মত তরকারি মিঠাই ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। খান চারেক লুচি আর খানিকটা তরকারি ফলারে বামুনের জন্য রাখিয়া, আর সমস্ত সেই হতভাগা চোর বন্ধু ও নিজের জন্য রাখিয়া দিল। ফলারে বামুন আসিলে পর, সে সেই চারখানা লুচি তাহাকে দিল। সে বেচারা জন্মেও লুচি খায় নাই, তাহাতে আবার এমন চমৎকার লুচি—রাজার বামুনঠাকুর নিজে যাহা তৈয়ার করিয়াছে! এমন জিনিস দু'চার খানি মাত্র খাইয়া পেট ত ভরিলই না বরং ক্ষুধা আরো বাড়িয়া গেল। সে খালি দুঃখ করিতে লাগিল, "আহা! আর যদি খান কতক দিত!"

রসুয়ে বামুনের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ফলারে বামুন রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। তাহার মনের দুঃখ রাখিবার আর জায়গা নাই! চলে আর খালি বলে, "আহা, আর যদি খান কতক দিত!"

এমন সময় হইয়াছে কি, রাজার প্রধান ভাণ্ডারী সেই রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। সে নিজের হাতে সেদিন সকাল বেলায় ঐ ফলারে বামুনের জন্য পুরো দু'সের ময়দা আর তাহার মত অন্য সব জিনিস মাপিয়া দিয়াছে। ফলারে বামুনের ঐ কথা শুনিয়া ভাণ্ডারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠাকুর মশাই! কি যদি আর খান কতক দিত?"

ফলারে বামুন বলিল, "বাবা, আমি পাকা ফলারের কথা বলছি। রাজা মশাই চিরজীবী হউন, আমাকে এমন জিনিস খাইয়েছেন! খালি যদি আর খান-কতক হ'ত!"

ভাণ্ডারী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে ক'খানা দিয়েছিল?"

ফলারে বামুন বলিল, "চারখানি পাকা ফলার আমাকে দিয়েছিল!"

ভাণ্ডারী জানিত যে, রসুয়ে বামুনের ছেলেটা বড় দুষ্ট; সুতরাং সে সবই বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"সে কি ঠাকুরমশাই! দু'সের ময়দা দিয়েছি, তা'তে কি মোটে চারখানা লুচি হয়?"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"হাঁ বাপু, চারখানাই ছিল, আর তা' খেতে খুব চমৎকার লেগেছিল।"

ভাণ্ডারী বলিল, "দু'সের ময়দায় ওর চাইতে ঢের বেশি লুচি হয়। আমার বোধ হচ্ছে, ঐ রসুয়ে বামুনের ছেলেটা বাকি লুচিগুলো মাচায় তুলে রেখেছে। আপনি আবার যান। এবার গিয়ে একেবারে মাচায় উঠবেন; দেখবেন, আপনার লুচি সেখানে আছে।"

ব্রাহ্মণ বলিল,—"তাই না কি? বাপু, তুমি বেঁচে থাক। হতভাগা, বেল্লিক, বাঁদর, শয়তান, পাজি—" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ সেই রসুয়ে বামুনের বাড়ির পানে ছুটিল। গালিগুলি অবশ্যই ভাণ্ডারীকে দেয় নাই, রসুয়ে বামুনের ছেলেকেই দিয়াছিল।

রসুয়ে বামুনের ছেলে ফলারে বামুনকে চারিখানি লুচি খাওয়াইয়া বিদায় করিয়াই, তাহার সেই চোর বন্ধুর কাছে গিয়াছিল। সেখানে গিয়া সে চোরকে বলিল,—"বন্ধু, ঢের লুচি তৈয়ের করে মাচার উপর রেখে এসেছি! তুমি শিগ্‌গির যাও, আমি এই বাজার থেকে একটা জিনিস নিয়ে এখনি আস্‌ছি।"

চোর রসুয়ে বামুনের মাচার উপর উঠিয়া সবে লুচির ঢাকনা খুলিতে যাইবে, এমন সময় ফলারে বামুন আসিয়া উপস্থিত। এবারে আর কথাবার্তা নাই, একেবারে মাচায় গিয়া উঠিল। চোর ভারি মুশকিলে পড়িল। লুকাই-বারও স্থান নাই, পলাইবারও পথ নাই, এখন সে যায় কোথায়? শেষটা আর কি করে, মাচার এক কোণে একটা কাঠের থাম জড়াইয়া কোন রকমে বেমালুম হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে আবার ফলারে বামুনের মনটা লুচি খাইবার জন্য যারপর-নাই ব্যস্ত রহিয়াছে! সুতরাং চোরকে সে দেখিতেই পাইল না,—সামনে লুচি, সন্দেশ, তরকারি, মিঠাই সাজান দেখিয়াই খাইতে বসিয়া গেল!

এমন সময়ে ভারি একটা মজা হইল। রসুয়ে বামুনের ছেলেও বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর ঠিক সেই সময় রসুয়ে বামুনও আসিয়াছে। অন্য দিন সে প্রায় দুপুর রাত্রের পূর্বে ফিরে না, কিন্তু সেদিন সে ভুলিয়া একটা ঝাঁজরা ফেলিয়া গিয়াছিল, সেটার ভারি দরকার।

ছেলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি এখনি এলে যে?"

রসুয়ে বামুন বলিল,—"ঝাঁজরা ফেলে গিছলাম, তাই নিতে এসেছি।"

ততক্ষণে ফলারে বামুনের পেট এত বোঝাই হয়েছে যে, আর একটু হইলেই

তাহার দম আটকায়। পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে জল নাই! সে, "জল, জল" করিয়া চ্যাঁচাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাল করিয়া কথা ফুটিল না।

রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল—"ওটা কি রে?" ছেলে দেখিল, ভারি মুশকিল। সে ত আর ফলারে বামুনের কথা জানিত না; কাজেই সে মনে করিয়াছে যে, ওটা তাহার বন্ধু; গলায় সন্দেশ আটকাইয়া অমন বিশ্রী স্বরে জল চাহিতেছে। বন্ধুর খবরটা দিলে তাহার বাপ আর বন্ধুবরের একখানা হাড়ও আস্ত রাখিবে না! আর কিছু না বলিলে, নিজেই হয় ত মাচায় উঠিয়া দেখিবে! এখন উপায়?

এই সময় হঠাৎ ছেলের বুদ্ধি যোগাইল! সে বলিল, "বাবা, ওটা নিশ্চয় ভূত। তা নইলে মাচার উপর থেকে অমন বিশ্রী আওয়াজ দেবে কেন?" সে জানিত যে, তাহার বাপের ভূতের ভয়টা একটু বেশি।

ভূতের কথা শুনিয়া রসুয়ে বামুন কাঁপিতে লাগিল। আরও মুশকিলের কথা এই যে, ভূতটা জল চাহিতেছে। তাহার কাছে জল লইয়া যাইতে কিছুতেই ভরসা হইতেছে না, অথচ জল না পাইলে সে নিশ্চয়ই ভয়ানক চটিয়া যাইবে। তারপর সে কি করে, তাহার ঠিক কি! ছেলের ভারি ইচ্ছা, সে ভূতকে জল দিয়ে আসে। কিন্তু রসুয়ে বামুন বলিল—"তা হবে না; যদি তোর ঘাড় ভেঙে দেয়!" এই সময়ে তাহার মনে হইল যে, মাচার উপরে কয়েকটা নারিকেল ছাড়ান আছে; সুতরাং সে ভূতকে ডাকিয়া বলিল— "মাচায় নারকেল আছে; থাকে আছড়ে ভেঙে খাও।" তারপর হাঁপ ছাড়িয়া বলিল, —"বাবা বড্ড বেঁচে গিয়েছি! নারকেলগুলো না থাকলে আজ প্রাণ গিয়েছিল আর কি!"

ফলারে বামুনের হাতের কাছেই নারিকেলগুলি ছিল; সে তাহার একটা হাতে লইয়া থামে আছড়াইয়া ভাঙিতে গেল। সেই থাম জড়াইয়া চোর দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাহ্মণ পিপাসার চোটে থাম মনে করিয়া সেই চোরের মাথাতেই নারিকেল আছড়াইয়া বসিয়াছে—একেবারে মাথা ফাটাইয়া ফেলিবার যোগাড় আর কি!

এর পর একটা মস্ত গোলমাল হইল। নারিকেলের বাড়ি খাইয়া চোর ভয়ানক চ্যাঁচাইয়া উঠিল; আর তাহাতে ভয়ানক চমকাইয়া গিয়া ব্রাহ্মণও হাউ মাউ করিতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া পাড়ার সমস্ত লোক সেখানে আসিয়া জড় হইল। আসল কথাটা জানিতে এর পর আর বেশী দেরি হইল না। চোর ধরা পড়িল; আর রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে সেই ঝাঁজরা দিয়া এমনি ঠেঙান ঠেঙাইল যে, কি বলিব!

ফার্স্ট-ক্লাশ ভূত

প্রমথ চৌধুরী

আমরা তখন সবে কলকাতায় এসেছি, ইস্কুলে পড়তে। কলকাতার ইস্কুল যে মফস্বলের চাইতে ভাল, সে বিশ্বাসে নয়। কারণ ইস্কুল সব জায়গাতেই সমান। সবই এক ছাঁচে ঢালা। সব ইস্কুলই তেড়ে শিক্ষা দেয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই শিক্ষিত হয় না; আর যদি কেউ হয়, তা নিজ-গুণে—শিক্ষা বা শিক্ষকের গুণে নয়। আমরা এসেছিলুম ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেতে!

আমরা আসবার মাস তিনেক পরে হঠাৎ সারদা-দাদা এসে আমাদের অতিথি হলেন। সারদা-দাদা কি হিসেবে আমার দাদা হতেন, তা আমি জানিনে। তিনি আমাদের জ্ঞাতি নন, কুটুম্বও নন, গ্রাম সম্বন্ধে ভাইও নন। তাঁর বাড়ি আমাদের গ্রামে নয়। দেশ তাঁর যেখানেই হোক, সেখানে তাঁর বাড়ি ছিল না। তিনি সংসারে ভেসে বেড়াতেন। আমাদের অঞ্চলে সেকালে উইয়ের ঢিবির মত দেদার জমিদারবাবু ছিলেন আর তাঁদের সঙ্গে তাঁর একটা না একটা সম্পর্ক ছিল। সে সম্পর্ক যে কি, তাও কেউ জানত না; কিন্তু এর-ওর বাড়িতে অতিথি হয়েই তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। আর সব জায়গাতেই তিনি আদর-যত্ন পেতেন। তিনি একে ব্রাহ্মণ, তার উপর কথায়-বার্তায় ও ব্যবহারে ছিলেন ভদ্রলোক। তাই তিনি দাদা হোন, মামা হোন, দূরসম্পর্কে শালা হোন, ভগ্নিপতি হোন—সকলেই তাঁকে অতিথি করতে প্রস্তুত ছিলেন। টাকা তিনি কারও কাছে চাইতেন না। তাঁর নাকি কাশীতে একটি বিধবা আত্মীয়া ছিলেন, আবশ্যক হলে তাঁর কাছ থেকেই টাকা পেতেন। সে মহিলাটির নাম সুখদা। সুখদার নাকি ঢের টাকা ছিল, আর সন্তানাদি কিছু ছিল না। তাই সুখদার আপনার লোক বলে তাঁর মানও ছিল।

সারদা-দাদার আগমনে আমরা ছেলেরা খুব খুশি হলুম, যদিও ইতি-পূর্বে তাঁকে কখন দেখিনি, তাঁর নামও শুনিনি। আমাদের মনে হল, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বাঁচব। কলকাতায় আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজনও ছিল না, কোন বন্ধু-বান্ধবও ছিল না, যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে সময় কাটানো যায়। আর ইস্কুলে সহপাঠীদের সঙ্গে গল্প করেও চমৎকৃত হতুম না, কারণ সেকালে কলকাত্তাই ছেলেদের কথাবার্তার রস কলকাতার দুধের মতই ছিল নেহাত জলো।

সারদা-দাদা রোজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের দেদার গল্প বলতেন; জীবনে

তিনি যা দেখেছেন, তারই গল্প। মা অবশ্য আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, সারদা যা বলে তার ষোলো আনাই মিথ্যে। কিন্তু তাতে আমরা ভড়কাইনি। কেননা মিথ্যা কথা আদালতে চলে না, কিন্তু গল্পে দিবারাত্র চলে। সে যাই হোক, সারদা-দাদা বেশির ভাগ ভূতের গল্প বলতেন। তবে সে কথা আমরা মার কাছে ফাঁস করিনি। শুনিছি বাবার একজন প্রিয় তামাকওয়ালা দাদার কাছে নিত্য ভূতের গল্প বলত, ফলে দাদা নাকি রাত্তিরে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে ভয় পেতেন। তারপর বাবা তাঁর প্রিয় তামাকওয়ালার আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। পাছে মা সারদা-দাদাকে বিদায় করে দেন, এই ভয়ে মার কাছে এ গল্প-সাহিত্যের আর পুনরাবৃত্তি করতুম না। তা ছাড়া কলকাতা শহরে ত ভূতের ভয় নেই। রাস্তায় আলো, পথের ধারে শুধু বাড়ি, জঙ্গল নেই। ভূতেরা আলোকে ভয় করে, ও মানুষের চেঁচামেচিকে। কলকাতায় আলো যতটা না থাকে, হল্লা দেদার আছে। অত হট্টগোলের মধ্যে ভূত আসে না। সারদা-দাদা শুধু সেই সব ভূতের গল্প বলতেন, যাঁদের তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম—আপনি ত' শুধু পাড়াগেঁয়ে ভূতের গল্প করেন, আপনি কি কখনো সাহেব ভূত দেখেন নি?

সারদা-দা উত্তর করলেন—দেখব কোত্থেকে?—সাহেবরা ত এদেশে আর মরে না। না মরলে তারা ভূত হবে কি করে? দেখো, ট্রেনে এত বড় বড় কলিসান হয়, যাতে হাজার হাজার দেশী লোক মরে; কিন্তু তাতে কোন সাহেব মরেছে, এমন কথা কি কখনো শুনেছ?

—তবে এত গোরস্থানে কারা পোঁতা আছে?

—সব ফিরিঙ্গি। তবে দু'চারজন সাহেব যে মরে না, এমন কথা বলছিনে। কিন্তু যারা মরে ভূত হয়, তাদের আমরা দেখা পাইনে।

—কেন?

—এদেশে তারা গাছেও থাকে না, পায়ে হেঁটেও বেড়ায় না। তারা ট্রেনের ফার্ষ্ট ক্লাশ গাড়ীতে চড়ে বেড়ায় আর ফিরিঙ্গি ভূতেরা সেকেন্ড ক্লাশ গাড়ীতে। তবে একবার একজনের দেখা পেয়েছিলুম। আর তার হাতে যে সাজা-শাস্তি পেয়েছিলুম, তা আর বলবার কথা নয়। আজও মনে হলে কান্না পায়।

—আমরা সেই সাহেব ভূতের গল্প শুনতে চাই।

সারদা-দা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—আচ্ছা বলছি শোনো। কিন্তু এ গল্প যেন আর কাউকে বলো না।

—কেন?

—কি জানি, আবার যদি মানহানির মামলায় পড়ে যাই। মরা লোকেরও মানহানি করলে জরিমানা হয়, জেলও হয়। আবার জেল খাটতে আমার ইচ্ছে নেই। এর পর সারদা-দাদা বললেন —

আমি একবার কলকাতা থেকে কাশী যাচ্ছিলুম। হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছলুম, তখন গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে। তাই একটা খালি ফার্স্ট ক্লাশ গাড়ীতে উঠে পড়লুম এই মনে করে যে, পরের স্টেশনে নেমে থার্ড ক্লাশে ঢুকব। গাড়ী ত ছাড়ল, অমনি বাথরুম থেকে একটি সাহেব বেরিয়ে এল। ঝাড়া সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, মুখ রক্তবর্ণ, চোখ গুগ্‌লির মত। আর তার সর্বাঙ্গে বেজায় মদের গন্ধ বেরচ্ছে, আর সে বিলিতী মদের। সে ঘরে ঢুকেই বললে, "কালা আদমী, নিচু যাও!" আমার তখন ভয়ে নাড়ী ছেড়ে গিয়েছে, আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, "হুজুর আভি কিস্তরে নিচু যায়েগা? দুস্‌রা স্টেশনমে উতার যায়েঙ্গে!" তিনি বললেন—"ও নেহি হো সকতা। তোমরা কাপড়া বহুত ময়লা, আর তোমরা দেহ্‌ মে বহুত বদ্‌ বু। গোসালখানামে যাকে তোমরা কাপড়া উতারকে গোসল করো। আর হুঁই বৈঠ রহো। হাম চলা যানেসে তুম গোছলখানাসে নিকলিয়ো। হাম যো বোল্‌তা আভি করো, জানতা হাম রেলকো বড়া সাহেব হ্যায়?" আমি প্রাণের দায়ে হুজুর যা বললেন তাই করলুম। অর্থাৎ স্নানের ঘরে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে সেই শীতের রাত্তিরে স্নান করলুম। অমনি একটা দমকা হাওয়া এসে আমার কাপড়-চোপড় উড়িয়ে কোথায় নিয়ে গেল! আমি বিবস্ত্র হয়ে ভিজে গায়ে গোসল-খানাতেই বসে রইলুম। আর সাহেব তাঁর কামরায় হুটোপাটি করতে লাগলেন ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে আমার প্রতি শুয়োর গাধা উল্লুক প্রভৃতি প্রিয় সম্ভাষণ করতে লাগলেন। আমি নীরবে সব গালিগালাজ হজম করলুম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে কেটে গেল। আমি ভিজে গায়ে হি হি করে কাঁপছি, সর্বাঙ্গে এক টুকরো কাপড় নেই, আর পাশের ঘরে বড় সাহেব মদ খাচ্ছেন ও লাফাচ্ছেন।

মাঝপথে গাড়ী হঠাৎ মিনিটখানেকের জন্য থামল। ক্লিক্‌ করে একটা আওয়াজ হল—ছিট্‌কিনি খোলবার আওয়াজ। তারপর গাড়ী ফের চলতে লাগল। পাশের ঘরে টু শব্দ নেই, তাই আমি স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে সে ঘরে যাবার চেষ্টা করলুম। ও সর্বনাশ! বড় সাহেব, স্নানের ঘরের দুয়োরে ছিট্‌কিনি টেনে বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি সেই অন্ধকূপের ভিতর আটক থাকলুম। আধঘণ্টা পর গাড়ী বর্ধমানে এসে পৌঁছল। আর আমি বাথরুমের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, যা থাকে কপালে ভেবে 'কুলি' 'কুলি'

বলে চীৎকার করতে লাগলুম। তারপর একজন কুলি এসে, ছিট্‌কিনি খুলে, আলো জেবলে আমাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ভূত ভেবে পালিয়ে গেল। শেষটা স্টেশন-মাস্টার বাবু এসে—"ভূত নেহি হ্যয়, চোর হ্যয়" বলাতে কুলিরা পাশের ঘরে ঢুকে আমাকে মারতে মারতে আধমরা করে প্ল্যাটফরমের উপর টেনে নিয়ে গেল।

স্টেশন-বাবু বললেন, "শিগ্‌গির ওকে একটা কাপড় পরিয়ে দে। যদি কোন মেমসাহেব হঠাৎ এসে উলঙ্গমূর্তি দেখে মূর্ছা যান, তাহলে আমার চাকরি যাবে।" একজন আমাকে একটি ছেঁড়া কাপড় দিলে, সেই কাপড় পরে আমি স্টেশন-বাবুকে সব কথা বললুম। তিনি বললেন, যে রেলের বড় সাহেব এখন সিমলায়; তা ছাড়া এ ট্রেনে কোন সাহেব আসেওনি, কোথাও নেমেও যায়নি। এখন বুঝলুম যার হাতে আমি নাস্তানাবুদ হয়েছি, সে সাহেব নয়—সাহেবের ভূত। তারপর স্টেশন বাবু আমাকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেও প্রথম একপত্তন মার হল; তারপর দারোগাবাবুর জেরা। যা ঘটেছিল, সব তাঁকে বললুম। তিনি ভূতের কথায় বিশ্বাস করলেন, কেননা তিনিও একটি পেত্নীর হাতে পড়ে বেজায় নাজেহাল হয়েছিলেন।

তার পরদিনই দারোগাবাবু আমাকে আদালতে হাজির করিলেন। আমার অপরাধ নাকি গুরুতর আর অবিলম্বে আমার বিচার হওয়া চাই। হাকিম-বাবু ছিলেন অতিশয় ভদ্রলোক, উপরন্তু উচ্চশিক্ষিত। তিনি গাড়ীতে ভূতের উপদ্রবের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন, কারণ, তিনি ছিলেন ঘোর 'থিয়োজফিস্ট্‌'। কিন্তু ভগবানের দোহাই ও ভূতের দোহাই ইংরেজের আদালতে চলে না। ভগবান ও ভূত এ দুয়ের অস্তিত্ব বে-আইনী। অগত্যা তিনি আমাকে এক মাসের মেয়াদে জেল দিলেন। আমার অপরাধ বিনা টিকিটে বিনা বসনে ফার্স্ট ক্লাশ গাড়ীতে গাঁজা খেয়ে ভ্রমণ। তারপর আমাকে সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে—গাঁজা খাও ত খেয়ো। কিন্তু গাঁজায় দম দিয়ে আর কখনো বিনে টিকিটে ট্রেনে চড়ো না, বিশেষত তৈলঙ্গ-স্বামী সেজে ফার্স্ট ক্লাশে ত নয়ই।

আমি বললুম—"হুজুর, গাঁজা আমি খাইনে।" তিনি বললেন, "গাঁজাখোর বলেই ত তোমাকে লঘুদণ্ড দিলুম, নইলে তোমাকে দায়রা সোপর্দ করতুম।"

এখন তোমরা ফার্স্ট ক্লাশ ভূতের কথা ত শুনলে? এদের তুলনায় পাড়া-গেঁয়ে ভূতরা ঢের বেশি সভ্য।

ভোম্বলদাসের কৈলাস যাত্রা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিংহির মামা ভোম্বলদাস নেহাত সেকালের জানোয়ার; রাজকার্য চালাবার মতো বুদ্ধিও তাঁর ছিল না, গায়েও জোর যে খুব ছিল তাও নয়; খোস-মেজাজে সেজে-গুজে সিংহাসনে বসে, আয়েস আর আমোদ-আহ্লাদ করতেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। রাজকার্য করবার নাম শুনলে তাঁর জ্বর আসত, লড়াই করা তো দূরের কথা। কিন্তু দেশ বিদেশের সবাই তাঁকে খুব মস্ত রাজা বলে জানত। সবাই বলত—"সিংহির মামা ভোম্বলদাস, বাঘ মেরেছে গণ্ডা দশ!"

যে ভোম্বলদাস ঘরের কোণে আরশোলা উড়লে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যান, তিনি কেমন করে দশ গণ্ডা বাঘ মারলেন? ভোম্বলদাসের একটি মস্ত গুণ ছিল; সেটি হচ্ছে মন্ত্রী বেছে নেবার। দেখে দেখে তিনি শেয়াল-পণ্ডিতকে আপনার প্রধান মন্ত্রী কোরে নিয়েছিলেন; আর তাঁরই পরামর্শে দশ গণ্ডার চেয়েও ঢের বেশি বাঘ মেরে তিনি পশুদের মধ্যে একচ্ছত্র রাজা হয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন।

কিন্তু কপাল? বনের যত জোরোয়ার, জানোয়ার দেশের চারিদিকে সুখ-শান্তি দেখে ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠলো। তারা কোথাও একটা লড়াই বাধিয়ে খানিক হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি মাথা-ফাটাফাটি করতে ভোম্বলদাসকে ধরে পড়লো। ভোম্বলদাস শেয়ালের সঙ্গে যুক্তি করে বললেন—"আমার শত্রু যারা ছিল সব তো যমের বাড়ি পাঠিয়েছি; লড়াই হবে কার সঙ্গে?"

দুষ্ট জানোয়ার তারা আগে হ'তেই সড় কোরে এসেছিল; তারা পিঁপড়ে-দের ক্ষুদে শহরের উপর চড়াও হ'য়ে লড়াই দেবার জন্য অনুরোধ ক'রলে। শেয়াল পণ্ডিত বললেন—"এমন কাজ কোরো না। তারা দেখতে ছোট, কিন্তু কামড়ালে আর রক্ষে নেই!"

সবাই হেসে শেয়ালের কথা উড়িয়ে দিলে। লড়াই বাধলো। জীবনের মধ্যে ভোম্বলদাস এই এক ভুল করলেন,—বুদ্ধিমানের কথা ঠেলে, গায়ের জোরের মান রাখতে গেলেন। তার ফলও ফলতে দেরি হ'লো না। লড়াই তো যেমন হ'বার হ'লো, কিন্তু ক্ষুদে শহরের একটি ইঁটও কেউ খসাতে পারলে না। উল্টে সিংহির মামা ভোম্বলদাস বুড়ো বয়সে হাতে-মুখে-নাকে চোখে-কানে-ল্যাজে বুকে-পিঠে-পেটে এমন কামড় খেলেন যে সর্বাঙ্গ ফুলে ঢোল। না পারেন চলতে, না পারেন বলতে; খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, কাজে

মন দিতে গেলে মাথা ঘোরে। জানোয়ারদের মুল্লুকে রাজ-কার্য অচল হ'লো। শেয়াল পণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। বাঘা-কোটাল, ভালুক-মন্ত্রী এমনি সব রাজ্যের বড় বড় আমির-ওমরা গো-বদ্যিকে ডেকে রাজার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে লাগলেন; কিন্তু ঘুটে ভস্ম, গোবর প্রলেপ এসবে কিছুই হ'লো না। তখন বকা-ধার্মিক এসে ভোম্বলদাস মহারাজকে কৈলাস যাবার ব্যবস্থা দিলেন। মহারাজও ভাগ্নে সিংহকে রাজ্যের ভার দিয়ে কিছুদিনের জন্যে কৈলাসের দিকে রওনা হ'তে প্রস্তুত হ'য়ে বললেন—"আমি তো চলৎ-শক্তি-রহিত, আমাকে কেউ যদি রেখে আসে তো কৈলাসে যাওয়া ঘটে—নচেৎ উপায় নাস্তি!"

বকা-ধার্মিককে রাজার সঙ্গে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ দেওয়া হ'লো। কিন্তু কৈলাসে দুরন্ত শীত, তার উপর সেখানে মাছ খাওয়া নিষেধ, কাজেই—বকা পিছলেন। তিনি গেলে পশুদের ধর্ম-কথা শোনায় কে? বাঘা-কোটালেরও ঐ একই কথা। তিনি না থাকলে গৃহস্থের গোরু-জরু সামলায় কে? ভালুক-মন্ত্রী যেতে পারতেন, কিন্তু নতুন রাজা সিংহকে নিয়ে রাজকার্য চালাবার জন্যে সদরে থাকা তাঁর বিশেষ দরকার। কাজেই তাঁরও যাওয়া হয় না। শেয়াল পণ্ডিতকে রাজা বললেন—"পণ্ডিত, তুমি কি বল?" পণ্ডিত কি জানি ভেবে বললেন—"জানোয়ারদের দেশে গায়ের জোরের চর্চাই দেখছি বেশি, বুদ্ধির চাষ কম, সুতরাং এ রাজ্য থেকে আমি চলে গেলে কোন কাজই আটকাবে না। গর্দভ রইলেন পাঠশালাগুলোর তদারক করতে। আমি মহারাজকে সশরীরে কৈলাসে পেঁাছে দিয়ে আসি।"

রাজা খুশি হ'য়ে শেয়ালকে কৈলাস যাত্রার আয়োজন করতে তখন হুকুম দিয়ে সভা ভঙ্গ করলেন।

কৈলাসে শীত বিষম, কাজেই রাজ্যের ভেড়া মেরে শেয়াল তাদের ছাল সংগ্রহ ক'রতে লাগলেন; আর পথে খাবার জন্যে ভেড়ার মাংস, ছাগলের মাথাগুলোও বোঝা বাঁধা হ'লো। এ ছাড়া নানা সুস্বাদু পাখী, খরগোস এমন কি রাজার জন্যে কাঁচ কাঁচ বাঘ-ভালুকের গা থেকে ছাল পর্যন্ত ছাড়িয়ে নেওয়া হ'লো। বকের পালকের বালিশ, লেপ-তোষক; গণ্ডারের ছালের প্যাঁটরা আর জুতো, মোষের শিঙের ছড়ি, গজদন্তের খড়ম—এমনি নান সামগ্রী শেয়ালের কাছে দিনে দিনে স্তূপাকার হয়ে উঠলো।

এদিকে জানোয়ারদের ঘরে ঘরে কান্না উঠেছে, কিন্তু রাজার প্রয়োজনে এই সব সংগ্রহ করছেন শেয়াল পণ্ডিত—কারো কথাটি বলবার সাধ্য নেই। ভালুক-মন্ত্রী বকা-ধার্মিককে ব'লে ক'য়ে যাতে রাজার চট্‌পট্ যাওয়া হয় এমন একটা ভালো দিন পাঁজি পুঁথি দেখে স্থির করতে ব'লে দিলেন। সামনে অশ্লেষা-মঘা

সেইদিনই উত্তম বলে ঠিক হ'লো। প্রজারা সবাই রাজাকে বিদায় দিতে এলো! রাজার কৈলাস-যাত্রার সাজ-সরঞ্জাম জুগিয়ে প্রজারা কেউ নুন-ছালের জ্বালায়, কেউ দাঁতের বেদনায়, কেউ বা ছেঁড়া পালকের শোকে চোখ মুখ ফুলিয়ে এসেছেন দেখে, শেয়াল রাজাকে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রজারা তাঁরই বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে ক্রন্দন ক'রছে। ভোম্বলদাস খুশি হ'য়ে সবাইকে আশীর্বাদ কোরে রওনা হ'লেন। পিছনে শেয়াল আর তার দলবল রাজ্যের যা কিছু ধন-দৌলত আসবাব-পত্র নিয়ে রাজার সঙ্গে কৈলাস যাত্রা করতে চল্লো।

এদিকে গ্রামে গ্রামে ঘাটিতে ঘাটিতে খবর এসেছে ভোম্বলদাস কৈলাসে চলেছেন। সবাই রাজা দেখতে পথের দুই ধারে ভিড় লাগিয়েছে। ভোম্বলদাস রয়েছেন রামছাগলের চামড়ার কম্বলে ঢাকা ডুলির মধ্যে।

আর শেয়াল চলেছে আগে আগে বুক ফুলিয়ে। পাড়াগেঁয়ে জানোয়ার তারা, কোনো দিন রাজাকে চোখে দেখেনি, শেয়ালকেই রাজা ভেবে তারা দু'হাতে সেলাম দিতে লাগলো; সঙ্গের ডুলির কম্বলে মুড়ি দেওয়া ভোম্বলদাসকে তারা ভাবলে রাণী!

সুন্দরবনের সিংহগড় থেকে শেয়াল-পণ্ডিতের বাড়ি জাম্বুকগড় হ'লো তিন হপ্তার পথ; আর কৈলাস হ'লো তিন মাসেরও বেশি রাস্তা। বুড়ো ভোম্বল-দাসের সঙ্গে দেশ ছেড়ে এতটা যাওয়া শেয়ালের আদপেই ইচ্ছা ছিল না। সে যত শীঘ্র পারে বুড়ো রাজার সঙ্গে তাঁর ধন-দৌলত ঘরে এনে ফেলবার মতলবে আছে।

এদিকে কিন্তু ডুলির মধ্যে ঝাঁকানি খেতে খেতে রাজার প্রাণান্ত হ'বার যোগাড় হ'য়েছে। তাঁর ইচ্ছা ঘাটিতে ঘাটিতে জিরিয়ে যাওয়া। যেখানে ভালো গ্রাম দেখেন সেইখানেই রাজা বলেন—"ওহে পণ্ডিত, জায়গাটা তো ভালো বোধ হচ্ছে। দু-একদিন এখানে থেকে গেলে হয় না?"

শেয়াল অমনি বলে ওঠে—"না মহারাজ, এখানে থাকা চলবে না, এটা হ'লো মশা-ভনভনানির দেশ। রাত্রে নিদ্রা মোটেই হ'বে না—এগিয়ে চলুন!"

আরো কতদূর গিয়ে রাজা বলেন—"ওহে এস্থানটা কেমন?"

"মহারাজ, এটা হাড়মড়মড়ি শহর! একঘন্টা এখানে কাটালেই বাতে ধরবে!"

"ওহে পণ্ডিত, এ জায়গাটা?"

"সর্বনাশ! এটা পিঁপড়ে-কাঁদা গ্রাম! এখানে থাকা হ'তেই পারে না—না খেয়ে প্রাণ যাবে!"

এইভাবে রাজাকে কখনো ভয় দেখিয়ে—কখনো মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে দিনরাত চলে' এক হপ্তায় তিন হপ্তার পথ নিজের আড্ডায় এসে হাজির। কিন্তু শেয়ালের গর্তে তো সিংহের মামা প্রবেশ করতে পারেন না, কাজেই বাইরে গাছ-

তলায় তাঁকে শোয়ানো হ'লো; ধন-দৌলত সমস্তই শেয়ালের গর্তে গিয়ে পোঁছলো। রাজা ডুলি থেকে কষ্টে মাটিতে নেমে বলেন—"ওহে পণ্ডিত, কৈলাস আর কতদূর?"

"কাছে মহারাজ! ঐ যে কৈলাসের চূড়ো দেখা যায়!" রাজাকে কিছু দূরে একটা উইঢিবি দেখিয়ে দিলেন। রাজা খুশি হ'য়ে বললেন—"তাহলে এই গাছতলায় দিন কতক আরাম করা যাক! একটু সুস্থ হ'য়ে পাহাড়ে ওঠা যাবে।"

শেয়াল বললেন—"মহারাজ, এইখানে বসে কিছুদিন তপস্যা করুন; পশুপতির কৃপায় দুদিনেই রোগের শান্তি হবে।" এই বোলে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে শেয়াল নিজের গড়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

মাস্টার মহাশয়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে, বর্ধমান শহর হইতে ষোল ক্রোশ দূরে, দামোদর নদের অপর পারে, নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি দুইটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; এবং উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর একটি প্রাচীন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। এখন সে গ্রাম দু'খানিও নাই, বট বৃক্ষটিও অদৃশ্য—দামোদরের বন্যা সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ফাল্গুন মাস; এক প্রহর বেলা হইয়াছে। গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর প্রজা এবং গ্রামের অভিভাবক-স্থানীয় কায়স্থ সন্তান শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস দত্ত মহাশয় হুঁকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুজ্যে ও কেনারাম মল্লিক (ইহাঁরাও বড় প্রজা) নিকটে বসিয়া, এ বৎসর চৈত্র মাসে বারোয়ারী অন্নপূর্ণা পূজা কিরূপ ভাবে নির্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন। পাশ্ববর্তী নন্দীগ্রামেও প্রতি বৎসর চাঁদা করিয়া ধূমধামের সহিত অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে।

তিন পুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোনও বিষয়েই নন্দীপুরের নিকট হটে নাই এবং আজিও হটিবে না। তিনজন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় রামচরণ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং হাতের লাঠিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া ধপাস্ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হীরু দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে মোড়লের পো, বসে পড়লে কেন? কি হয়েছে?'

রামচরণ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন দত্তজা কি হতে আর বাকী আছে? হায় হায় হায়—কার্তিক মাসে যখন আমার জ্বরবিকার হয়েছিল. তখনই আমি গেলাম না কেন? এই দেখবার জন্যে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলি, হারে বিধেতা তোর পোড়া কপাল!

শ্যামাপদ ও কেনারামও ঘোর দুশ্চিন্তায় রামচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন, দত্তজা বলিলেন, কি হয়েছে? সব কথা খুলে বল। এখন আসছ কোথা থেকে?'

দীর্ঘশ্বাস জড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল, 'নন্দীপুর থেকে। হায় হায়, শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল। হা—রে কপাল!—' বলিয়া রামচরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল।

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, কেন? নন্দীপুরওয়ালারা কি করেছে?'

'বলছি। বলবার জন্যেই এসেছি। এই রোদ্দুরে মশাই, এক কোশ পথ ছুটতে

ছুটতে এসেছি। গলাটা শুকিয়ে গেছে এক ঘটি জল—'

দত্তজার আদেশে অবিলম্বে এক ঘড়া জল এবং একটি ঘটি আসিল। রামচরণ উঠিয়া রোয়াকের প্রান্তে বসিয়া, সেই জলে হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিল; কিঞ্চিৎ পানও করিল। তার পর হাত মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া বসিয়া, গভীর বিষাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রহিল।

হীরুদত্ত বলিলেন, 'এবার বল কি হয়েছে, আর দগ্ধে মেরো না বাপু!'

রামচরণ বলিল, 'কি হয়েছে? যা হবার নয় তাই হয়েছে। বড় বড় শহরে যা হয় না নন্দীপুরে তাই হয়েছে। এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও যা স্বপ্নেও ভাবেনি, তাই হয়েছে। তারা হুস্কুল বসিয়েছে।'

তিন জনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কি আবার? হুস্কুল কি?'

রামচরণ বলিল, 'আরে ছাই আমিই কি জানতাম আগে হুস্কুল কার নাম? আজ না শুনলাম! ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালাকে হুস্কুল বলে।'

দত্তজা বলিলেন, 'ওঃ—ইস্কুল খুলেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তাই খুলেছে। একজন ম্যাস্টার নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠ-শালের গুরু মশায়কে নাকি ম্যাস্টার বলে। দাশু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে হুস্কুস বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম, ম্যাস্টার বসে' দশ বারোজন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্চে।'

হীরুদত্ত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাস্টার কোথা থেকে এনেছে—তা কিছু শুনলে?'

'সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্ধমান থেকে এনেছে। বামুনের ছেলে—হারাণ চক্রবর্তী। পনরো টাকা মাইনে, বাসা, খোরাক। সব খবরই নিয়ে এসেছি।'

বাহিরে এই সময়ে একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পিলপিল করিয়া লোক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে আসিতে, নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই অভূতপূর্ব পরাভব সংবাদ প্রচার করিয়া আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চীৎকার করিয়া নানা ছন্দে বলিতে লাগিল, 'এ কি সর্বনাশ হল! নন্দীপুরের হাতে এই অপমান! আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কি উপায় হবে?'

হীরুদত্ত সেই রোয়াকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—

'ভাই সকল! তোমরা কি মনে করেছ, তিন পুরুষ পরে আজ গোঁসাইগঞ্জ নন্দীপুরের কাছে হটে যাবে? কখনই না। এ দেহে প্রাণ থাকতে নয়। আমরাও ইস্কুল খুলবো। ওরা বা কী ইস্কুল খুলেছে, আমরা তার চতুর্গুণ ভালো ইস্কুল খুলবো। তোমরা শান্ত হয়ে ঘরে যাও। আজই খাওয়া দাওয়া করে' আমি

বেরুচ্চি। কলকাতা যাবার রেল খুলেছে—আর ত কোনও ভাবনা নেই। আমি কলকাতায় গিয়ে ওদের চেয়েও ভাল মাস্টার নিয়ে আসবো। ওরা ১৫৲ দিয়ে মাস্টার এনেছে? আমরা ২৫৲ মাইনে দেবো। ওদের মাস্টারকে পড়াতে পারে এমন মাস্টার আমি নিয়ে আসবো। আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাবো—বসাবো—বসাবো, তিন সত্যি করলাম। এখন যাও তোমরা বাড়ি যাও, স্নানাহার করগে।'

'জয় গোঁসাইগঞ্জের জয়। জয় হীরু দত্তের জয়!'—সোল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল।

২

কলিকাতা হইতে মাস্টার নিযুক্ত করিয়া হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাস্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স ত্রিশ বৎসর, খর্বাকার কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজি বলিতে কহিতে লিখিতে পড়িতে তিনি নাকি ভারি ওস্তাদ। ইংরাজিটা তাঁর এতই বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ইংরাজি কথা মিশাইয়া ফেলেন—অজ্ঞ লোকের সুবিধার্থ আবার তাহা বাঙ্গলা করিয়া বুঝাইয়াও দেন। বলেন, পূর্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলকাতার গঙ্গার ধারে মাস্টার মহাশয় নাকি বেড়াইতেছিলেন, তথায় এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া, লাট সাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিলেন। লাট সাহেব মাস্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া, ডেপুটি কালেক্টারির পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না। সেই প্রস্তাব তিনি বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫৲ টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল! পুরুষস্য ভাগ্যং!—মাস্টার মহাশয়ের মুখে এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ইংরাজিয়ানা চাল-চলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

হীরুদত্তর প্রতিজ্ঞা অনুসারে, পরদিনই স্কুল খুলিল। পনরো ষোলটি ছাত্র লইয়া মাস্টার মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে (দত্তজার ব্যয়ে) তিনি প্রচুর পরিমাণে সেলেট, পেন্সিল ও মরে সাহেবের স্পেলিং বুক পুস্তক খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন, ছাত্রগণের উৎসাহ বর্ধনার্থ সেগুলি তাহাদিগকে বিনামূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথে-ঘাটে দেখা হইলে উভয়

গ্রামের মাস্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত—'বর্ধমানের মাস্টার, ও জানেই-বা কি, আর পড়াবেই বা কি!' নন্দীপুর বলিত—'হলেই বা আমাদের মাস্টারের বর্ধমানে বাড়ি, তিনিও ত কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওঁরা যখন পড়তেন, তখন কি বর্ধমানে ইংরিজি ইস্কুল ছিল? কলকাতায় গিয়ে ইংরিজি পড়তে হত।'

যথা সময়ে উভয় গ্রামের বারোয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামই উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, যাত্রা ও ঢপ-সঙ্গীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষে উভয় মাস্টারের দেখা সাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল, উভয়ে পূর্বাবধি পরিচিত।

পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাস্টার নাকি বলিয়াছেন—'ঐ বেজা বুঝি ওদের মাস্টার হয়ে এসেছে, তা এদ্দিন জানতাম না! ওটা ত মহামূর্খ! ছেলেবেলায় কলকাতায় আমরা এক কেলাসে পড়তাম কিনা। আমরা যখন সেকেন বুক পড়ি, সেই সময়েই ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর আর ত ও ইংরেজি পড়েনি। বড়বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখত, মাইনে ছিল সাত টাকা। গেল বছরও ত কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়; তখনও ত ঐ চাকরি করছে।'

গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজ মাস্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কি শুনছি?'

ব্রজ মাস্টার এ প্রশ্ন শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন— 'একেই বলে কলিকাল। সেকেন বুক পড়ার সময় আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ও-ই ছেড়ে দিয়েছিল? হয়েছিল কি জানন বুঝি? মাস্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞাসা করতো, ও একদিনও বলতে পারতো না। মাস্টার একদিন ওকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে, ও এন্‌সার করতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি বল্লাম। মাস্টার আমায় বল্লে, 'দাও ওর কান মলে।' আমি কান মলে দিতেই, ওর মুখচোখ রাগে রাঙা হয়ে গেল। ও বলতে লাগলো; আমি হলাম বামুনের ছেলে, ও কায়েত হয়ে কি না আমার কানে হাত দেয়! সেই অপমানে ও-ই ত ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তার পর পাঁচ ছ' বছর সেই ইস্কুলে পড়ে, একেবারে লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম।'

অতঃপর গোঁসাইগঞ্জের লোক, নন্দীপুর কর্তৃক ব্যক্ত ঐ অপবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে হারাণ মাস্টার বলিল, 'আমরা ইস্কুলে যে মাস্টারের কাছে পড়তাম, তিনি আজও বেঁচে আছেন। গোঁসাইগঞ্জ থেকে তোমরা দুজন মাতব্বর লোক আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে; তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখ কার কথা সত্যি, কার কথা মিথ্যে।'

একথা শুনিয়া ব্রজ মাস্টার হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, 'অ্যা! এই কথা

বলেছে? ও সব ত বিলকুল ফল্‌সো—মিথ্যে কথা। সেই মাস্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে ভজিয়ে দেবে? তিনি কি আর বেঁচে আছেন? গেল বছরের আগের বছর, তিনি যে হেভেন—স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ইনভাইট—নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি বেশ মনে আছে। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন যে! একেবারে সন্‌ ইকোয়েল—পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরা আজও আমায় বেজো দাদা বলতে ইগ্নোরেণ্ট—অজ্ঞান।'

উভয় মাস্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ-প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামই স্ব স্ব মাস্টারের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনও প্রকাশ্য স্থানে দুই জনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাউক।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগত মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহারই নিম্নে বিচার সভা বসিবে। কিন্তু উভয় গ্রামের লোকেই ইংরাজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয় পরাজয় সম্বন্ধে কাহারও মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে, এমন একটি সরল বিচার প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। উভয় গ্রামের সম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে, মাস্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবে, অপরকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তবে উভয়ে তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল—আগামী বৈশাখী-পূর্ণিমা; স্থান—উপরিউক্ত বটবৃক্ষতল; সময়—সূর্যাস্ত।

৩

বিচারের দিন স্থির হইল—আগামী বৈশাখী-পূর্ণিমা; স্থান—উপরিউক্ত মাস্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যকরগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটা বৃহৎ রামশিঙ্গা লইয়া চলিয়াছে—ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাস্টারের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, 'কি হে মাস্টার, মুখ রাখতে পারবে ত? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক করে রাখ, হারাণ মাস্টার যেন কিছুতেই তার মানে বলতে না পারে।' ব্রজবাবু বলিলেন, 'আপনারা ভাবছেন কেন? দেখুন না কি করি!'

এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব যে তা শুনেই হারাণ মাস্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে—মানে বলা ত দূরের কথা! দত্তজা বলিলেন, 'দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার, তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।—' কেহ স্পষ্ট না বলিলেও ব্রজ মাস্টার ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে এ গ্রাম কল্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষতলে উপনীত হইল। শপ্, মাদুর, শতরঞ্জি প্রভৃতি বাহকেরা তৎপূর্বেই আসিয়া, নিজ গ্রামের সীমা-রেখার নিকট সেগুলি বিছাইয়া রাখিলেন। দূরে পঙ্গপালের মত নন্দীপুর-বাসিগণ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গেও শপ্, মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক, ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে।

ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার নিকট শপ্, মাদুর বিছাইয়া বসিয়া বসিয়া গেল। উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই তিন হাত মাত্র খালি জমি।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন্ মাস্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবি করিল। কোনও পক্ষই নিজ দাবি ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীরু দত্ত মহাশয় একটা ছড়ি ঘুরাইয়া ঊর্ধ্বে ছুড়িয়া দিউন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাস্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন।

'আমার ছড়ি লউন—আমার ছড়ি লউন' বলিয়া উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে যে ছড়িটি পাইলেন, তাহা লইয়া হীরু দত্ত সজোরে ঘুরাইয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিলেন।

ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল, তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিকে হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল; গোঁসাইগঞ্জের মুখটি চূণ হইয়া গেল। সকলে সাগ্রহে বিচার ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নন্দীপুরের হারাণ মাস্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজ-মাস্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল; কিন্তু মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

হারাণ মাস্টার তখন বলিলেন, বল দেখি, এর মানে কি—

HORNS OF A DILEMMA.

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাস্টার এই কূটপ্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন, 'এর মানে —'উভয়সঙ্কট'—কেমন কি না?'

'পেয়েছে—পেয়েছে—আমাদের মাস্টার পেয়েছে' বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। এখন ব্রজ মাস্টারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা আসিল।

ব্রজ মাস্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, , 'শোন হারাণবাবু, আমি তোমায় কোনও কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে, বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব। এ অঞ্চলে, মনে কর, তুমি আর আমি এই দু'জন যা ইংরেজিনবীশ আছি। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে তোমায় ঠকিয়ে দেবো, সেটা আমার মনঃপুত নয়। এতে হয়ত গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারেন—কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরেজিনবীশ হয়ে, আর একজন ইংরেজিনবীশের প্রকাশ্য সভায় অপমান ত করতে পারিনে! আচ্ছা, খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি—বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা এর মানে কি বল দেখি—I DONT KNOW.

হারান মাস্টার উচ্চস্বরে বলিলেন,—'আমি জানি না'।

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্তে গোঁসাইগঞ্জের দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুল বেগে নৃত্য ও চীৎকার করিতে লাগিল, 'হো হো জানে না—নন্দীপুর জানে না—হেরে গেল, দুও-দুও।'

হারান মাস্টার মহা বিপন্ন ভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় গোঁসাইগঞ্জের ঢাক, ঢোল, কাড়া-নাকাড়া ও রামশিঙ্গা সমবেত ভাবে গর্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

গোঁসাইগঞ্জ-নিবাসী কয়েকজন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তন্মধ্যে একজন ব্রজ মাস্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাদ্যভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শুনা গেল হারান মাস্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথায় ইস্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জে ব্রজ মাস্টার অপ্রতিহত প্রভাবে মাস্টারি এবং গ্রামস্থ সকলের অপত্য নির্বিশেষে ক্ষীর ননী ছানা ভুঞ্জন করিতে লাগিলেন।

খট্টাঙ্গ পুরাণ

সরলাবালা সরকার

আমাদের দেশে সেকালে পণ্ডিতগণ জনসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বাস্তবিক এই শ্রদ্ধা স্বভাবতই তাঁহারা পেতেন, কেননা পণ্ডিতগণ ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও একান্ত নিরহঙ্কারী, এবং পার্থিব ধনসম্পদে তাঁদের কোন আসক্তি ছিল না। টোলে তাঁরা ছাত্রদের অধ্যাপনা করবার সময় তাদের ভরণপোষণের ভারও গ্রহণ করতেন। তাঁদের জীবনযাপন প্রণালী যে কিরূপ সাদাসিদা ছিল সে সম্বন্ধে অনেক কাহিনী হয়তো তোমরা শুনেছো।

আবার এক শ্রেণীর পণ্ডিতও ছিলেন যাঁদের পাণ্ডিত্যের গর্ব ও জয়-লালসা এত বেশি ছিল যে তাঁরা শিষ্যগণকে সঙ্গে নিয়ে দেশে দেশে দিগ্বিজয় করে বেড়াতেন।

বাংলা দেশে নবদ্বীপ নগরী ছিল বিদ্যার এক পীঠভূমি। এখানে বহু চতুষ্পাঠী ছিল, এবং ন্যায়, সাংখ্য ও দর্শনশাস্ত্র সমূহ এবং ব্যাকরণের বহু অধ্যাপক ছিলেন। এই নবদ্বীপে একবার এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসে কি ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তার বর্ণনা আছে। সেই দিগ্বিজয়ীর নাম ছিল কেশব কাশ্মিরী। সম্ভবতঃ তিনি কাশ্মীর দেশের লোক ছিলেন। নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত নামক এক অতি অল্পবয়স্ক অধ্যাপকের কাছেই তিনি পরাজিত হন। এই তরুন অধ্যাপকটিকে তোমরা জান কি? ইনিই প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

তোমাদের আর একজন দিগ্বিজয়ীর দিগ্বিজয়ের মজার গল্প শোনাবার জন্য এই কাহিনী আরম্ভ করেছি। যে দেশে এই ঘটনাটি ঘটেছিল তার নাম আমি জানি না, তবে আমার মনে হয় যেন বাংলা দেশেই ঘটে থাকবে। কেননা বাংলা দেশই হ'ল গোপাল ভাঁড়ের দেশ।

'জয়' কথাটার সঙ্গে যুদ্ধ কথাটার এমন যোগ আছে যে, জয় মানেই মনে হয় লড়াইয়ে জেতা। যুদ্ধ অনেক রকমই আছে, সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ হ'ল সেকালের প্রথা। সেই অস্ত্র আবার যুগে যুগে বদল হয়েছে। পাথরের যুগে ছিল যুদ্ধ মানে পাথর ছোঁড়া। এখনও, ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেই আদিম যুগের যুদ্ধের অনুকরণে ছেলের দল ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করে।

তারপর হ'ল লাঠি আর তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ, মহাবীর ভীমসেন মস্ত গাছ উপড়ে নিয়ে যুদ্ধ করতেন, এমন কি পাহাড়ের চূড়া ভেঙে নিয়েও যুদ্ধ

করেছেন এমন কথাও মহাভারতে পাওয়া যায়। আর এখন যদি পাহাড় ভাঙ্গবার দরকার হয় তবে ডিনামাইট না হ'লে চলে না।

তীর-ধনুক আর ঢাল-তরোয়াল গেল বাতিল হয়ে, এল বিজ্ঞানের যুগ। সে যুদ্ধের বর্ণনা তো তোমরা অনবরতই শুনছো, আমি আর বেশি কি বল্‌বো। ডুবো-জাহাজ, এরোপ্লেন আর বোমার যুগ এসে গেল বিজ্ঞানের কৃপায়।

আবার একরকম যুদ্ধ আছে যাতে অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হয় না, তার নাম হ'ল বুদ্ধির প্যাঁচের লড়াই। কিন্তু সে রকম যুদ্ধের সেরা যুদ্ধই হ'ল তর্কযুদ্ধ। যা পরিশেষের অধ্যায়ে মুখোমুখী ছেড়ে শেষে হাতাহাতি হয়।

আমাদের বল্‌বার বিষয় হ'ল শাস্ত্রযুদ্ধ। সেকালে শাস্ত্র ছিল হয় তাল-পাতায়, নয় তুলোট কাগজে ভুষোর কালি দিয়ে লেখা কতকগুলি আলাদা আলাদা পাতা, সেগুলি একসঙ্গে মোটা সুতো দিয়ে গেঁথে তার দু' পাশে মলাট দেওয়া হ'ত নূতন ন্যাকড়া দিয়ে। সেই রকম তিন চার নৌকা বোঝাই পুঁথি আর দশ-পনর জন শিষ্য সঙ্গে নিয়ে এক দিগ্বিজয়ী এসে উপস্থিত হলেন সেই দেশের নদীর ঘাটে, যে দেশের কথা তোমাদের বল্‌ছি।

সেকালে নদীপথই ছিল যাতায়াতের পথ। যাহোক দিগ্বিজয়ী এসে ঘাটে নেমেই দিলেন ডঙ্কায় এক ঘা। সেকালে ডঙ্কাই কলিং বেলের কাজ করতো। ডঙ্কার শব্দেই নগরের লোক বুঝতে পারতো নগরে নূতন লোক আসছে। তারা আগন্তুককে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে দেখলে নদীর ঘাটে পুঁথি বোঝাই বজরার সারি। দিগ্বিজয়ী বললেন— 'অয়মহং ভোঃ' অর্থাৎ আমি এসেছি, আমি শাস্ত্র-যুদ্ধার্থী দিগ্বিজয়ী। নানা দেশে শাস্ত্রযুদ্ধে জয়লাভ করে পরাজিত পণ্ডিতের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছি, বহু জয়পত্রও আমার করতলগত হয়েছে, তাই আমার উপাধি দিগ্বিজয়ী। এদেশ শুনেছি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের দেশ, তাই সমযোদ্ধা এ দেশেই পাব আশা আছে। ভোঃ ভোঃ পণ্ডিতবর্গ—কে আমার সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধে অগ্রসর হতে চান, আসুন। সর্বশাস্ত্র ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি আমার অধিগত, যে কোন শাস্ত্রে বিচার করতেই আমি প্রস্তুত আছি।

পণ্ডিতগণ প্রমাদে পড়লেন, কি জানি শাস্ত্রের বিচার কোন্‌পথে যাবে কে জানে। পরাজয় হলে দেশের কলঙ্কের সীমা থাকবে না। আবার পরাজিতের সকল সম্পত্তিই যাবে জয়ীর অধিকারে।

পরাজয়ইবা হবে কেন? দেশ হ'ল পণ্ডিতের দেশ। তাঁরা অনেকেই মহা পণ্ডিত, নাইতে-খেতেও তাঁদের শাস্ত্রচর্চার বিরাম নেই। যাঁরা সঙ্গতিবান, তাঁদের বাড়ীর দাসদাসীরা পর্যন্ত শাস্ত্রের চর্চা করে, দাসীরা পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে মাজতে অন্য দাসীর সঙ্গে, আর চাকরেরা ঘর পরিষ্কার করতে করতেই অন্য চাকরের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে চিত্তবিনোদন করে। আবার বাড়ীর গৃহিণী

হয়তো রান্না করতে করতেই উত্তাপের উৎপত্তি 'কাষ্ঠ হইতে' না অগ্নির দাহিকা শক্তি হইতে তারই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন।

যে দেশে এমন সব পণ্ডিত আছেন, সে দেশের শাস্ত্রযুদ্ধে কেনইবা পরাজয় হবে। তবু—তবুও পণ্ডিতেরা এগিয়ে যেতে সাহস পাননি, আবার পরাজয় স্বীকার করতে গেলেও মর্যাদায় বাধে।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে সসম্মানে বাসা দেওয়া হয়েছে, ভারে ভারে ভোজদ্রব্য রাজা পাঠাচ্ছেন তাঁদের বাসাবাড়িতে। কিন্তু শাস্ত্র-বিচারের দিন আর ঠিক হয় না, কোন-না-কোন বাধা এসে পড়ছে, তাই বিচারের দিন স্থির করা হচ্ছে না।

অবশেষে দিগ্বিজয়ী অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। বললেন—'মহারাজ, বিচারে অযথা বিলম্ব করার প্রয়োজন কি? আপনি একটি জয়পত্রে স্বাক্ষর করে দিন, যে আপনার দেশের পণ্ডিতেরা পরাজয় মেনে নিয়েছে। সেই পত্র পেলেই আমি সন্তুষ্ট হয়ে চলে যেতে পারি।'

রাজা, পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা বিচারে অগ্রসর হবেন—না, পরাজয়ই মেনে নিয়ে দেশের মুখে কলঙ্কের কালি লেপে দেবেন?

পণ্ডিতেরা একেবারে নীরব।

রাজার নাপিত ছিল একপাশ, সে এগিয়ে এসে বললে— "মহারাজ, যদি অভয় দেন আর অনুমতি করেন, আমিই তবে বিচারে অগ্রসর হ'তে পারি।'

রাজা অবাক হ'য়ে গেলেন। পণ্ডিতেরা তো একেবারে স্তম্ভিত। নাপিত, একে অব্রাহ্মণ—শূদ্র, তারপর শাস্ত্রের সে কি জানে? অবশ্য পণ্ডিতের দেশের নাপিতেরও কিছু কিছু শাস্ত্রজ্ঞান থাকতে পারে, তাই বলে দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধে সে এগিয়ে যেতে সাহস করে?

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে নরসুন্দর, তুমি যে শূদ্র, ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে সম আসনে উপবেশন করবারই তো তোমার অধিকার নাই, আর শাস্ত্রেও তোমার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই, তুমি কি সাহসে সর্বশাস্ত্রবিশারদ দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে বিচারে অগ্রসর হতে চাও?'

নাপিত তৎক্ষণাৎ উত্তর করলে—"মহারাজ, আপনার পণ্ডিতদের শাস্ত্রজ্ঞান প্রচুর, কিন্তু সাহস নাই, আর আমার শাস্ত্রজ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক, সাহস খুবই আছে। আর মহারাজ, জাতির পরিচয় তো বেশভূষা ও আচার ব্যবহারে, সে আমি ঠিক ক'রে নেবো, সে বিষয়ে আপনি একটুও চিন্তিত হবেন না। আপনার অনুমতিরই কেবল অপেক্ষা।'

অগত্যা রাজা অনুমতি দিলেন, দেখাই যাক কি ঘটে। আর দেশের পণ্ডিতেরা যখন এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছেন না তখন উপায় বা কি? দেশের একজন

লোকও তো প্রতিপক্ষের আহ্বানে সাড়া দিল, জয় পরাজয় যাই হোক না কেন?

বিচারের দিন স্থির হয়ে গেল, রাজা এসে সিংহাসনে বসলেন, পণ্ডিতেরাও সকলে এলেন—তাঁরা হবেন মধ্যস্থ, অর্থাৎ ফুটবল খেলার রেফ্রির মতন, তবে একজনের জায়গায় অনেকে।

দিগ্বিজয়ী এলেন, সঙ্গে তাঁর শিষ্যগণ। দিগ্বিজয়ী কৌতূহল বোধ করছেন, তাই চারিদিকে তাকিয়ে দেখছেন, কে এমন অসমসাহসী যে তাঁর সঙ্গে বিচারে অগ্রসর হতে ভয় পায় না?

সব শেষে নাপিতও এল, গর্বিত পদক্ষেপে সে সভায় প্রবেশ করলে। এই কি সেই নাপিত? তাকে যে আর চেনাই যায় না। মুণ্ডিত মস্তক, সেই মস্তকের ঠিক মাঝখানে মরুভূমিতে ওয়েশিশের মত দীর্ঘ কেশগুচ্ছ সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। কেশগুচ্ছের প্রান্তে একটি জবার ফুল বাঁধা, এইটি হ'ল টিকি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জয়-পতাকা। সেই টিকি সগর্বে আন্দোলন করতে করতে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে দুই হাতে আশিস-মুদ্রা রচনা করে, নাপিত যখন অতি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকে রাজাকে অভিবাদন করে রাজার মহিমা ও কীর্তি-গাথা অনর্গলভাবে উচ্চারণ ক'রে যেতে লাগলো, তখন সভাস্থ সকলেই অবাক হ'য়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন, পরিচিত সেই ক্ষৌরকারকে এখন আর তাঁরা চিনতেই পারছেন না।

সবচেয়ে অবাক হলেন দিগ্বিজয়ী; তাঁর এমন গর্বিত প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পাবেন এ যেন তিনি কল্পনাই করতে পারেননি, তাঁর একটু ভয়ও হ'ল বৈকি, কি জানি কতবড় মহা পণ্ডিতের সঙ্গেই না জানি আজ তাঁকে শাস্ত্রের লড়াই করতে হবে? পরাজয়? দিগ্বিজয়ীর পরাজয়? এ যদি সম্ভব হয় তবে তিনি তারপর আর মুখ দেখাবেন কি করে?

চতুর নাপিত মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিল, দিগ্বিজয়ী ভয় পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থলে প্রবেশ করলো কয়েকজন বাহক একখানা তিন চার হাত লম্বা কাপড়ে জড়ানো জিনিস কাঁধে করে। জিনিসটির আকার কতকটা যেন পুঁথির মত, কিন্তু অতবড় লম্বা পুঁথি? দিগ্বিজয়ী প্রশ্ন করলেন, 'বস্তুটি কি, কেনই বা সভাস্থলে আনা হ'ল?'

উত্তরে প্রতিপক্ষ উচ্চ হাস্য করে উঠলেন। বললেন, 'ওটি যে কাঠের তক্তায় মোড়া বস্ত্রাবরণে সংরক্ষিত মহামূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ,— যিনি চিরকাল শাস্ত্রচর্চা করেছেন তিনি কি সেটা দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন না? না, তিনি কৌতুক করছেন? দিগ্বিজয়ী সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, সুতরাং খট্টাঙ্গপুরাণ নিশ্চয় তাঁর অনধীত নয়, এটি সেই খট্টাঙ্গপুরাণের ভগ্নপাদের এক পাদ। আজকের বিচারের বিষয় এই-ই, সুতরাং পুঁথিখানি সঙ্গেই আনলাম, যদি দেখে নেবার প্রয়োজন হয়।'

এই সমস্ত কথা শুনে দিগ্বিজয়ী একেবারে ঘাবড়িয়ে গেলেন, খট্টাঙ্গপুরাণ! এ পুরাণের ,নাম তো তিনি জীবনে শোনেন নি, সেই পুরাণের ভগ্নপাদের এক পাদই যদি এতখানি লম্বা হয়, তবে আসল পুরাণটি না জানি কি প্রকাণ্ড! দিগ্বিজয়ী কিছুক্ষণ ভেবে বললেন—'আমার মনে হয়, আজকের মত শাস্ত্রালোচনা স্থগিত রাখাই ভাল, কেননা বারবেলা পড়ে গেছে। কাল বিকেলেই শাস্ত্রলোচনার জন্য সভা আহ্বান করা যাবে।' এই বলে দিগ্বিজয়ী আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে সশিষ্য সভা ত্যাগ করে গেলেন।

কিন্তু পরদিন তাঁর বাসা-বাড়িতে ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে গিয়ে ভারী ফিরে এল। বাসা-বাড়িতে কেউ-ই নাই. দিগ্বিজয়ী রাতারাতি শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে উধাও হয়েছেন।

রাজা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। পণ্ডিতেরাও বললেন— 'যাক, বাঁচা গেল!'

সকলে আবার রাজসভায় সমবেত হলেন, সভামণ্ডপে তখনও সেই অতি দীর্ঘ কাপড়ে মোড়া পুঁথিটি একপাশে সযত্নে রক্ষিত ছিল।

নাপিত বলল—'মহারাজ একবার অনুমতি দিন, পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে আমি এই মহাগ্রন্থের গ্রন্থিমোচন করি।'

রাজা তখনই অনুমতি দিলেন, কেননা রহস্যটি জানবার জন্য তাঁদের সকলেরই মন অতিশয় ব্যাকুল হয়েছিল।

বস্ত্রের আবরণ খোলা হতে লাগল—একখানি, দু'খানি, তার পর তৃতীয় বস্ত্রটি খোলা হলে দেখা গেল ভেতরে আছে একখানি ভাঙ্গা খাটের পায়া।

নাপিত বলল—'মহারাজ. এইটি খট্টাঙ্গপুরাণের ভগ্নপাদের এক পাদ। আর যদি প্রশ্ন করেন দিগ্বিজয়ী পালালেন কেন? তার উত্তর, ভয়ে। তিনি খট্টাঙ্গপুরাণের নামও যে কখনও শোনেন নি সেকথা তাঁর মত সর্বশাস্ত্রজ্ঞ কেমন করে স্বীকার করবেন, তাই তাঁকে ভয়ে ভয়ে রাতারাতি সশিষ্য পালাতে হয়েছে। আর আমাদের দেশের এই সব মহা মহা পণ্ডিত, যাঁদের মুখের স্বস্তিবাচন শুনিয়েছি, সেই পণ্ডিতেরাও ভয়েই শাস্ত্রবিচারে অগ্রসর হতে পারেন নি। এর দ্বারা সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যার সাহস আছে সে মূর্খ হয়েও শাস্ত্রবিচারে অগ্রসর হতে পারে, আর যিনি ভীরু তিনি পণ্ডিত হলেও সময়ক্রমে ভয়ের বশীভূত হয়ে একেবারে মূর্খের মতই আচরণ করেন। অতএব সাহসই হল সকল শক্তির উৎস, আর ভয়ই সকল শক্তির ধ্বংসকারী।'

লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল তার নাম লালু অর্ধ শতাব্দী পূর্বে, অর্থাৎ, সে এত কাল পূর্বে যে তোমরা ঠিক মতো ধারণা করতে পারবে না— আমরা একটি ছোট বাঙলা ইস্কুলের এক ক্লাসে পড়তাম। আমাদের বয়স তখন দশ এগারো। মানুষকে ভয় দেখাবার, জব্দ করবার কত কৌশলই যে তার মাথায় ছিল তার ঠিকানা নেই। ওর মাকে রবারের সাপ দেখিয়ে একবার এমন বিপদে ফেলেছিল যে, তিনি পা মচ্‌কে প্রায় সাত আট দিন খুঁড়িয়ে চলতেন। তিনি রাগ করে বললেন—ওর একজন মাস্টার ঠিক করে দিতে। সন্ধ্যে বেলায় এসে পড়াতে বসবেন, ও আর উপদ্রব করবার সময় পাবে না। শুনে লালুর বাবা বললেন, না। তাঁর নিজের কখনো মাস্টার ছিল না, নিজের চেষ্টায় অনেক দুঃখ সয়ে লেখা-পড়া ক'রে এখন তিনি একজন বড় উকিল। ইচ্ছে ছিল, ছেলেও যেন তেমনি করেই বিদ্যা লাভ করে। কিন্তু শর্ত হ'লো এই যে, যে-বার লালু ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম না হতে পারবে তখন থেকে থাকবে ওর বাড়িতে পড়ানোর টিউটার। সে-যাত্রা লালু পরিত্রাণ পেলে, কিন্তু মনে মনে রইলো ও মা'র প'রে চটে। কারণ, উনি তার ঘাড়ে মাস্টার চাপানোর চেষ্টায় ছিলেন। সে জানতো বাড়িতে মাস্টার ডেকে আনা আর পুলিশ ডেকে আনা সমান।

লালুর বাপ ধনী গৃহস্থ। বছর কয়েক হলে পুরনো বাড়ি ভেঙে তেতালা বাড়ি করেছেন, সেই অবধি লালুর মায়ের আশা গুরুদেবকে এ বাড়িতে এনে তাঁর পায়ের ধুলো নেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, ফরিদপুর থেকে এত দূরে আসতে রাজী হন না, এইবার সেই সুযোগ ঘটেছে। স্মৃতিরত্ন সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশী এসেছেন, সেখান থেকে লিখে পাঠিয়েছেন—ফেরবার পথে নন্দরাণীকে আশীর্বাদ করে যাবেন। লালুর মা'র আনন্দ ধরে না—উদ্‌যোগ আয়োজনে ব্যস্ত—এতদিনে মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, গুরুদেবের পায়ের ধুলো পড়বে। বাড়িটা পবিত্র হয়ে যাবে।

নিচের বড় ঘরটা থেকে আসবাব-পত্র সরানো হলো, নতুন ফিতের খাট, নতুন শয্যা তৈরী হয়ে এলো,—গুরুদেব শোবেন। এই ঘরেরই এক কোণে তাঁর পুজো আহ্নিকের জায়গা হলো, কারণ তেতালার ঠাকুর-ঘরে উঠতে নামতে তাঁর কষ্ট হবে।

দিন কয়েক পরে গুরুদেব এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কি দুর্যোগ!

আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের ঘটা, যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি, তার আর বিরাম নেই।

এদিকে মিষ্টান্নাদি তৈরি করতে, ফল মূল সাজাতে লালুর মা নিশ্বাস নেবার সময় পান না। তারই মধ্যে স্বহস্তে ঝেড়ে ঝুড়ে মশারি গুঁজে দিয়ে বিছানা করে গেলেন। নানা কথাবার্তায় রাত হয়ে গেল, পথশ্রমে ক্লান্ত গুরুদেব অহারাদি সেরে শয্যা গ্রহণ করলেন। চাকর বাকর ছুটি পেলে। সুকোমল শয্যার পারিপাট্যে প্রসন্ন গুরুদেব মনে মনে নন্দরাণীকে আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু গভীর রাতে অকস্মাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ছাদ চুইয়ে মশারি ফুঁড়ে তাঁর সুপরিপুষ্ট পেটের উপর বৃষ্টির জল পড়চে।—উঃ কি ঠাণ্ডা সে জল! শশব্যস্তে বিছানার বাইরে এসে পেটটা মুছে ফেললেন, বললেন, নতুন বাড়ি করলে নন্দরাণী কিন্তু পশ্চিমের কড়া রোদে ছাতটা এর মধ্যেই ফেটেছে দেখছি। ফিতের খাট, ভারী নয়, মশারি সুদ্ধ সেটা ঘরের আর এক ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আধ মিনিটের বেশি নয়, চোখ দুটি সবে বুঁজেছেন, অমনি দু-চার ফোঁটা তেমনি ঠাণ্ডাজল টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ করে পেটের ঠিক সেই স্থানটির উপরেই ঝরে পড়লো। স্মৃতিরত্ন আবার উঠলেন, আবার খাট টেনে, অন্য ধারে নিয়ে গেলেন বললেন, ইঃ—ছাতটা দেখচি এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত ফেটে গেছে। আবার শুলেন, আবার পেটের উপর জল ঝরে পড়ল। আবার উঠে পেটের জল মুছে খাটটা টেনে নিয়ে আর এক ধারে গেলেন কিন্তু শোবা মাত্রই তেমনি জলের ফোঁটা। আবার টেনে নিয়ে আর এক ধারে গেলেন কিন্তু সেখানেও তেমনি। এবার দেখলেন বিছানাটাও ভিজেছে, শোবার যো নেই। স্মৃতিরত্ন বিপদে পড়লেন। বুড়োমানুষ, অজানা জায়গায় দোর খুলে বাইরে যেতেও ভয় করে, আবার থাকাও বিপজ্জনক। কি জানি ফাটা ছাদ ভেঙে হঠাৎ মাথায় যদি পড়ে। ভয়ে ভয়ে দোর খুলে বারান্দায় এলেন, সেখানে লণ্ঠন একটা জ্বলচে বটে কিন্তু কেউ কোথাও নেই,—ঘোর অন্ধকার।

যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝোড়ো হাওয়া, দাঁড়াবার যো কি! কোথায় চাকর বাকর, কোন ঘরে শোয় তারা—কিছুই জানেন না তিনি। চেঁচিয়ে ডাকলেন, কিন্তু কারও সাড়া মিললোনা। একধারে একটা বেঞ্চি ছিল, লালুর বাবার গরীব মক্কেল যারা, তারাই এসে বসে। গুরুদেব অগত্যা তাতেই বসলেন। আত্মমর্যাদার যথেষ্ট লাঘব হলো অন্তরে অনুভব করলেন, কিন্তু উপায় কি! উত্তুরে-বাতাসে বৃষ্টির ছাঁটের আমেজ রয়েছে—শীতে গা শির্ শির্ করে—কোঁচের খুঁটটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, পা দুটি যথাসম্ভব উপরে তুলে যথাসম্ভব আরাম পাবার আয়োজন করে নিলেন। নানাবিধ শ্রান্তি ও দুর্বিপাকে দেহ

অবশ, মন তিক্ত, ঘুমে চোখের পাতা ভারাতুর, অনভ্যস্ত গুরু ভোজন ও রাত্রি জাগরণে দু-একটা অম্ল উদ্গারের আভাস দিলে—উদ্বেগের অবধি রইল না। হঠাৎ এমনি সময়ে অভাবনীয় নতুন উপদ্রব। পশ্চিমের বড় বড় মশা দুই কানের পাশে এসে গান জুড়ে দিলে। চোখের পাতা প্রথমে সাড়া দিতে চায় না, কিন্তু মন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল—কি জানি এরা সংখ্যায় কত। মাত্র মিনিট দুই—অনিশ্চিত নিশ্চিত হলো, গুরুদেব বুঝলেন সংখ্যায় এরা অগণিত। সে বাহিনীকে উপেক্ষা করে বিশ্বে এমন বীরপুরুষ কেউ নেই। যেমন তার জ্বলুনি তেমনি তার চুলকুনি। স্মৃতিরত্ন দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন কিন্তু তার সঙ্গ নিলে। ঘরের মধ্যে জলের জন্য যেমন, ঘরের বাইর মশার জন্য তেমন। হাত-পায়ের নিরন্তর আক্ষেপে, গামছার সঘন সঞ্চালনে কিছুতেই তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় না। স্মৃতিরত্ন এপাশ থেকে ওপাশে ছুটে বেড়াতে লাগলেন, শীতের মধ্যেও তাঁরা গায়ে ঘাম দিলে। ইচ্ছে হলো ডাক ছেড়ে চেঁচান কিন্তু নিতান্ত বালকোচিত হবে ভেবে বিরত রইলেন। কল্পনায় দেখলেন নন্দরাণী সুকোমল শয্যায় মশারির মধ্যে আরামে নিদ্রিত, বাড়ির যে যেখানে আছে পরম নিশ্চিন্তে সুপ্ত—শুধু তাঁর ছুটোছুটিরই বিরাম নেই। কোথাকার ঘড়িতে চারটে বাজলো, বললেন, কামড়া ব্যাটারা, যত পারিস কামড়া,—আমি আর পারিনে।—বলেই বারান্দার একটা কোণে পিঠের দিকটা যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, সকাল পর্যন্ত যদি প্রাণটা থাকে ত এ দুর্ভাগা দেশে আর না। যে গাড়ী প্রথমে পাবো সেই গাড়ীতেই দেশে পালাবো। কেন যে এখানে আসতে মন চাইত না তার হেতু বোঝা গেল। দেখতে দেখতে সর্বসন্তাপহর নিদ্রায় তাঁর সারা রাত্রির সকল দুঃখ মুছে দিলে—স্মৃতিরত্ন অচেতন-প্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

এ দিকে নন্দরাণী ভোর না হতেই উঠেছেন—গুরুদেবের পরিচর্যায় লাগতে হবে। রাত্রে গুরুদেব জলযোগ মাত্র করেছেন—যদিচ তা গুরুতর—তবু মনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল খাওয়া তেমন ভালো হয় নাই। আজ দিনের বেলা নানা উপচারে তা ভরিয়ে তুলতে হবে।

নিচে নেমে এলেন, দেখেন দোর খোলা। গুরুদেব তাঁর আগে উঠেছেন ভেবে একটু লজ্জা বোধ হলো। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখেন তিনি নেই, কিন্তু এ কি ব্যাপার! দক্ষিণ দিকের খাট উত্তর দিকে, তাঁর ক্যাম্বিশের ব্যাগটা জানলা ছেড়ে মাঝখানে নেমেছে, কোশাকুশি, আসন প্রভৃতি পূজো আহ্নিকের জিনিসপত্রগুলো সব এলোমেলো স্থানভ্রষ্ট,—কারণ কিছুই বুঝলেন না। বাইরে এসে চাকরদের ডাকলেন, তারা কেউ তখনও ওঠেনি। তবে একলা গুরুদেব গেলেন কোথায়? হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো—ওটা কি? এক

কোণে আলো অন্ধকারে মানুষের মতো কি একটা বসে না! সাহসে ভর ক'রে একটু কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখেন তাঁর গুরুদেব। অব্যক্ত আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠলেন,—ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই!

ঘুম ভেঙে স্মৃতিরত্ন চোখ মেলে চাইলেন, তারপরে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন। নন্দরাণী ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায় কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর মশাই আপনি এখানে কেন?

স্মৃতিরত্ন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সারারাত দুঃখের আর পার ছিলনা যে মা।

কেন বাবা?

নতুন বাড়ি করেছে বটে মা, কিন্তু ছাদ কোথাও আর আস্ত নেই। সারা-রাতের বৃষ্টি বাদল বাইরে ত পড়েনি, পড়েছে আমার গায়ের উপর। খাট টেনে যেখানে নিয়ে যাই সেখানেই জল পড়ে। পাছে ছাদ ভেঙে মাথায় পড়ে, পালিয়ে এলাম বাইরে, কিন্তু তাতেই কি রক্ষে আছে মা, পঙ্গপালের মতো ডাঁশ-মশা ঝাঁকে ঝাঁকে সমস্ত রাত্রি যেন ছুবলে খেয়েছে,—এধার থেকে ছুটে ওধার যাই আবার ওধার থেকে ছুটে এধারে আসি। গায়ের অর্ধেক রক্ত বোধ করি আর নেই মা।

বহু প্রয়াস বহু সাধ্য-সাধনায় ঘরে আনা বৃদ্ধ গুরুদেবের অবস্থা দেখে নন্দরাণীর দু চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো, বললেন, কিন্তু বাবা, বাড়িটা যে তেতালা, আপনার ঘরের উপর আরও যে দুটো ঘর আছে, বৃষ্টির জল তিন-তিনটে ছাদ ফুঁড়ে নামবে কি করে? কিন্তু বলতে বলতেই তাঁর সহসা মনে হলো এ হয় তো ঐ শয়তান লালুর কোন রকম শয়তানি বুদ্ধি। ছুটে গিয়ে বিছানা হাতড়ে দেখেন মাঝখানের চাদর অনেকখানি ভিজে এবং মশারি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে দেখতে পেলেন ন্যাকড়ায় বাঁধা এক চাঙড় বরফ, সবটা গলেনি, তখনও এক টুকরো বাকি আছে। পাগলের মতো ছুটে বাইরে গিয়ে চাকরদের যাকে সুমুখে পেলেন চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন,—হারামজাদা লেলো কোথায়? কাজ-কম্ম চুলোয় যাক্‌গে, বজ্জাতটাকে যেখানে পাবি মারতে মারতে ধরে আন।

লালুর বাবা সেই মাত্র নিচে নামছিলেন, স্ত্রীর কাণ্ড দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন,—কি কাণ্ড করচো? হলো কি?

নন্দরাণী কেঁদে ফেলে বললেন, হয় তোমার ঐ লেলোকে বাড়ি থেকে তাড়াও, না হয় আজই আমি গঙ্গায় ডুবে এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

কি করলে সে?

বিনা দোষে গুরুদেবের দশা কি করেছে চোখে দেখোসে। তখন সবাই

গেলেন ঘরে। নন্দরাণী সব বললেন, সব দেখালেন। স্বামীকে বললেন, এ দস্যি ছেলেকে নিয়ে আমি ঘর করবো কি ক'রে তুমি বলো?

গুরুদেব ব্যাপারটা সমস্ত বুঝলেন। নিজের নির্বুদ্ধিতায় বৃদ্ধ হাঃ হাঃ করে হেসে ফেললেন।

লালুর বাবা আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চাকররা এসে বললে, লালুবাবু কোঠি মে নহি হ্যায়। আর একজন এসে জানালে সে মাসিমার বাড়িতে বসে খাবার খাচ্চে। মাসিমা তাকে আসতে দিলেন না।

মাসিমা মানে নন্দর ছোট বোন। তার স্বামীও উকিল, সে অন্য পাড়ায় থাকে।

এর পরে লালু দিন পনরো আর এ বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দিলে না।

আবু কারিমের চটীজুতা

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাগদাদ শহরে আবু কারিম নামে এক বণিক্ বাস করিত। সে অতিশয় কৃপণ ছিল। এমনই কৃপণ যে, তাহার শরীরের একখানি হাড় খুলিয়া লও, সে দিতে পারে; কিন্তু একটি পয়সা সহজে দিতে পারে না। অর্থ তাহার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়। লোক বলিত, আবু কারিমের অনেক টাকা আছে। কিন্তু বাহিরে তাহার এমনই হাল ছিল যে, দেখিয়া কেহ তাহা বুঝিতে পারিত না। তাহার মস্তকে তৈল নাই, বস্ত্র ছিন্ন। আবার যেমন তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ, তেমনই জুতাজোড়াটি। সে চটীজুতা যে আবু কবে কিনিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না; তবে লোক যে দশ বৎসর তাহার পায়ে সেই জুতো-জোড়াটি দেখিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই দশ বৎসরে জুতাজোড়াটি কতবার যে মুচীর বাড়ি গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। তালির উপর তালি; জুতাজোড়াটার সর্বাঙ্গেই তালি! শেষে এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, কতটা জুতা আর কতটা তালি, তাহা আর সহজে স্থির করা যায় না। যতদিন সুতা দিয়া সেলাই চলে, মুচীরা তত দিন সেলাই করিয়াছে। শেষে আর সেলাই চলে না, বড় বড় গজাল দিয়া চামড়াগুলি জুড়িয়া রাখিতে হইয়াছে। এইরূপে সেই অপূর্ব চটীজুতাজোড়াটি এক অদ্ভুত ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। সে জুতাজোড়াটি ওজনে প্রায় আড়াই সের তিন সের হইবে। সেই অদ্ভুত জুতা বাগদাদ শহরে প্রসিদ্ধ। শহরে ছেলে বুড়া সকলেই তাহা জানে। পাঁচ জন একত্র হইলেই হাসি-তামাসার সময় আবু কারিমের চটীজুতার উল্লেখ হয়। লোক কোন ভারী জিনিস তুলিবার সময় বলে,—"বাপ রে! যেন আবু কারিমের চটীজুতা!"

আবু কারিমের অদৃষ্ট ভাল। তাহার ভাগ্যে বাণিজ্যে প্রায়ই বড় বড় দাঁও জুটিয়া যাইত। এক বার দাঁও পাইয়া আবু কারিম অনেক টাকার স্ফটিক কিনিল। মুসলমানরা স্ফটিক দিয়া মালা করে, এবং অন্যান্য কাজে স্ফটিকের ব্যবহার আছে। স্ফটিকের বাণিজ্যে অনেক লাভ হয়। সস্তা দরে স্ফটিক কিনিয়া আবু কারিমের মহা আনন্দ। আবার কিছু দিন যাইতে না যাইতেই তাহার ভাগ্যে আর এক দাঁও জুটিয়া গেল। এক জন বণিক্ দায়ে পড়িয়া অর্ধেক মূল্যে অনেক টাকার আতর বিক্রয় করিতেছে শুনিয়া আবু কারিম সেই সমুদয় আতর কিনিয়া ফেলিল। সে হিসাব করিয়া দেখিল, তাহাতে তাহার অনেক টাকা লাভ হইবে। লোক মনে করিতে পারে, আবু কারিম কাহার জন্য

এত টাকা উপার্জন করে? সে নিজে ত ভাল করিয়া পেটে খায় না। তবে বুঝি তাহার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে; তাহাদিগের জন্য সে টাকা রাখিতেছে? তাহা নহে। আবু করিমের কেহই নাই। তবে আবু করিম এত কষ্ট করিয়া কেন টাকা জমায়? আমরা এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। আবু করিম ত আর নাই যে, জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব; তবে আবু করিমের মত নিঃসন্তান কৃপণ এ দেশে অনেক আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

সে যাহাই হউক, বাগদাদ শহরে গুজব উঠিল, আবু করিম বড় দাঁও মারিয়াছে, স্ফটিক ও আতর বিক্রয় করিয়া অনেক হাজার টাকা লাভ করিবে। তখন পথে ঘাটে লোক করিমকে ধরিতে লাগিল; বলে, "করিম মিঞা! এত বড় দাঁও পাইলে, বন্ধুদিগকে এক দিন খাওয়াও।" করিম সে কথায় কান দেয় না; হাসিয়া উড়াইয়া দেয়; বলে, "কোথায় দাঁও? কিছুই নহে।" তবে করিম একটা কাজ করিল। সে অনেক দিন স্নান করে নাই, এই দাঁওটা পাইয়া ভাবিল, প্রকাশ্য স্নানাগারে যাইয়া এক আনা ব্যয় করিয়া স্নান করিয়া আসিবে। ইরাক দেশে সাধারণের জন্য অনেক স্নানাগার আছে, তাহাকে "টার্কিশ বাথ" বলে। তথায় কেহ স্নান করিতে যাইলে ভাল করিয়া তাহার গা টিপিয়া গরম জলে স্নান করাইয়া দেয়। আবু করিম চটীজোড়াটি পায়ে দিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া স্নানাগারে যাইতেছে, এমন সময় পথে এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বন্ধু বলিলেন,—"করিম মিঞা! এ জুতাজোড়াটা আর পায়ে দেওয়া ভাল দেখায় না। জুতার গজালের জ্বালায় ত খোঁড়াইয়া চলিতেছেন। জুতার অপেক্ষা কি পা মূল্যবান্ নহে? এক জোড়া নূতন জুতা কিনুন।" করিম হাসিয়া বলিল, "অপব্যয় করা ভাল নহে। এ জোড়াটা এখনও অনেক দিন যাইবে।"

স্নানাগারে আসিয়া আবু করিম জুতোজোড়াটি দ্বারে রাখিয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। স্নানের পর বাহিরে আসিয়া করিম দেখিল, যে স্থানে তাহার জুতাজোড়াটি ছিল, সে স্থানে এক জোড়া সুন্দর নূতন জুতা রহিয়াছে। করিম মনে করিল, এ নিশ্চয় সেই বন্ধুর কার্য। সে ভাবিল, "ভালই। বিনাব্যয়ে এক জোড়া নূতন জুতা পাওয়া গেল। বেশ ত!" সে নূতন জুতাজোড়াটি পায়ে দিয়া ঘরে গেল।

এদিকে এক বিপদ উপস্থিত। সে জুতাজোড়াটি বাগদাদ শহরের এক জন ধনীর। তিনি স্নান করিতে আসিলে তাঁহার ভৃত্য আবু করিমের ছেঁড়া জুতোজোড়াটি ঘৃণায় দূরে ফেলিয়া সেই স্থানে তাহার প্রভুর জুতা রাখিয়াছিল। বেচারা আবু জুতা চুরির অপরাধে ধৃত হইল। সে আপনাকে

নিরপরাধ প্রমাণিত করিবার জন্য অনেক কথা বলিল; কিন্তু কাজী (বিচারক) তাহার কোন কথাই বিশ্বাস করিলেন না। বিচারে তাহার জরিমানা হইল। কাজীর পেয়াদা তাহার নিকট হইতে সেই নূতন জুতাজোড়াটি কাড়িয়া লইল ও তাহার পুরাতন জুতা তাহাকে দিল।

জরিমানা দিয়া গৃহে ফিরিয়া আব্দু করিম মনে করিল,—"এই লক্ষ্মীছাড়া জুতাজোড়ার জন্য আমার জরিমানা হইল, অতএব এ জুতা আর রাখিব না।" ইহা ভাবিয়া আব্দু সেই জুতাজোড়াটা আপনার গৃহের নিম্নে প্রবাহিত টাই-গ্রীস নদীর জলে নিক্ষেপ করিল। আব্দু করিমের চটিজুতা তিন সের ভারী; যেমন জলে পড়া, অমনই পাথরের মত ডুবিয়া গেল। পরদিন জেলেরা মাছ ধরিতে আসিয়া সেই ঘাটে যে-ই জাল ফেলিল, অমনই জালটা খুব ভারী বোধ হইল। একে আব্দু করিমের চটীজুতা, তাহাতে এক দিন এক রাত্রি জলে ভিজিয়াছে। জেলেরা মনে করিল, জালে বড় মাছ পড়িয়াছে। তাহারা জাল তুলিয়া দেখে, আব্দু করিমের চটীজুতা! যে জাল টানিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, "ও রে ভাই, এ যে আব্দু করিমের সেই চটীজোড়াটা! লক্ষ্মী-ছাড়ার জুতা ফেলিবার আর জায়গা ছিল না? দেখ্ দেখি, গজাল লাগিয়া জালটা কি রকম ছিঁড়িয়া গেল!" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "দে,—জুতাজোড়াটা ওই হতভাগার বাড়িতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দে।" জেলেরা করিমের জানালা দিয়া সজোরে জুতা দুইখানা তাহার ঘরে ফেলিয়া দিল। জুতা দুই পাটি ঘরে স্ফটিক ও আতরের বোতলের উপর পড়িল; অনেক টাকার স্ফটিক ও আতর নষ্ট হইয়া গেল।

আব্দু করিম ঘরে আসিয়া দেখিল, সর্বনাশ হইয়াছে! সে শিরে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল। সে ভাবিল, "অতঃপর এই জুতা জোড়াটাকে মাটীতে পুঁতিয়া ফেলিব, উপরে রাখিলে নিস্তার নাই।" সে এই ভাবিয়া গর্ত খুঁড়িয়া জুতা পুঁতিতে গেল।

এদিকে এক জন প্রতিবেশী শহরের শাসনকর্তাকে সংবাদ দিল, আব্দু করিম নিশ্চয় গুপ্তধন পাইয়াছে; মাটী খুঁড়িয়া পুঁতিয়া রাখিতেছে। শাসনকর্তা করিমকে ধরিয়া অনেক নিগ্রহ করিলেন। আব্দু ধন পায় নাই, বেচারা ধন দেখাইবে কোথা হইতে? সে জুতাজোড়া তুলিয়া দেখাইল। কিন্তু তাহার কথায় কাজীর বিশ্বাস হইল না; তিনি করিমের জরিমানা করিয়া কিছু টাকা আদায় করিলেন। কেহ যে তাহার জুতা গোর দেয়, ইহা কাজী বা শহরের লোক কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইল, আব্দু করিম মিথ্যা কথা বলিতেছে—সে ধন পুঁতিয়া রাখিবার জন্যই গর্ত খনন করিতেছিল।

করিম জুতাজোড়াটি হাতে করিয়া আদালতের বাহিরে আসিয়া বলিল, "এ জুতা আমি আর স্পর্শ করিব না; দেখিব না।" এই বলিয়া রাগ করিয়া সে জুতাজোড়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সে জোড়া কাজী সাহেবের চৌবাচ্চায় পড়িল। সেই চৌবাচ্চা হইতে কাজী সাহেবের বাড়িতে জল যাইত। চৌবাচ্চার নল দিয়া পূর্বে হইতেই ভালরূপ জল যাইত না; সামান্য যে একটু জল যাইত, তাহাও নলের মুখে জুতা পড়ায় বন্ধ হইয়া গেল। কাজীর বাড়িতে আর জল যায় না। শেষে কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল, করিমের জুতাই যত অনর্থের মূল। এই কথা কাজী সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি ভাবিলেন, তাঁহার উপর রাগ করিয়াই আবু করিম এ কাজ করিয়াছে। তিনি তাহাকে ধরিয়া আনাইলেন এবং তাহার অপরাধের বিচার হইল। আবার আবুর জরিমানা হইল ও তাহার চটীজুতা তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

আবু করিম এবার স্থির করিল, জুতাজোড়াটা পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিবে। কিন্তু পুড়াইবার পূর্বে শুকান প্রয়োজন, নহিলে অধিক কাঠ লাগিবে। সে জুতাজোড়াটা আপনার গৃহের ছাদের উপর রৌদ্রে শুকাইতে দিল। এমনই ঘটনা, একটা কুকুরের ছানা সেই ছাদে আসিয়া সেই জুতা লইয়া খেলা করিতে করিতে ছাদ হইতে নিম্নে রাস্তায় ফেলিয়া দিল। সেই সময় সেই রাস্তা দিয়া একটি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া একজন স্ত্রীলোক যাইতেছিল। একখানা জুতা তাহার মাথায় পড়িল, মাথা ফাটিতে ফাটিতে রহিয়া গেল। বেচারা আবু করিম আবার মকদ্দমায় পড়িল। কাজী তাহার চটীজুতার উপদ্রবে এমনই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, এ বার তাহাকে কারাগারে পাঠাইলেন। এত উপদ্রব কি সহ্য করা যায়? জুতার জন্য শহরের লোক অতিষ্ঠ হইয়াছে। দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া আবু করিম করজোড় করিয়া বলিল, "হে ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক, আমি কারাগারে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে; এই চটীজোড়াটির জন্য আমার অনেক নিগ্রহ হইয়াছে; ভয় হইতেছে, এটা কাছে থাকিলে আরও কি বিপদ ঘটিবে। অতএব এই চটীজোড়াটার একটা গতি করুন।"

কাজী হাসিয়া আদালতের এক জন পেয়াদাকে জুতাজোড়াটা ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

করিম প্রসন্নচিত্তে কারাগারে গেল।

রামায়ণ গান

ললিতমোহন ভট্টাচার্য

গোপীনাথপুরে জনকয়েক লোক মিলে শখ করে এক রামায়ণের দল করেছিল। রামায়ণওয়ালাদের কন্ঠস্বর এমনি মিষ্টি যে, গরু যদি শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকতো, আর সেই সময় যদি রামায়ণওয়ালাদের গান আরম্ভ হতো, তা' হলে দড়ি ছিঁড়ে সেই গরু নিশ্চয়ই ছুটে পালাতো। গোপীনাথপুরে ৩০।৪০ ঘর লোকের বাস। রামায়ণওয়ালারা প্রথমে তেল-তামাক আর চারি আনার পয়সা দক্ষিণা নিয়ে গাওনা আরম্ভ করলে। প্রথম বার গ্রামের লোক চক্ষুলজ্জায় তাদের অত্যাচার সহ্য করলে। ৩০।৪০ খানা বাড়িতে দেড়মাসের কম সময়ের মধ্যে এক তরফা রামায়ণ গান শেষ হয়ে গেল। গ্রামের লোক রাত জেগে জেগে অস্থির হলো, তা' ছাড়া ভিন্ন গ্রামের লোক রামায়ণগানের ভয়ে গোপীনাথপুরে আসা বন্ধ করে দিলে। মোটের উপর গোপীনাথপুর ভিন্ন আর কোনও গ্রামের লোক রামায়ণের দল বায়না করতে সাহস পেলে না, কাজেই রামায়ণওয়ালারা বাধ্য হয়ে আবার গ্রামের প্রথম বাড়ি থেকে গাওনা করার প্রস্তাব করলে। গ্রামের লোক প্রথমে কিছুতেই রাজী হলো না; শেষে দলওয়ালারা শুধু তেল-তামাক নিয়ে গাইতে স্বীকার করায়, অগত্যা গ্রামবাসীরা রাজী হলো। এইভাবে দ্বিতীয় তরফা গোপীনাথপুরের ঘরে ঘরে এক এক পালা রামায়ণ হয়ে গেল। গ্রামের লোকেরা রাত্তির জেগে জেগে বিরক্ত হয়ে উঠলো। তাতেও কি রক্ষা আছে? রামায়ণের দল এবার যার যার বাড়ি থেকে তেল-তামাক এনে আবার রামায়ণ গান জুড়ে দিলে। এইভাবে তৃতীয় তরফায় পাঁচ সাত বাড়ি গান হলে, গ্রামের লোকগুলো একরকম ক্ষেপে উঠলো, সকলে মিলে যুক্তি করলে—'এদের গ্রামছাড়া করতে না পারলে আর রক্ষা নেই!' এই যুক্তি স্থির করে পঞ্চাশ ষাট জন লোকে প্রত্যেকে এক একখানি লাঠি নিয়ে রামায়ণ-ওয়ালাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে বের করলে। গ্রামের লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো!

রামায়ণওয়ালাদের প্রায় দু'মাস যাবৎ গান করে করে অভ্যাস খারাপ দাঁড়িয়ে গিয়েছে, তারা এখন আর গান না করে থাকতে পারে না; কাজেই গ্রামের বাইরে মাঠের ভেতর এক বটতলায় এসে খোল করতাল সাহায্যে রামায়ণ আরম্ভ করলে। সেই বটগাছে এক ব্রহ্মদৈত্য ছিল, সে বেচারাও রামনামের চোট সামলাতে না পেরে গাছ ছেড়ে বেরুলো, কিন্তু তার বহুকালের আবাস-স্থানটা ছাড়তে প্রাণ বড়ই কাঁদতে লাগলো। সে মনে মনে বেশ একটু চটে গেল। রামায়ণওয়ালাদের উপর প্রতিশোধ নেবার মতলব করে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের

রূপ ধারণ করে ব্রহ্মদৈত্য পথের এক মুটের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলে।

ব্রহ্মদৈত্য—বাপু হে, গরীব ব্রাহ্মণের একটু উপকার করতে পারো?

মুটে—আজ্ঞা করুন, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার উপকার করতে পারবো, আমার এমন ভাগ্য হবে?

ব্রহ্মদৈত্য—হবে বাপু, হবে। শুধু ভাগ্য হবে না, সৌভাগ্য হবে, আমি তোমায় রাজা করে দেবো।

মুটে—তা' ঠাকুর, তুমি আমায় রাজা করবে কি করে?

ব্রহ্মদৈত্য—দেখো বাপু, সে কথা তোমায় বলতে সাহস হয় না, কারণ সে কথা শুনলে তুমি হয়তো ভয় পাবে।

মুটে—আজ্ঞে ভয়, তা' আপনার আশীর্বাদে অন্ধকার রাত্রে আমি ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে পারি।

ব্রহ্মদৈত্য—বেশ বাপু, তা' হলেই হলো। তবে আমার পরিচয়টা শোনো—আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি ব্রহ্মদৈত্য।

এই কথা শুনেই তো মুটে বেটা কাঁপতে লাগলো। তখন ব্রহ্মদৈত্য তাকে অভয় দিয়ে বললে—বাপু, তোমার কোনো ভয় নেই। ঐ যে বটগাছটা দেখছো, ঐ গাছটিতেই আমার আড্ডা। এ যাবৎ বেশ সুখে ছিলাম, কিন্তু আজ দু'দিন হলো আঁমায়নের দল এসে আঁমনামে আমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। তুমি যদি ওবেটাদের তাড়িয়ে দিতে পারো, তা' হলে আমি তোমায় রাজা করে দেবো।

মুটে—আচ্ছা ঠাকুর, ওদের না হয় আমি তাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু তুমি আমায় রাজা করবে কি করে?

ব্রহ্মদৈত্য—বুঝলে না বাপু! আমি এই বিরাটগঞ্জের রাজার মেয়ের স্কন্ধে অধিষ্ঠান করবো, কোনও ওঝা আমাকে ছাড়াতে পারবে না; শেষে তুমি গেলেই ছেড়ে যাবো। তা' হলেই তুমি রাজা হয়ে গেলে।

"দেখো ঠাকুর, মনে থাকে যেন" এই কথা বলে মুটে বড় একখানা বাঁশ নিয়ে সেই বটতলায় গিয়ে হাজির হলো; খুব তর্জন গর্জন করে অধিকারীর পিঠে বংশদণ্ডটি দু'-একবার ঝাঁকতেই অধিকারী মহাশয় দলবল সমেত খোল করতাল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলেন। ব্রহ্মদৈত্য নিশ্চিন্ত হলো।

বিরাটগঞ্জের রাজার মেয়ের ঘাড়ে ভূত চেপেছে, চারিদিক থেকে ওঝা আসতে আরম্ভ করলে, কত মন্ত্র জপলে, কত ঝাড়ন কাড়ন করলে, কিছুতেই কিছু হলো না। রাজা তখন নিরুপায় হয়ে ঘোষণা করলেন—"আমার মেয়ের ঘাড়ের ভূত যে ছাড়িয়ে দিতে পারবে তাকে রাজ্যের অর্ধেক আর রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেবো। কিন্তু যিনি ভূত ছাড়াতে অক্ষম হবেন তার মুণ্ডুটা কেটে রাখবো।" এ সংবাদ দু'-একদিনের মধ্যে দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের

পূর্ব-পরিচিত মুটে লোকমুখে এই কথা শুনে ভাবলে—'ব্রহ্মদৈত্য যখন সত্য করেছেন, তখন এবার আমার কপাল ফিরবে।' এই ভেবে সে একটু মোটামুটি সাজে সেজে বিরাটগঞ্জে রওনা হলো। ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অপরাহ্নকালে বিরাটগঞ্জে পৌঁছে গেল। রাজার সঙ্গে দেখা হলো, মুটে রাজাকে তার আসার কারণ জানালে। রাজা, তাকে প্রথমে অনেক বুঝালেন, বললেন—"বাপু! গরীবের ছেলে তুমি, কেন মিছে লোভে পড়ে প্রাণ হারাবে। তুমি কি জানো না যে, রাজা-রাজড়ার যেই কথা সেই কাজ, হাকিম টলে তবু হুকুম টলে না! এখনও সময় আছে, এখনও বুঝে চলো, ভালো হতে পারে।" মুটে হাতজোড় করে ভারি কাতর হয়ে বললে,—"মহারাজ! বুকে জোর না থাকলে কি সাধ করে মরতে এসেছি? আপনি আদেশ করুন, আমি নিশ্চয়ই আপনার মেয়ের এই ভূতে-পাওয়া রোগ সেরে দেবো।" রাজা আর কি করবেন, মুটের এই রকম তেজ দেখে তার উপর কন্যার চিকিৎসার ভার দিলেন। দু' পাঁচজন রাজবংশের ভদ্রলোক সঙ্গে নিয়ে মুটে যেইমাত্র মেয়ের ঘরে পা ফেলেছে, অমনি রাজকন্যার স্কন্ধে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মদৈত্য রাজার মেয়ের কন্ঠস্বরেই বলে উঠলো—"বন্ধু, এসেছো?" মুটে তৎক্ষণাৎ উত্তর করলে—"হাঁ বন্ধু, আমি এসেছি।" অমনি রাজকন্যা বললে—"তবে এখন আমি আসি? কিন্তু বন্ধু, একটা বিষয়ে তোমায় সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, আর কখনও কোনো জায়গায় আমায় ছাড়াতে যেও না, তা' হলে কিন্তু ভালো হবে না।" মুটে বললে—"বন্ধু! আর আমার কিছুতেই দরকার নেই, যে উপকার তুমি করে গেলে এই যথেষ্ট।" মুটের এই কথা শেষ হওয়া মাত্রই রাজকন্যা তাড়াতাড়ি মাথা নত করলেন। সামনে অনেক বেটাছেলে দেখে লজ্জায় জড়োসড়ো হলেন। কিছুদূরে তাঁর মা দাঁড়িয়ে মেয়ের দুঃখে কাঁদছিলেন। রাজকন্যা তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গিয়ে বললেন—"একি! মা, এখানে এত লোক কেন? তুমিই বা কাঁদছো কেন? আমার বোধ হচ্ছে, আমি যেন ঘুমুচ্ছিলাম।" মেয়ের মুখে এ সব কথা শুনে মায়ের বুক ফেটে গেল, চোখ ফেটে জল বেরুলো, তিনি মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। এত দিন পরে যেন তিনি তাঁর হারাধন ফিরিয়ে পেলেন। মুটের সামান্য সময়ের মধ্যে সামান্য চিকিৎসায় মেয়ে আরাম হলো, এতে মুটের খুব ধন্যি ধন্যি নাম পড়ে গেল। মেয়ে ভালো হয়েছে একথা যেই বাইরে রাজার কানে পৌঁছলো, রাজা অমনি ছুটে অন্দরে এলেন। রাজকন্যা আগের মতো খুব ভক্তি করে তাঁকে প্রণাম করলেন। রাজা তাঁর মেয়ের এই রকম ভালো অবস্থা দেখে ভারি সুখী হলেন, তখনই মুটে-ওঝার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন, তাকে জামাই করবেন বলে স্বীকার করলেন আর যে রাজ্যের অর্ধেক দেওয়ার কথা ছিল, তাও তিনি দেবেন বললেন। হাজার হলেও রাজা-

গজা, যেই কথা সেই কাজ। রাজা লোকজনদের হুকুম দিলেন—"দেখো, এই মুটে-ওঝাকে আজ থেকে তোমরা আমার জামাই বলে মনে করবে আর সেই রকম আদর যত্ন করবে।" যেই রাজার মুখ থেকে এই আদেশ বের হওয়া, অমনি রাজবাড়ির চাকরদের যে রকম সাজ পোশাক থাকা দরকার, সেই রকম সাজ পোশাকে সেজে-গুজে চার পাঁচজন খোট্টা চাকর "আইয়ে হুজুর," বলে সামনে দাঁড়ালো। অন্য মুটে হলে এদের চেহারা দেখে ভয় পেতো; কিন্তু এ যে-সে মুটে নয়, যে আসল ব্রহ্মদত্যির সঙ্গে আলাপ করে ফেলেছে, সে এ সব নকল খোট্টা ভূতকে ডরাবে কেন? সে তখনই বললে, "আভি চলিয়ে"। এই কথা বলে চাকরদের সঙ্গে অন্দর ছেড়ে বাইরে এল। আপাতত বাইরেই একটা সুন্দর ঘরে মুটের থাকার জায়গা ঠিক হলো, চাকর-চাকরাণী নিযুক্ত হলো। অন্দর থেকে থরে থরে সাজানো খাবার জলখাবার প্রভৃতি আসতে লাগলো। এক কথায়, যাঁর কৃপায় পথের ভিখারী রাজা হয়ে যায়, সেই ভগবানের কৃপায় আজ মুটের ভাগ্য ফিরে গেল। দু'চার দিন পরে শুভদিন দেখে রাজকন্যার সঙ্গে মুটের বিয়ে হয়ে গেল, মুটে এখন রাজার জামাই! মহাধনী! মহাসুখী!

রাজকন্যার বিবাহের এক বৎসর পরে শ্রীপাঠ খট্টচুল্লি গ্রামে রাজার গুরুদেবের কন্যাকে ভূতে পেলো। গুরুদেব তো—"হায়, আমার মেয়ের কি হলো," এই বলেই কেঁদে অস্থির; বাড়িসুদ্ধ লোক মেয়েকে পাগলের মতো প্রলাপ বকতে দেখে ভয় পেয়ে গেল। মেয়েকে যে ভূতে পেয়েছে এটা সকলেই বুঝলে। চারিদিক থেকে ওঝা আসতে লাগলো, ঝাড়ন কাড়ন, কত রকম হতে লাগলো, মেয়ে আর কিছুতেই ভালো হয় না। শেষে সকলেই রাজার জামাইকে এনে একবার দেখাবার কথা বললে। গুরুদেব প্রথমে একটু এ ও তা' ভাবলেন, শেষে মেয়ের প্রাণ রক্ষাই প্রধান বলে মনে হলো। দু'-একজন লোক সঙ্গে নিয়ে সেই দিনই বিরাটগঞ্জে রওনা হলেন এবং সেই দিন রাত্রিকালেই সেখানে পৌঁছে গেলেন। রাজা গুরুদেবের আগমন শুনে তখনই এসে গুরুপদে প্রণাম করলেন, শেষে গুরুদেবের মুখে তাঁর কন্যাকে ভূতে পাওয়ার কথা শুনে বড় দুঃখিত হলেন। গুরুদেব রাজ-জামাতাকে একবার মেয়েটি দেখবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করলেন। জামাই কথা রাখবেন কিনা, এইটি মনে করে রাজা প্রথমে একটু ভাবতে লাগলেন, শেষে গুরুদেবের উপকার করাই প্রধান ধর্ম, এইটি মনে ভেবে, তিনি জামাইকে অনুরোধ করতে স্বীকার হলেন। গুরুদেব সে রাত্রির মতো আহারাদি শেষ করে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু মেয়ের কথা মনে করে দুশ্চিন্তায় তাঁর আর ঘুম হলো না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হলো।

সকালে রাজা গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে জামাইয়ের নির্দিষ্ট ঘরে দেখা দিলেন। গুরুদেবও জামাইবাবুর হাত ধরে কেঁদে ফেললেন; রাজাও জামাইকে সমস্ত কথা খুলে বললেন এবং জামাইকে গুরুদেবের এই উপকারটি করতে অনুরোধও করলেন। জামাই তো শ্বশুরের এবং গুরুদেবের অনুরোধে সাগরে খাবি খেতে লাগলেন। ভাবলেন—'এবার ওঝাগিরি করতে গেলে বিপদ নিশ্চয়, কেননা ব্রহ্মদৈত্য বন্ধু বারবার আর কোনো জায়গার ভূত ছাড়াতে যেতে নিষেধ করেছে। এখন কি করা যায়?' যা' হোক মুটে-জামাই আর গুরুজনের অনুরোধ এড়াতে পারলে না। তখন যাক প্রাণ, থাক মান, এই ভেবে শ্রীপাঠ খট্টচুল্লি গ্রামে গুরুদেবের সঙ্গে রাজ-জামাতা ওরফে মুটে-ওঝা রওনা হলেন ও সেই দিনই অনেক রাত্রে খট্টচুল্লিতে পেঁছিলেন। সে রাত্রে আর গুরুদেবের মেয়েকে দেখা হলো না; তার পর দিন সকালে দেখা স্থির হলো।

পরদিন সকালে গুরুদেব তাঁর রাজশিষ্যের মুটে-জামাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যে ঘরে তাঁর ভূতে পাওয়া মেয়েটি ছিল, সেই ঘরে ঢুকলেন। সেই ঘরে ঢোকামাত্র মুটে-জামাই বাবাজীর বুকের ভিতর গুড়ুম গুড়ুম করতে লাগলো, ভাবলে এইবার বুঝি প্রাণটা গেল। বাস্তবিক ব্যাপারও সেই রকম দাঁড়ালো, মুটেকে দেখবামাত্র গুরুদেবের কন্যার স্কন্ধে অধিষ্ঠিত আমাদের পূর্ব পরিচিত ব্রহ্মদৈত্য গুরুকন্যার স্বরেই গর্জন করে বললে—"কি! তুই আবার এখানে আমায় ছাড়াতে এসেছিস?" মুটে তৎক্ষণাৎ উত্তর করলে—"বন্ধু! আমি তোমায় ছাড়াতে আসিনি, একটা খবর দিতে এসেছি।" এই কথা শেষ হতে না হতে আবার গুরুকন্যার স্বরে প্রশ্ন হলো—"কি খবর, শিগ্গির বল।" তখন মুটে-জামাই বললে—"বন্ধু, তুমি এখানে এসেছো শুনে সেই 'রামায়নের দল' এখানে আসছে।"

এই কথা যেই শোনা অমনি গুরুকন্যার কন্ঠস্বর বড়ই ক্ষীণ হয়ে গেল। তখন অতি কাতরভাবে বললে—"বন্ধু, বন্ধু! তারা কোন্ পথে আসছে—শীঘ্র বলো।" মুটে বললে—"এই সদর রাস্তা দিয়েই আসছে" এই শুনে গুরুকন্যার স্বরে ব্রহ্মদৈত্য বললে—"আগে থাকতে আমায় এই খবরটি দিয়ে বড়ই উপকার করলে, আমি এই খিড়কির দরজা দিয়ে চম্পট দিলুম।" বাস্, এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরুকন্যার আগেকার লজ্জা শরম সব ফিরে এল, বাড়িতে খুব আনন্দের ধুম পড়ে গেল। মুটে-জামাইয়েরও খুব নাম পড়ে গেল, তা' ছাড়া গুরুদেব, জামাই-বাবাজীর কাছে খুব উপকার স্বীকার করলেন; তাঁকে খুব অদর যত্ন করে আহারাদি করালেন; দু'-একদিন বাড়িতে রেখে শেষে লোকজন দিয়ে বিরাটগঞ্জে পাঠিয়ে দিলেন। এক 'রামায়ণ গান'-এর কল্যাণে মুটে ধনে মানে সকল রকমেই বড়লোক হয়ে গেল।

তিন চোর

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দেশে আকাল। মানুষ খেতে পায় না। সাধু পুরুষও চুরি ধরেছে, কাজেই চোরেদের দুর্দশার সীমা নেই। বাঙলা মুল্লুক ছেড়ে এক বাঙালী চোর চললো পশ্চিমে, চুরি-ব্যবসা সেখানে যদি ফ্যালাও করে করতে পারে, এই ভেবে।

কাশীর কাছে এক চটি। সেই চটিতে দুই পাঞ্জাবী চোরের সঙ্গে তার দেখা হলো।

চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই—এমনি একটা কথা আছে। কাজেই পরস্পরে চেনাচেনি হয়ে গেল। বাঙালী চোরকে তারা জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় চলেছো দাদা?

বাঙালী চোর বললে—চলেছি তোমাদের দেশে—টাকাকড়ির বড় সুবিধা হচ্ছে না দেশে—আকাল। ভারি দুর্দিন পড়েছে ভাই!

পাঞ্জাবী চোর বললে—পাঞ্জাবেও দুঃখের সীমা নেই! নাহলে আমরা দেশ ছেড়ে বেরিয়েছি!

তিনজনে বসে সুখ-দুঃখের নানা কথা হলো। বাঙালী চোর বললে—নিজের-নিজের কাহিনী শোনাই, এসো—

এক-নম্বর পাঞ্জাবী চোর বললে—কিন্তু সে-কাহিনী খুব রকমারি আর রংদার হওয়া চাই।

দু-নম্বর পাঞ্জাবী চোর বললে— আর, সে-কাহিনী শুনে কেউ তা মিথ্যা বলতে পারবে না। মানে, সে-কাহিনী মেনে নিতে হবে।

বাঙালী চোর বললে— বেশ, আর শুনে সে-কাহিনীকে যে বলবে আজগুবি কি মিথ্যা, তাকে পাঁচশ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

তিনজনেই বললে—বহুৎ আচ্ছা!

তখন এক-নম্বর পাঞ্জাবী চোর নিজের কাহিনী শুরু করলো। সে বলতে লাগলো—আমার বাপ ছিল লুধিয়ানার এক মস্ত গোয়ালা। গোয়ালে তাই গরু আর মোষের অন্ত ছিল না। গুনতিতে প্রায় সাত লক্ষ। এই সাত-লক্ষ গরু আর মোষের দুধ যা পাওয়া যেতো, সে দুধ জমা হতো মস্ত এক বাঁধানো তালাওয়ে, তালাওয়ের এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। দুধ দোওয়া হলে সেই তালাওয়ের মধ্যে গরু আর মোষগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হতো। তাদের মাতামাতির ফলে দুধ মইয়ে ঘোল তৈরি হতো; আর বড়-বড় নৌকো ভাসিয়ে তা থেকে ছানা তুলতো যত জোয়ান পাঞ্জাবীর দল। তারপর

সেই দুধ যোগান যেতো পাঁচটা লহর বয়ে। এই পাঁচ লহরের নাম হলো তোমার ঐ ঝিলাম, চেনাব, রাভি, বিয়াস আর সট্‌লেজ। এই পাঁচ লহর থেকেই সারা মুল্লুকের নাম হয়েছে পাঞ্জাব।

শেষে একসময় কেমন দুর্বৎসর এলো—যত চাকর-বাকব ভয়ানক চোর-বদমাশ হলো, আর তারা দুধে জল মেশাতে-মেশাতে এমন করে তুললে যে, এখন দেখবে সেই পাঁচ লহরে খালি জল আর জল! এপার থেকে ওপারে যাও—দুধে হাত পড়বে না! তাই ভাই, আজ আমাদের এমন দুর্দশা! আর তাই বিদেশে চলেছি মূলধন গুছিয়ে নতুন ব্যবসা ফাঁদতে।

বাঙালী চোর বেশ বুঝতে পারলো যে গল্পটি নিছক মিথ্যা। কিন্তু মুখে তা বলবার জো নেই! মিথ্যা বললে পাঁচশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। কাজেই সে বললে—তা ভাই, হবেই তো! সাত লক্ষ গরুর আর মোষের দুধ রাখতে গেলে অতবড় তালাও আর তার সঙ্গে পাঁচটা লহর না কাটলে কুলোতে পারবে কেন? আর ঐ চাকর-বাকরদের শয়তানির কথা বলছো! হুঃ, ওতে পাঁচটা লহর কেন, পাঁচ-দুগুনে দশ লহর বানালেও দেখবে যে জল, সেই জল! এ আর কী এমন মজার কাহিনী হলো!

দু-নম্বর পাঞ্জাবী তখন বললে—আমার কাহিনী বলি, শোনো—এই বলে সে শুরু করলে তার কাহিনী।

বললে—আমার বাপের ছিল হাঁসের কারবার। সমস্ত হাঁস খেলে বেড়াবে বলে মস্ত নালা কাটানো হলো, তার নাম দেওয়া হলো সিন্ধু-নদ। ঐ নদে হাঁস-গুলি ডানা মেলে ভেসে বেড়াতো। কী চমৎকার যে দেখাতো—যেন লক্ষ-লক্ষ নৌকো সাদা পাল তুলে ভাসছে! হাঁস দেখে চীনের সম্রাট ভারত-আক্রমণ করতে এসে ভয়ে পেছিয়ে গেল। সে ভাবলে, ওগুলো বুঝি জাহাজ ভাসছে! সে হাঁস এত বড় যে, দেখলে পালতোলা জাহাজ বলে সহজেই ভুল হতো! তারপর সেই হাঁসেরা ডিম পাড়তে লাগলো। বাবার হুকুমে ডিমগুলো পাঞ্জাবের এক কিনারায় জড়ো করা হলো। ওদিককার তিব্বত-চীন দেশগুলো সে-ডিমের পাহাড়ে ঢাকা পড়লো। পড়ে তাদের এমন দশা হলো যে রোদ না পেয়ে শীতে সব কালিয়ে মরে! আর এই ডিমের পাহাড়কে ভুল করে তারা ভাবলে, এমন সাদা পাহাড়—নিশ্চয় বরফের পাহাড়! তাই থেকে সেই ডিম-পাহারের নাম হয়ে গেল ডিমালয়। তিব্বতীরা নাকি ড-এর বদলে হ বলে। তারা ডিমা-লয় না বলে বলতে লাগলো হিমালয়। তাই থেকে ঐ হিমালয় পর্বত নাম হয়েছে। তারপর একদিন হলো কী, ঐ চীন-সম্রাটের কথা বললুম না? সেই চীন সম্রাটের ফৌজ যখন হাঁস দেখে ভয়ে পালাচ্ছিল, তখন তারা সেই ডিম পাহাড়ের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। যেমন পড়া—ভাবো ভাই, লক্ষ

লক্ষ ফৌজ! তাদের চাপে সব ডিম ছরকুটে ভেঙে গেল! আমরা গরিব হয়ে গেলুম। অত ডিম ভাঙলো— লোকসান কী রকম হলো, ভাবো একবার! তাই ভাই, এই স্বদেশী লোকটির সঙ্গে বিদেশের পথে বেরিয়েছি।

বাঙালী চোর বললে—ভারি আপসোসের কথা! অমন পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল! তা, এতেও মজা নেই— অত হাঁস ডিম পাড়লে ডিমের পাহাড় হবেই তো! তবে, সে ডিম রক্ষা করবার উপায় জানা চাই। জানতে না, কাজেই এখন পস্তাবেই তো।

পাঞ্জাবী চোর দুজন ভাবলে, এ তো আচ্ছা লোক! এমন আজগুবি গল্প শুনেও মিথ্যা বলে বুঝলো না—এ তো ভারি বেকুব!

তখন বাঙালী চোর বললে—এখন আমার কাহিনী শোনো, ভাই ভারী দুঃখের কাহিনী এ! বেকুবির চূড়ান্ত পরিচয় পাবে'খন।

বাঙালী চোরের পানে পাঞ্জাবী চোর দুজন হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। বাঙালী চোর তার কাহিনী শুরু করলে—

আমার বাবা ছিল গরিবের ছেলে। বাবারা বারো ভাই। অর্থাৎ আমার খুড়ো ছিল এগারো জন। বাবা সকলের বড়। মস্ত সংসার। অন্ন-বস্ত্র বাবাকেই যোগাড় করতে হতো। বাবার কষ্টের সীমা ছিল না। এর উপর এক বিপদ ঘটলো, ছোট কাকা একদিন গাছে উঠেছিল শালিক-পাখির ডিম চুরি করতে। গাছ থেকে পড়ে ছোটকাকার মাথা ফেটে গেল। রক্তে রক্ত একেবারে! বাবা ছুটে এসে রাশ-রাশ ধুলো কুড়িয়ে ছোটকাকার মাথায় চাপড়ে দিতে লাগলো। তাতে সে রক্ত থামলো। এখন সেই ধুলোর সঙ্গে ছিল কাপাসের বীজ,—বাবা তা দেখেনি। ছোটকাকার মাথা তো গেল সেরে; কিন্তু চুলের বদলে মাথায় কচি-কচি কাপাসের চারা গজিয়ে উঠলো। বোঝো ব্যাপার, মগজের মধ্যে শেকড় আঁটা! দৈবজ্ঞঠাকুর এলেন। কবিরাজ এলেন। তারপর পুরুত ঠাকুর এসে স্বস্ত্যয়ন করে বললেন, তোদের বরাত ফিরেছে রে! এই মাথার খদ্দের বাঙলা দেশে না জুটলেও ম্যাঞ্চেস্টার ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে এসে ওর মাথা ইজারা নেবে। লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে মাথার দাম। হলোও তাই ছোট-কাকার মাথায় সেই কাপাসের চারা বড় হতে লাগলো আর দু বছরে সেই সব গাছ বেড়ে তুলোর ফসল যা ফলতে শুরু হলো ভাই! ফরাসডাঙ্গা, সিমলের যত তাঁতি এসে তুলো নিতে লাগলো। শুধু তাই? বেহারে পাঞ্জাবে বোম্বাই মাদ্রাজে তুলো চালান যেতে লাগলো। ল্যাঙ্কাশায়ার ম্যাঞ্চেস্টারের বড়-বড় কাপড়ের মিল থেকে সাহেব-সুবোর দল ছোটকাকার আশেপাশে হাত পেতে ঘুরতে লাগলো, কিন্তু সবাই তো নগদ দাম দিতে পারে না! ধারে তুলো নিতে লাগলো। শেষে আমরা তুলোর যোগান দিয়ে উঠতে পারি না, এমন হলো ওদিকে দাম আদায়

হয় না। ভারি ফ্যাসাদ বাধলো! তারপর আমরা ক-ভাই বড় হতে আমার উপর ভার পড়েছে, পাঞ্জাবে যত তুলো যোগান দেওয়া হয়েছে তার দাম আদায় করতে। আমার দুই খুড়তুতো ভাই গেছে বোম্বাইয়ে আর কানানোরে বকেয়া দাম আদায় করতে। তা, তোমাদের সঙ্গে পথে দেখা হতে আমার অনেকখানি মেহনৎ বেঁচে গেল—

বাঙালী চোর এই অবধি বলে পাঞ্জাবী চোর দুজনের পানে তাকিয়ে রইলে। তারা অবাক হয়ে বললে—কেন?

বাঙালী চোর বললে—খাতায় দেখি তোমাদের বাপেরাও ছোটকাকার মাথার তুলো কিনেছিল। তা, তার দাম পাওনা আছে—তোমার বাবার কাছ থেকে পাঁচশ টাকা, আর তোমার বাবার কাছ থেকে পাঁচশ টাকা—সেই টাকাগুলি এখন দিয়ে দাও তো ভাই!

কথা শুনে পাঞ্জাবী চোর দু-জন ভয়ে শিউরে উঠলো! এ বলে কী? সর্বনাশ!

কিন্তু এ কাহিনী মিথ্যা বললে পাঁচশ করে টাকার দায়! জরিমানা দেওয়া কিন্তু লজ্জার কথা! তার চেয়ে—

পাঞ্জাবী চোর দু-জন থলি খুলে পাঁচশ-পাঁচশ টাকা গুনে বাঙালী চোরের হাতে দিলে। দিয়েই তলপি বেঁধে সরে পড়বার উদ্যোগ করছে দেখে বাঙালী চোর বললে—কোথা যাও?

পাঞ্জাবী চোর দু'জন জবাব দিলে—দেশে ফিরে যাই। বাঙলা মাথার যে-কাহিনী শুনলুম, বাপরে! মাথায় কাপাসের চাষ, তার দরুন এই দেনা! সে মুল্লুকে গিয়ে পড়লে এমনি পুরোনো দেনা শুধতে-শুধতেই ফতুর হয়ে যাবো!

এই কথা বলে তারা চটপট সরে পড়লো। বাঙালী চোর কড়কড়ে এক হাজার টাকা তলপিতে বেঁধে নিয়ে ভাবলে, আমিও দেশে ফিরি। কিন্তু ফেরবার আগে যখন কাশীর কাছে এসেছি, একবার মা-গঙ্গার জলে দুটো ডুব দিয়ে বাবা-বিশ্বনাথের চরণে প্রণাম জানিয়ে যাই।

সবজান্তা

সুকুমার রায়

আমাদের 'সবজান্তা' দুলিরামের বাবা কোন একটা খবরের কাগজের সম্পাদক। সেই জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে তাহার সমস্ত কথার উপরে অগাধ বিশ্বাস দেখা যাইত। যে কোনো বিষয়েই হোক, জার্মানির লড়াইয়ের কথাই হোক আর মোহনবাগানের ফুটবলের ব্যাখ্যাই হোক, দেশের বড় লোকদের ঘরোয়া গল্পই হোক আর নানারকম উৎকট রোগের বর্ণনাই হোক, যে কোনো বিষয়ে সে মতামত প্রকাশ করিতে, একদল ছাত্র অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সকল কথা শুনিত। মাস্টার মহাশয়দের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ে তাহার ভারি পক্ষপাতী ছিলেন। দুনিয়ার সকল খবর লইয়া সে কারবার করে, সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয় তাহার নাম দিয়াছিলেন 'সবজান্তা'। আমার কিন্তু বরাবরই বিশ্বাস ছিল যে, সবজান্তা যতখানি পাণ্ডিত্য দেখায় আসলে তার অনেকখানি উপর-চালাকি। দু-চারিটি বড় বড় শোনা কথা, আর খবরের কাগজ পড়িয়া দু-দশটা খবর, এইমাত্র তার পুঁজি, তাহারই উপর রংচং দিয়া, নানারকম বাজে গল্প জুড়িয়া সে তাহার বিদ্যা জাহির করিত। একদিন আমাদের ক্লাশে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে সে নায়েগারা জলপ্রপাতের গল্প করিয়াছিল। তাহাতে সে বলে যে, নায়েগারা দশ মাইল উঁচু ও একশত মাইল চওড়া! একজন ছাত্র বলিল, 'সে কি ক'রে হবে? এভারেস্ট সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, সেই মোটে পাঁচ মাইল'—সবজান্তা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, 'তোমরা তো আজকালকার খবর রাখ না!' যখন তাহার কোনো কথায় আমরা সন্দেহ বা আপত্তি করিতাম, সে একটা যা তা নাম করিয়া আমাদের ধমক দিয়া বলিত, 'তোমরা কি অমুকের চাইতে বেশি জান?' আমরা বাহিরে সব সহ্য করিয়া থাকিতাম, কিন্তু এক এক সময় রাগে গা জ্বলিয়া যাইত।

সবজান্তা যে আমাদের মনের ভাবটা বুঝিত না, তাহা নয়। সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিত এবং সর্বদাই এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, আমরা তাহার কথাগুলি মানি বা না মানি, তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। নানারকম খবর ও গল্প জাহির করিবার সময়, মাঝে মাঝে আমাদের শুনাইয়া বলিত, 'অবিশ্যি, কেউ কেউ আছেন, যাঁরা এসব কথা মানবেন না' অথবা 'যাঁরা না প'ড়েই খুব বুদ্ধিমান, তাঁরা নিশ্চয়ই এ-সব উড়িয়ে দিতে চাইবেন'—ইত্যাদি। ছোকরা বাস্তবিকই অনেক রকম খবর রাখিত, তার উপর তার

বোলচালগুলিও ছিল বেশ ঝাঁঝালো রকমের; কাজেই আমরা বেশি তর্ক করিতে সাহস পাইতাম না।

তাহার পরে একদিন, কি কুক্ষণে, তাহার এক মামা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া, আমাদেরই ইস্কুলের কাছে বাসা লইয়া বসিলেন। তখন আর সবজান্তাকে পায় কে! তাহার কথাবার্তার দৌড় এমন আশ্চর্য রকম বাড়িয়া চলিল যে, মনে হইত বুঝিবা তাহার পরামর্শ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পুলিশের পেয়াদা পর্যন্ত কাহারও কাজ চলিতে পারে না। ইস্কুলের ছাত্র মহলে তাহার খাতির ও প্রতিপত্তি এমন আশ্চর্য রকম জমিয়া গেল যে, আমরা কয়েক বেচারা, যাহারা বরাবর তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছি—আমরা একেবারে কোণঠাসা হইয়া রহিলাম। এমন কি, আমাদের মধ্য হইতে দু-একজন তাহার দলে যোগ দিতেও আরম্ভ করিল।

অবস্থাটা শেষটায় এমন দাঁড়াইল যে, ইস্কুলে আমাদের আর টেঁকা দায়! দশটার সময় মুখ কাঁচুমাচু করিয়া ক্লাশে ঢুকিতাম আর ছুটি হইলেই, সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপ হাসি-তামাশার হাত এড়াইবার জন্য দৌড়িয়া বাড়ি আসিতাম। টিফিনের সময়টুকু হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের সামনে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া, অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো পড়াশুনা করিতাম।

এই রকম ভাবে কতদিন চলিত জানি না, কিন্তু একদিনের একটি ঘটনায় হঠাৎ সবজান্তা মহাশয়ের জারিজুরি সব এমনই ফাঁস হইয়া গেল যে, তাহার অনেকদিনকার খ্যাতি ঐ একদিনেই লোপ পাইল—আর আমরাও সেইদিন হইতে একটু মাথা তুলিতে পারিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেই ঘটনারই গল্প বলিতেছি—

একদিন শোনা গেল, লোহারপুরের জমিদার রামলালবাবু আমাদের ইস্কুলে তিন হাজার টাকা দিয়াছেন—একটি ফুটবল গ্রাউন্ড ও খেলার সরঞ্জামের জন্য। আরও শুনিলাম, রামলালবাবুর ইচ্ছা সেই উপলক্ষে আমাদের একদিন ছুটি ও একদিন রীতিমত ভোজের আয়োজন হয়। কয়দিন ধরিয়া এই খবরটাই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। কবে ছুটি পাওয়া যাইবে, কবে খাওয়া এবং কি খাওয়া হইবে, এই সকল বিষয়ে জল্পনা চলিতে লাগিল। সবজান্তা দুলিরাম বলিল, যেবার সে দার্জিলিঙ গিয়াছিল, সেবার নাকি রামলালবাবুর সঙ্গে তাহার দেখা-সাক্ষাৎ এমন কি আলাপ পরিচয় পর্যন্ত হইয়াছিল। রামলালবাবু তাহাকে কেমন খাতির করিতেন, তাহার কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া কি কি প্রশংসা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সে ইস্কুলের আগে এবং পরে, সারাটি টিফিনের সময়, এবং সুযোগ পাইলে ক্লাশের পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকেও নানা অসম্ভব রকম গল্প বলিত। 'অসম্ভব'

বলিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেলার দল সে সকল কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে একটুও বাধা বোধ করিত না।

একদিন টিফিনের সময় উঠানের বড় সিঁড়িটার উপর একদল ছেলের সঙ্গে বসিয়া সবজান্তা গল্প আরম্ভ করিল—'আমি একদিন দার্জিলিঙে লাট-সাহেবের বাড়ির কাছেই ঐ রাস্তাটায় বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি রামলালবাবু হাসতে হাসতে আমার দিকে আসছেন, তাঁর সঙ্গে আবার এক সাহেব। রামলালবাবু বললেন, 'দুলিরাম! তোমার সেই ইংরাজি কবিতাটি একবার এঁকে শোনাতে হচ্ছে। আমি এঁর কাছে তোমার সুখ্যাতি করছিলাম, তাই ইনি সেটা শুনবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন!' উনি নিজে থেকে বলছেন, তখন আমি আর কি করি? আমি সেই CASABIANCA থেকে আবৃত্তি করলুম—তারপর দেখতে দেখতে যা ভিড় জমে গেল! সবাই শুনতে চায়, সবাই বলে 'আবার কর।' মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম, নেহাত রামলালবাবু বললেন তাই আবার করতে হল।' এমন সময় কে যেন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল 'রামলালবাবু কে?' সকলে ফিরিয়া দেখি, একটি রোগা নিরীহ গোছের পাড়া-গেঁয়ে ভদ্রলোক সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সবজান্তা বলিল, 'রাম-লালবাবু কে, তাও জানেন না? লোহারপুরের জমিদার রামলাল রায়।' ভদ্র-লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, তার নাম শুনেছি—সে তোমার কেউ হয় নাকি?' 'না, কেউ হয় না—এমনি খুব ভাব আছে আমার সঙ্গে। প্রায়ই চিঠিপত্র চলে।' ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, 'রামলালবাবু লোকটি কেমন?' সবজান্তা উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল 'চমৎকার লোক। যেমন চেহারা, তেমনি কথাবার্তা, তেমনি কায়দা-দুরস্ত। এই আপনার চেয়ে প্রায় আধ হাত খানেক লম্বা হবেন, আর সেই রকম তাঁর তেজ! আমাকে তিনি কুস্তি শেখাবেন বলেছিলেন, আর কিছুদিন থাকলেই ওটা বেশ রীতিমত শিখে আসতাম।' ভদ্রলোকটি বলিলেন, 'বল কিহে? তোমার বয়স কত?' 'আজ্ঞে এইবার তের পূর্ণ হবে।' 'বটে! বয়সের পক্ষে খুব চালাক তো! বেশ তো কথাবার্তা বলতে পার! কি নাম হে তোমার?' সবজান্তা বলিল, 'দুলিরাম ঘোষ। রণদাবাবু ডেপুটি আমার মামা হন।' শুনিয়া ভদ্রলোকটি ভারি খুশি হইয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ছুটির পর আমরা সকলেই বাহির হইলাম। ইস্কুলের সম্মুখেই ডেপুটি-বাবুর বাড়ি, তার বাহিরের বারান্দায় দেখি, সেই ভদ্রলোকটি বসিয়া দুলিরামের ডেপুটি-মামার সঙ্গে গল্প করিতেছেন। দুলিরামকে দেখিয়াই মামা ডাক দিয়া বলিলেন— 'দুলি, এদিকে আয়, এঁকে প্রণাম কর—এটি আমার ভাগনে দুলিরাম।' ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, এর পরিচয় আমি আগেই

পেয়েছি।' দুলিরাম আমাদের দেখাইয়া খুব আড়ম্বর করিয়া ভদ্রলোকটিকে প্রণাম করিল। ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, 'আমার পরিচয় জান না বুঝি?' সবজান্তা এবার আর 'জানি' বলিতে পারিল না, আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। ভদ্রলোকটি তখন বেশ একটু মুচকি-মুচকি হাসিয়া আমাদের শুনাইয়া বলিলেন, 'আমার নাম রামলাল রায়; লোহারপুরের রামলাল রায়।'

দুলিরাম খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখখানা লাল করিয়া হঠাৎ এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া ছেলেরা রাস্তার উপর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। তার পরের দিন আমরা ইস্কুলে আসিয়া দেখিলাম—সবজান্তা আসে নাই, তাহার নাকি মাথা ধরিয়াছে। নানা অজুহাতে সে দু-তিন দিন কামাই করিল, তারপর যেদিন সে ইস্কুলে আসিল, তখন তাহাকে দেখিবামাত্র তাহারই কয়েকজন চেলা 'কিহে। রামলালবাবুর চিঠিপত্র পেলে?' বলিয়া তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর যতদিন সে ইস্কুলে ছিল, ততদিন তাহাকে খেপাইতে হইলে বেশি কিছু করা দরকার হইত না, খালি একটিবার রামলালবাবুর খবর জিজ্ঞাসা করিলেই বেশ তামাশা দেখা যাইত।

লছমন

নরেন্দ্র দেব

বাবা সরকারি দপ্তরে চাকরি ক'রতেন। হঠাৎ বদলি হ'য়ে গেলেন। আমরা গোয়াড়ী থেকে একেবারে গোরক্ষপুরে এসে পড়লুম। আমাদের বাড়ির বাঙালি চাকর হরিচরণ দেশ ছেড়ে আমাদের সঙ্গে এতদূর আসতে চাইলে না। চাকরি ছেড়ে দিলে। কাজেই, এখান এসে একজন নূতন চাকর রাখা হ'ল। তার নাম—লছমন। সে হিন্দুস্থানি। গোরক্ষপুরেই তার বাড়ি।

লছমনকে রাখবার সময় মা তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে নিলেন—"এই তোম্ হাম্‌লোক্‌কা বাঙালি বাত্ বুঝ্‌তে ক'রতে পারতা হ্যায়?" মা আমার এর চেয়ে ভালো হিন্দি ব'লতে পারতেন না। মার সেই না হিন্দি না বাংলা কথা শুনে লছমন তার পাগড়ি বাঁধা মস্ত মাথা নেড়ে মাকে এক লম্বা সেলাম ঠুকে বললে—"হাঁ হুজুর!" মা খুশী হ'য়ে তাকে রাখলেন।

কিন্তু, প্রথম দিনেই টের পাওয়া গেলো যে—সে বাংলা মোটেই বোঝে না। তবুও মা তাঁর সেই 'না-হিন্দি না-বাংলা' কথাতেই তাকে নিয়ে কাজ চালাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাংলা কথা শেখাতেও শুরু করে দিলেন, তাঁর কাজের সুবিধে হবে বলে।

লছমন ছিল খুব চটপটে! চক্ষের নিমেষে সে সব কাজ ক'রে ফেলত'। খুব খাটতে পারত সে। ইঁদারা থেকে ঘড়া ঘড়া জল তোলা, বাটনাবাটা, বাসন মাজা, সাবান দিয়ে কাপড় কাচা, ঘর দোর ঝাড়া-মোছা, বিছানা করা, বাবার তামাক সাজা—সব কাজ সে একা করতো।

কিন্তু মুশকিল বাধলো তার ওই বাংলা কথা না বুঝেও—বুঝতে পেরেছি বলায়। কারণ, মা তাকে যখনি যা কিছু ফরমাশ করতেন তখনি এই কথাটাও জিজ্ঞাসা ক'রতেন—"বুঝতে ক'রতে পার্‌তা হ্যায়?" লছমনও তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে লম্বা সেলাম ঠুকে ব'লতো—"হাঁ হুজুর!"

একদিন মা তাকে একটা টাকা ভাঙাতে দিয়ে তাঁর সেই হিন্দি ভাষায় বললেন "এই রুপিয়াকা ভাঙায়কে নিয়ায়।" লছমন তৎক্ষণাৎ সেলাম ঠুকে ছুটে বেরিয়ে গেলো। খানিক পরেই মস্ত বড় একটা কাগজের ঠোঙা হাতে করে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ইয়ে কি আভি পিশ্‌নে হোগা?"

মা ব'ললেন—"নেই—নেই। বাটনা ত' সব বাটা হ'য়ে গেছে। আর তো কিছু মস্‌লা পিশ্‌নে নেই হোগা। তোম্ যাও ওই টাকাটা ভাঙিয়ে লে আও।"

লছমন সবিনয়ে বললে,—"রুপেয়াকা তো ভাঙা লে-আয়া মাইজী।"

মা বললেন—"কই দে। রেজকি এনেছিস্ ত? না সব পয়সা? ষোল আনা গুণকে আনা হ্যায় ত?"

লছমন সেলাম ঠুকে সেই কাগজের ঠোঙা মার হাতে তুলে দিয়ে ব'ললে—"হাঁ হুজুর ষোলো আনাকে পুরা ভাঙ লে আয়া।" বলেই সে কাগজের ঠোঙাটা আবার এগিয়ে ধর'লে মার সামনে। সেটা হাতে নিয়ে মা দেখলেন—তাঁর লছমন চাকর এক ঠোঙা ঠাসা 'সিদ্ধি' কিনে এনেছে এক টাকা দিয়ে! মা ত' রেগেই খুন! মাথা কপাল চাপড়ে বাবার কাছে গিয়ে বলে দিলেন যে, লছমনকে তিনি একটা টাকা ভাঙাতে দিয়েছিলেন, সে একটাকার সিদ্ধি কিনে এনেছে!

বাবা শুনে খুব হেসে উঠে বললেন—"ঠিকই করেছে! এদেশে যে ওরা 'সিদ্ধি'কে ভাঙ বলে তা জানো না? তুমি ওকে এক রুপেয়া ভাঙাতে বলেছো—ও বুঝেছে তুমি এক রুপেয়ার ভাঙ আনতে বলেছো!" মা শুনে অবাক! সিদ্ধিকে এরা ভাঙ বলে!

লছমন বাজার করতে গিয়ে আরও অনেক বার এই রকম ভুল করে মা'র কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল। দু চারটে ঘটনা আমার আজও মনে আছে। একবার আমার খুব অসুক হয়েছিল। ডাক্তার বেদানার রস খেতে দিতে বলে গেলো। মা তৎক্ষণাৎ লছমনকে ডেকে বেদানা আনতে দিলেন। বারবার বলে দিলেন যেন বেশ বড়ো দেখে বেদানা নিয়ে আসে কারণ রস তৈরি হবে।

লছমন 'জো হুকুম!' বলে সেলাম ঠুকে ঝাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে সদর বাজার ঘুরে আমার জন্য বেশ বড় দেখে একটা তামার বদ্‌না কিনে এনে হাজির করেছিল।

আর একবার দিদিকে সঙ্গে করে নিয়ে আমাদের জামাইবাবু এসেছিলেন—গোরক্ষপুরে বেড়াতে। তখন ডিসেম্বর মাস, খুব কনকনে শীত। মা জামাইবাবুর জল খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গোরক্ষপুরে সন্দেশ পাওয়া যায় না—বরফি পাওয়া যায়। মা লছমনকে পয়সা দিয়ে বেশ করে বুঝিয়ে বলে দিলেন—"খাস্তার কচুরি, টাট্‌কা সিঙাড়া, কালাকাঁদ বরফি, অমৃতি জিলিপি, বালুশাই গজা, বড় বড় দরবেশ—এই সব খাবার হিঁয়া যা মিলতা হায় তাড়াতাড়ি লে আও!"

লছমন সেলাম ঠুকে "জো হুকুম হুজুর!" বলে এক লাফে বেরিয়ে চলে গেল। অন্য দিন সে দোকানে যায় আর ছুটে চলে আসে, একটুও দেরি করে না। সেদিন কিন্তু লছমনের আর দেখা নেই। বিকেল ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। জামাইবাবুর জলখাবার দিতে দেরি হচ্ছে। মা একেবারে অস্থির হয়ে ঘরবার করছেন, কিন্তু লছমন আর ফেরে না!

ক্রমে, সন্ধ্যে যখন বেশ ঘনিয়ে এলো, দোকানে দোকানে আলো জ্বালা হতে শুরু হয়েছে, লছমনের ফিরে আসার আর কোনো সম্ভাবনা নেই মনে করে মা যেই স্টোভ জেবলে ঘরেই জামাইবাবুর জন্য হালুয়া-লুচি তৈরি করে দেবার যোগাড় করছেন, এমন সময় বাইরে থেকে লছমনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, আরেকজন কাকে যেন সে খুব খাতির করে বলছে—"আইয়ে জনাব আলি অন্দরমে আইয়ে—"

একটু পরেই লছমন সব জিনিস-পত্র নিয়ে ভিতরে এলো। মাথায় একটা কলসি। সঙ্গে তার প্রকাণ্ড দাড়িওয়ালা আলখাল্লা পরা একজন মুসলমান ফকির। মা তাকে এত দেরি করে ফিরে এলো কেন জিজ্ঞাসা করতেই লছমন লম্বা সেলাম ঠুকে করুণ কন্ঠে জানালে যে দরবেশ আনতে তাকে শহরের বাইরে যেতে হয়েছিল। তাই দেরি হ'ল। শহরের চারদিক সে খুঁজেছে—কোথাও দরবেশ মেলেনি। শেষে, একজন ভুঁজাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে তাকে বাতলে দিলে যে শহরের বাইরে ইমামবাড়িতে দরবেশ পাওয়া যাবে।

মা তাকে বাধা দিয়ে ধমকে উঠে বললেন, "দরবেশ পাওয়া গেল না ত' ফিরে এলিনে কেন? শহরের বাইরে তোকে কে যেতে বলেছিল। আমি না তোকে তাড়াতাড়ি আসতে বলে দিয়েছিলুম?"

লছমন আবার ঘাড় নেড়ে সেলাম ঠুকে বললে, "হাঁ হুজুর! হুকুম তামিল! আচ্ছা তাড়িভি লে আয়া!" তারপর সে মাকে বুঝিয়ে বলতে গেলো যে শহরের বাইরে গেলেও এত দেরি তার হ'তনা, কিন্তু কি করবে সে—পথে নমাজের সময় হয়ে গেলো, তাই দরবেশ সাহেব দোয়া ক'রে নমাজ পড়তে বসলেন, অগত্যা তার ফিরতে দেরি হ'ল—শুধু তাড়ি কেন—সব জিনিসই সে গুছিয়ে এনেছে— বলে মাথার উপর থেকে মস্ত এক তাড়ির ভাঁড় মার সামনে রকের উপর নামিয়ে দিলে!

মা ত' রেগেই খুন! "তাড়ি আনতে তোকে কে বলেছিল? আমি তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিলুম"—বলে গালাগালি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন—"খাবার কই রে মুখপোড়া গাধা। তোকে যে জামাইবাবুর জন্যে টাট্‌কা সিঙাড়া, কালাকাঁদ, বরফি, বালুশাই, গজা, সব আন্‌তে দিয়েছিলুম—কই সে সব?"

লছমন মস্ত এক সেলাম ঠুকে বললে, "সবকুছ লে-আয়া হুজুর!—" তারপর তার গামছার একটা ভিজে কোণের গাঁট খুলে বার করে দিলে সেই পৌষমাসের শীতে করাতের গুঁড়োমাখা এক ড্যালা—বরফ! ব'ললে—"লিজিয়ে হুজুর কলকা—বরফ-ইয়ে!" তারপর অতি সন্তর্পণে ট্যাঁক থেকে একটা কাগজে মোড়া গাঁজার পুরিয়া বার করে দিয়ে ব'ললে, "ইয়ে লিজিয়ে হুজুর, জামাই

বাবুকা ওআস্তে বালাশ্বরকা গাঁজা!” তারপর গামছার আর এক কোণ খুলে একরাশ পানিফল রকের উপর ঢেলে দিয়ে বললে—“ইসসে বঁাড়িয়া তাজা সিঙাড়া আউর নেহি মিলা, হুজুর!” পরে তার পিছনে যে ফকির সাহেব এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল এইবার তাকে এক সেলাম ঠুকে মার কাছে এগিয়ে এনে বললে—“ইয়ে দেখিয়ে হুজুর আপকা দরবেশ ভি হাজির! বহুৎ তক্‌লিফ্‌ সে ইন্‌কো মিলা!—”

জামাইবাবুর জলখাবার থেকে ভাগ পাবার লোভ যে আমাদের মনে মনে ছিল না এ কথা বলতে পারবো না, কিন্তু লছমন যে এমন কাণ্ড করবে তা’—মা কেন —আমরাও কেউ স্বপ্নে ভাবিনি! এদেশে পানফলকে যে এরা ‘সিঙাড়া’ বলে সেদিন প্রথম জানলুম। কোথায় কালাকাঁদ বরফি আসবে, তা না লছমন কিনে নিয়ে এলো কিনা—এই শীতে কল্‌কা বরফ! বালুশাই গজার বদলে নিয়ে এলো কিনা—বালেশ্বরের গাঁজা! দরবেশ মেঠাইও কি ও বেটা কখনো খায়নি? নিয়ে এলো কিনা লম্বা দাড়িওয়ালা ফকির সাহেবকে ধরে! মা বলে দিলেন ওকে তাড়াতাড়ি আসতে—আর ও নিয়ে এলো কিনা একভাঁড় তাড়ি! ভয়ানক রেগে উঠে মা যখন লছমনকে “দূর হ’—বেরো—এখনি বিদেয় হ’য়ে যা—” ব’লে বক্‌ছেন সেই সময় বাবা বাড়ির ভিতর এসে মাকে বললেন, “একটা পান দাওতো শীগ্‌গির! মুখটা কেমন তেতো বোধ হচ্ছে!”

লছমন শুনতে পেয়ে তড়াক্‌ করে লাফিয়ে উঠে এক সেলাম ঠুকে “জো হুকুম!” ব’লে ছুটে গিয়ে এক বালতি জল এনে বাবার সামনে ধরলে। বাবা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “ইয়ে কোন্‌ তুমকো লেয়ানে বোলা?” লছমন সেলাম ঠুকে ব’ললে, “আভি’ ত আপ্‌ এক টব পানি মাঙা মাজীসে!”

বাবা লছমনের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে মার দিকে ফিরে চাইতেই মা’ তাঁর সব রাগ ভুলে গিয়ে খুব খানিক হেসে উঠে বললেন, “হাড় জ্বালাতন করলে তোমার এই হতভাগা চাকর! একটা পান চাইলে তুমি আমার কাছে—ও তাই শুনে দৌড়ে গিয়ে এক টব পানি এনে হাজির করেছে তোমার সামনে! এইতেই তুমি অবাক্‌ হয়ে যাচ্ছ!—আর এদিকে একবার চেয়ে দেখো কী কাণ্ড!”

তারপর সেই দাড়িওয়ালা দরবেশ থেকে আরম্ভ করে তাড়ির ভাঁড় ও বালেশ্বরের গাঁজা—সবই একে একে মা দেখালেন তাঁকে। কলের বরফ তখন প্রায় গলে এসেছে!

সেই রাত্রেই দরবেশকে নগদ কিছু বখশিশ দিয়ে বিদেয় করে, বাবা লছমনকে জবাব দিলেন।

পারম্পর্য

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কর্তা বুড়ো হয়েছেন, একটা খানসামা না হলে আর চলে না। এমন খানসামা চাই যে নিজেই সব দেখে শুনে কাজকর্ম করবে, কর্তাকে তার জন্যে বকাবকি করতে হবে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি চট্‌পটে খানসামা জুটলো। সে বললে দশঘরার নবাববাবুর বাড়িতে তার খানসামাগিরির শিক্ষা আরম্ভ, তার পর চোরকাঁটার জমিদার, শেষে ঘুঘুচরের মহারাজ—এঁদের কাছে কাজে সে হাত পাকিয়েছে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কোনো কাজ শিখতে তার বাকি নেই। শুনে কর্তা ভারি খুসি, বললেন, "বেশ, তুমিই থাক। কাজকর্ম সব দেখে শুনে নাও।" সে কাজকর্ম বুঝে নিচ্ছে এমন সময় কর্তা তাকে ডেকে বললেন—"ওহে, কাজ তো বুঝে নিচ্ছ, কাজের পারম্পর্য বোঝ?" সে মাথা চুলকে বললে—"আজ্ঞে না কর্তা, টুলো-পণ্ডিতের ঘরে তো কাজ করিনি যে ও কথার মানে বুঝবো!" কর্তা বললেন—"পারম্পর্য মানে এই পর পর আর কি! যেমন ধর তোমায় তেল আনতে বললুম, তুমি তখনই বুঝবে, এর পর স্নানের জলের দরকার, তারপরই ভাতের ঠাঁই করে ভাত, তার-পর তামাক, তারপর ঘুমের বিছানা তৈরি! এই এক হুকুম থেকেই তোমাকে তার পরের কাজগুলি বুঝে নিয়ে করতে হবে—একেই বলে কাজের পারম্পর্য! বুঝলে?"

খানসামা জোড় হাত করে বললে—"আজ্ঞে বুঝলুম।"

কর্তা বললেন—"দেখ, এখানে যদি চাকরি বজায় রাখতে চাও, তাহলে ঐ পারম্পর্য বুঝে কাজ করতে হবে।"

খানসামা বললে—"যে আজ্ঞে।"

সেই দিন রাত্রে কর্তার একটু মাথা ধরলো। তিনি নতুন খানসামাকে ডেকে পাঠালেন মাথাটা একটু টিপে দেবার জন্যে। দু মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, আধঘন্টা গেল, একঘন্টা গেল, খানসামার দেখা নেই। কর্তা বিরক্ত হয়ে ছটফট করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন শেষ রাত্রি তখন খানসামা এসে দরজা ঠেলাঠেলি করে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো।

কর্তা চেঁচিয়ে উঠে বললেন—"কে রে?"

"আজ্ঞে, আমি হুজুর!"

কর্তা রেগে উঠে বললেন—"এতক্ষণে আসবার তোমার ফুরসুত হোলো—পাজী ব্যাটা!"

"আজ্ঞে কি করব হুজুর; পারম্পর্য করতে করতে একটু দেরি হয়ে গেল।"

"এতক্ষণ ধরে কি পারম্পর্য করছিলি ব্যাটা!"

"আজ্ঞে আপনি বলে পাঠালেন আপনার মাথা ধরেছে, তাই বুঝলুম এরপরই ডাক্তার ডাক্‌তে হবে, ছুটলুম ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তার এলেই ওষুধ দেবে তো? ছুটলুম দাওয়াই-খানায় তাদের বলতে তাড়াতাড়ি দোকান না বন্ধ করে। ওষুধ খেয়ে যদি আপনার অসুখ না সারে তাহলেই তো পটল তুলবেন—সেই ভেবে উকিলকে খবর দিতে ছুটলুম যদি উইল করেন। তারপর শ্মশানের ভাবনা। খাট যোগাড় করা, কাঠ যোগাড় করা, লোকজন ডাকা। তারপর শ্রাদ্ধ—বামুন পুরুতকে খবর দেওয়া, কি কি জিনিস চাই তার ফর্দ করা—সব এই একরাত্রের মধ্যে করে ফেলেছি কর্তা! দেখুন না হুজুর আপনার বৈঠকখানায় লোক গিস্‌গিস করছে। এখন কিছু টাকা দ্যান, দেনাগুলো মেটাই। তারপর নেমন্তন্ন করতে বেরুতে হবে।"

কর্তা সব শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন—"পারম্পর্য তো এখনো শেষ হয় নি বাপু!"

খানসামা অবাক হয়ে বললে—"তাই নাকি, আর তো আমার কিছু মাথায় আসছে না কর্তা!"

"মাথায় এনে দিচ্ছি তোমার! রেসো না"—বলে আবার বললেন—"কর্তার মৃত্যুর পর তার খানসামা কি আর থাকে?"

"আজ্ঞে কর্তা" বলে খানসামা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগল।

কর্তা বললেন—"তা হচ্ছে না বাপু, পারম্পর্য যখন এতদূর পর্যন্ত টেনেছে, তখন ওর শেষ অবধি তোমায় নিয়ে যেতে হবে।"

খানসামা কটমট করে চেয়ে বললে—"আচ্ছা!" বলে ঝট করে বেরিয়ে গেল।

কর্তা ভয়ে ভয়ে ভাবতে লাগলেন চাকরটা এর পরেও পারম্পর্য করতে অগ্রসর হয় কিনা।

কার্তিক-পুজোর ভূত

হেমেন্দ্রকুমার রায়

নতুন মেস-বাড়ি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এখনো ব্যবসাদারির গন্ধ বিকট ভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি। এখনো মাছের ঝোলে কেবল আঁশ বা কাঁটার বদলে সত্যিকার মৎস্য পাওয়া যায়, এখনো ডাল বলতে বোঝায় না কেবল ঘোলাটে জল এবং এখনো আলুর দম বা কালিয়ায় তৈলের ব্যবস্থা হয়নি ঘৃতাভাবে।

তেতালায় পাশাপাশি তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়ে তিন বন্ধুতে দিব্য আরামে হাত-পা ছড়িয়ে বাস করছিল। তিনি বন্ধু—অর্থাৎ অটল, পটল ও নকুলের কথা বলছি। কিন্তু একটু গোলমাল বাধল। চাঁদের আলো এবং ফুলের গন্ধের মতন মানুষের সুখ-শান্তিও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ভগবানের সৃষ্টির এই সব অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা নিয়ে অটল, পটল ও নকুল একসঙ্গে বিলক্ষণ মাথা ঘামিয়েছে, কিন্তু সঙ্গত কারণ খুঁজে পায়নি।—ব্যাপারটা এই।

সেদিন সকাল-বেলায় মেসের কর্তার ঘরে ব'সে অটল, পটল ও নকুল চা-পান ও হালুয়া ভক্ষণ করছে, এমন সময়ে একটি নূতন লোকের আবির্ভাব।

লোকটির মাথায় বাবরি-কাটা চক্‌চকে চুল, গোঁফটির দুই প্রান্ত সুচারু-রূপে পাকানো, গায়ের পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবির তলা থেকে রাঙা গেঞ্জির রং ফুটে বেরুচ্ছে, পায়েও রঙিন মোজা ও বাহারি জুতো। কিন্তু বেচারার সৌখিনতা প্রকাশের এত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে একটিমাত্র কারণে। তার ডান চোখটি কাণা!

কিন্তু তার সেই একটিমাত্র চক্ষু যেমন তীক্ষ্ন, তেমনি চটুল ও চট্‌পটে। ঘরে ঢুকেই বোধ হয় আধ-সেকেণ্ডের মধ্যেই সেখানে বিরাজমান চার মূর্তির আপাদমস্তক সে ভালো ক'রে দেখে নিলে।

মেসের কর্তা সুধোলেন, "মশাই কি চান?"

—"আমার নাম ননীনাথ নাগ। এই মেসে বাসা বাঁধতে চাই। এখানে আগেও একবার বাসা বেঁধেছিলুম।"

—"তা কি ক'রে হবে? আমার এ-মেসের জন্ম হয়েছে মোটে একমাস।"

—"তা হ'তে পারে। কিন্তু এখানে আগেও একটি মেস ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে তিন বৎসর।"

—"ও, বটে বটে? এ-খবরটা আমি জানতুম না।"

—"মশাই তাহলে নতুন মালিক? বেশ, বেশ! বলি, এখানে একখানা ঘর-টর খালি পাওয়া যাবে?"

—"দোতালার সব ঘর ভর্তি। তেতালায় একখানা ঘর খালি আছে—"

ননী একেবারে আঁতকে উঠে একটিমাত্র চক্ষুকে দুইগুণ বাড়িয়ে তুলে বললে, "ওরে বাপরে, তেতালায়? অসম্ভব!"

—"অসম্ভব? কি অসম্ভব?"

—"তেতালায় থাকা।"

—"কেন?"

—"আগে এখানকার তেতালায় কেউ থাকত না। অর্থাৎ থাকতে চাইত না।"

—"কেন?"

—"আগে তেতলায় ওঠবার সিঁড়ির দরজায় লাগানো থাকত তালা-চাবি।"

—"কেন মশাই, কেন?"

—"আগে সন্ধ্যের পর কেউ এখানে তেতালার নাম পর্যন্ত মুখে আনত না।"

—"আরে মশাই,—কেন, কেন কেন? নিজের মনে খালি বক্-বকই ক'রে যাচ্ছেন, আসল কথা বলবার নাম নেই!"

ননী মালিকের মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে একটিমাত্র চক্ষু মুদে বললে, "নিতান্তই শুনবেন তাহলে?"

—"নিশ্চয় শুনব। আলবত শুনব! না শুনে আপনাকে ছাড়ব না। এমন খাসা তেতালার চারিদিক-খোলা ঘর, কেন এখানে কেউ থাকত না?"

ননী কন্ঠস্বর নামিয়ে, অদ্বিতীয় চক্ষুটিকে প্রাণপণে বিস্ফারিত ক'রে বললে, "আজ্ঞে, তেতালায় যে একজন আছেন!"

অটল চায়ের পেয়ালা নামিয়ে এতক্ষণ পরে বললে, "একজন আছেন মানে?"

পটল বললে, "কে বলে একজন? আমরা হচ্ছি তিনজন।"

নকুল বললে, "হ্যাঁ, তিনখানা ঘরে আছি আমরা তিনজন।"

ননী হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "ভালো কাজ করেন নি।"

মালিক খাপ্পা হয়ে বললেন, "এ-সব কথার মানে? আপনি কি আমার মেসের লোক ভাঙাতে এসেছেন?"

—"তাতে আমার লাভ?"

—"তবে এত বাজে বকছেন কেন?"

—"বেশ মশাই, আমি আর কিছু বলতে চাই না। একতলার কোন ঘর যদি খালি থাকে তো বলুন। না থাকে, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে ধুলো-পায়েই প্রস্থান করব।"

—"একতলার তিনখানা ঘর খালি আছে, আপনি যেখানা খুশি নিতে পারেন"

অটল বললে, "কিন্তু মহাশয়, আপনি আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করেছেন।

আমাদের কৌতূহল আবার যতক্ষণ না নিদ্রিত হয়, ততক্ষণ আপনাকে এইখানেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে।"

পটল বললে, তেতালা আপাতত আমাদের অধিকারে। সুতরাং আসল কথা জানবার অধিকার আমাদের আছে।"

নকুল মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "তেতালায় একজন আছেন মানে কি?"

ননী একখানা 'মোড়া' টেনে নিয়ে বসে পড়ে নাচার ভাবে বললে, "তবে সব কথাই শুনুন মশাই। এই মেস-বাড়ির তেতালায় বাস করেন গদাধর গাঙুলী।"

মালিক বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "আপনি কি পাগল?"

অটলও বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "গদাধর গাঙুলী। তিনি থাকেন তেতালায়, অথচ আমরা কেউ জানি না! আমাদের তিন-জোড়া চোখ কি অন্ধ?"

ননী বললে, "লক্ষজোড়া চর্মচক্ষু থাকলেও গদাধর গাঙুলীকে দেখা যায় না। তিনি অশরীরী।"

পটল ও নকুল চম্‌কে উঠে বললে, "কি বললেন?"

—"তিনি অশরীরী। আহা, একদা তিনিও শরীরী ছিলেন। তিন বছর আগে আমি যখন এই মেসে ছিলুম, তার কিছু আগেই তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন।"

অটল, পটল ও নকুলের দেহ রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

মালিক হতভম্বের মত কেবল বললে, "মানে?"

ননী বললে, "মানে হচ্ছে এই। আমি এই মেসে আসবার কিছুকাল আগে তেতালার একটি ঘরে দাঁড়িয়ে বা ব'সে বা শুয়ে গদাধর গাঙুলী নামে একটি ভদ্রলোক আফিম খেয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন।"

মালিক বললেন, "এতক্ষণ পরে তবু কিছু হদিশ পাওয়া গেল। তারপর?"

—"তারপর কিন্তু দেহত্যাগ ক'রেও গদাধরবাবু এই মেসের তেতালার ঘরের মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি। অনেকেই তাঁকে তেতলার ছাদে বেড়িয়ে বেড়াতে দেখেছে—এমন কি তাঁর শখের গান গাইতেও শুনেছে।"

—"শখের গান?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমিও দোতালা থেকে তাঁর শখের গানটি শুনেছি।

—"সেই শখের গানটি কি?"

ননী সুরে বললে—

"বাজে তালি, বাজে ধামা।
ওরে যদু! আরে মধু!
শোন্‌ গাই সা-রে-গা-মা!

ধেড়ে-কেটে, তেড়ে-কেটে—লেগে যায় তাক্!
মোর গীতে ভেঙে যায় দুনিয়ার জাঁক!
দীপকের তা-না-না-না,
শুনে যাও মামী-মামা!
গিটকিরি শুনে ডেকে ওড়ে কাক-চিল,
উৎসাহে নিধু মারে যাকে-তাকে কিল।
ছোটে গাধা, ছোটে ধোপা,
ছোটে খোকা দিয়ে হামা।"

মালিক অভিভূতের মতন বললেন, "আহা, কী গান! শুনলে অশ্রুবর্ষণ করা অনিবার্য।"

অটল করুণভাবে বললে, "নিশ্চয়। আমারও পাষণ্ড চক্ষু সজল হবার চেষ্টা করছে। কারণ আমি ঐ তেতালাতেই থাকি।"

পটল সায় দিয়ে বললে, "আমারও ঐ অবস্থা—যদিও এখনো গদাধরবাবুর নিজের মুখের গান শোনবার সৌভাগ্য হয় নি।"

নকুল ম্রিয়মান ভাবে বললে, "বোধ হয় তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমরা রাত দশটা বাজবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি।"

ননী বললে, "ঠিক আন্দাজ করেছেন! যাঁরা পৃথিবীর দেহ ত্যাগ করেও পৃথিবীতে বাস করেন, রাত বারোটা বাজবার আগে তাঁদের দেখা পাওয়া অসম্ভব।"

অটল বললে, "তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি কিছুমাত্র ব্যাকুল নই।"

ননী বললে, "ব্যাকুল না হ'তে পারেন, কিন্তু আমি শুনেছি গদাধরবাবু প্রতি বৎসরে একদিন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে জোর ক'রে আলাপ করবার চেষ্টা করেন। সেদিন নাকি ইচ্ছা করলেই সবাই তাঁকে দেখতে পায়!"

মালিক বললেন, "মানে?"

—"গদাধরবাবু প্রতি বৎসরে একরাত্রে তাঁর বাৎসরিক কর্তব্যপালন করতে আসেন।"

—"মানে?"

—"যে তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, প্রতি বৎসরে ঠিক সেই তারিখেই গদাধরবাবু আবার চর্মচক্ষুগোচর দেহ ধারণ করেন। আবার আফিম খান। আবার আর্তনাদ করেন। এবং তারপর আবার ম'রেও মারা পড়েন।"

মালিক বললেন, "রাত বারোটার পরে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"রাত বারোটার পরে কলকাতার কোন আফিমের দোকান খোলা থাকে না।"

—"মশাই, এ সব হচ্ছে পরলোকের কথা। পরলোকে কোন্ দোকান কখন বন্ধ হয়, আমি তা কেমন ক'রে বলব? ইহলোকের সমস্ত নখদর্পণে—কোন্ পাড়ায় ক'টা গাঁজা-আফিমের দোকান আছে তাও ব'লে দিতে পারি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরলোক সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই।"

মালিক ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "এই-সব গাঁজাখুরি গল্প ব'লে আপনি কি আমার মেস-বাড়ির দরজা বন্ধ করতে এসেছেন?"

ননীও ক্রুদ্ধ কন্ঠে বললে, "গাঁজা? আমি ভদ্রলোক। গাঁজার দোকানের ঠিকানা জানি বটে, কিন্তু গাঁজা কাকে বলে জানি না। আমি এসেছি মেসের একখানি ঘর নিতে। একতালায় একখানি ঘর পেলেই আমি খুশি হব।"

মালিক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন। কিন্তু আপনাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি আগাম টাকা চাই।"

ননী বললে, "তাই নিন্ না। এ-বাড়ির তেতালার ঘর ছাড়া আর সব ঘরেই যেতে আমি প্রস্তুত। বিশেষ আজকের রাত্রে।"

মালিক বললেন, "আজকের রাত্রে? মানে?"

ননী বললে, "গদাধরবাবু মরদেহ ত্যাগ করেন নাকি কার্তিক পুজোর রাত্রে। তিনি বাৎসরিক ব্রত পালন—অর্থাৎ আবার আফিম খেয়ে দেহত্যাগ করতে আসেন ঠিক সেই রাত্রেই। এটা তাঁর কি খেয়াল জানি না, কিন্তু শুনেছি, কার্তিক-পুজোর রাত্রে তিনি আবার একবার দেহত্যাগ করবার অভিনয় না ক'রে থাকতে পারেন না। অনেকটা সাপের খোলস ত্যাগের মতনই আর কি। চলুন মশাই, এ-সব বাজে কথা থাক। একতালায় আমাকে একখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসবেন চলুন।"

ননীকে নিয়ে মালিক প্রস্থান করলেন।

অটল কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে শীষ দিতে দিতে হঠাৎ থেমে বললে, "আজই কার্তিক-পুজো।"

পটল দুঃস্বপ্নাভিভূতের মতন বললে, "কিন্তু গদাধরবাবু যে কোন্ ঘরে দাঁড়িয়ে বা ব'সে বা শুয়ে আফিম খেয়ে তাঁর বাৎসরিক ব্রত পালন করেন, সে কথা তো জিজ্ঞাসা করা হ'ল না।"

অশ্রুভারাক্রান্ত কন্ঠে নকুল বললে, "জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। যতটুকু শুনেছি, তাই-ই যথেষ্ট। আজ যদি সৌভাগ্যক্রমে গদাধরবাবুর সঙ্গে দেখা না হয়, তাহলে কালকেই এ বাসাকে নমস্কার ক'রে সরে পড়ব।"

অটল ও পটল একসঙ্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞের মতন বললে, "হ্যাঁ।"

সে-রাত্রে অটল, পটল ও নকুল এক-একখানা ঘরে একলা থাকা যুক্তিসংগত বা নিরাপদ ব'লে মনে করলে না। পটল ও নকুল আপন আপন ঘর ত্যাগ ক'রে এসে অটলের বিছানার ডান ও বাম পাশে নিজেদের বিছানা পেতে নিলে!

গদাধরবাবুকে বাধা দেবার জন্যে অটল ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দিতে লাগল।

পটল বললে,"অটল, ননীর কাহিনী বিশ্বাস করলে বলতে হয়, গদাধরবাবু হচ্ছেন সূক্ষ্মদেহধারী। সূক্ষ্মদেহের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, ইট-কাঠ-পাথরও ভেদ ক'রে আনাগোনা করা যায়।"

নকুল বললে, "পটল, স্তব্ধ হও। সাবধানের মার নেই।"

নিজের বিছানার উপরে এসে ব'সে অটল বললে, "ঘড়িতে দেখছি রাত দশটা বাজে। ঘুমোবার সময় হ'ল। কিন্তু আজ আমরা কি করব? ঘুমবো? না গদাধরের আগমন-প্রতীক্ষা করব?"

নকুল হাই তুলে বললে, "রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব! মারাত্মক বললেও চলে।"

পটল লেপের ভিতরে ঢুকতে-ঢুকতে বললে, "আমারও ঐ মত। গদাধরবাবুর বাৎসরিক অভিনয় দেখবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি ঘুমিয়ে তাঁকে ফাঁকি দিতে চাই।"

অটল বললে, "আমার বিশ্বাস, গদাধরবাবুর কথা হচ্ছে রীতিমত উপকথা। উপদেবতার কথা মাত্রই উপকথা। সুতরাং অকারণে জেগে থেকে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। আলো নেবাও—ঘুমিয়ে পড়।"

মিনিট-পাঁচেক পরেই তিনটি তন্দ্রা-পুলকিত নাসা-যন্ত্রের প্রচণ্ড ঘড়র্-ঘড়র্-মন্ত্রে একান্ত সন্ত্রস্ত হয়ে দেওয়াল-বাসী টিকটিকিরা পর্যন্ত 'ভেন্টি-লেটারে'র ভিতর দিয়ে বাইরে পলায়ন ক'রে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারা এতদিন একা অটলের নাসিকা-ধ্বনিকে কোনক্রমে সহ্য ক'রে ছিল। কিন্তু একসঙ্গে অটল-পটল-নকুলের তর্জনগর্জনময় নাসা-ভাসা! এ হচ্ছে দস্তুরমত মেছো-হাটার কোলাহল! যে-কোন জীবের পক্ষেই সহ্য করা অসম্ভব।

কার্তিক মাসের শেষ-তারিখের ভিজে হিমেল-হাওয়া। কন্‌কন্‌ কন্‌কন্‌! অটলের ঘুম গেল ছুটে। ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে সে ব'লে উঠল, "ওরে বাপ্ রে বাপ্! কী ঠান্ডা!"

সব-চেয়ে-বেশী শীত-কাতুরে নকুল এর আগেই জেগে উঠেছিল। সে লেপের মাঝখানে ঢুকে গিয়ে ঘুম-জড়ানো স্বরে বললে, "আমার মনে হচ্ছে, আমি

'এভারেস্টে'র সর্বোচ্চ শিখরের উপরে আরোহণ ক'রে আছাড় খেয়েছি।"

পটল বাক্যব্যয় করলে না। এপাশ থেকে ওপাশে ফিরে শুলো।

অটল বললে,—বিস্মিত, হতভম্ব স্বরেই বললে, "কিন্তু হাওয়া আসে কোত্থেকে? আমি নিজের হাতেই সব জানলা বন্ধ ক'রে দিয়েছি!"

নকুল একটিমাত্র চক্ষু উন্মোচন ক'রে বললে, "সার্সিহীন পুরনো জানলা, আল্‌গা ছিটকিনি—হয়তো জোর-হাওয়া লাগলেই খুলে যায়।"

—"হ'তে পারে। কিন্তু এর আগে ঐ উত্তুরে জানলাটা এমন অসময়ে আর কখনো খুলে যায় নি"—এমনি গজ্ গজ্ করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে অটল সশব্দে আবার জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

তারপর পুনর্বার ত্রিনাসিকা মুখর হয়ে উঠল—এবং খানিক পরে আবার ভালো ক'রে ঘুমোতে না ঘুমোতেই ভেঙে গেল তাদের ঘুম। সেই ঠান্ডা হাড়-কাঁপানো বাতাস! উত্তরের জানলাটা আবার খুলে গিয়েছে।

অটল চিন্তিত ভাবে বললে, "ব্যাপারটা ভালো ব'লে বোধ হচ্ছে না।"

পটল বললে, "রীতিমত সন্দেহজনক! জানলার এমন ব্যবহারের কল্পনা করা যায় না।—নকুল, উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এস তো?"

নকুল দৃঢ় কন্ঠে বললে, "লেপের বাইরে যাবার ইচ্ছে আমার নেই।"

অটল বললে, "নকুল, তুমি দেখছি মহা কাপুরুষ! একটা জানলা বন্ধ করবার সাহসও তোমার নেই? রাবিস!" সে শয্যাত্যাগ করবার উপক্রম করছে, এমন সময়ে গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে রাত বারোটা বাজল।

নকুল শীতার্ত কন্ঠে বললে, "বারোটা!"

পটল ম্রিয়মান স্বরে বললে, "প্রেত-নগরের সিংহদ্বার এইবারে খুলে গেল।"

অটল জানলা বন্ধ করবার জন্যে আর শয্যাত্যাগ করবার চেষ্টা করলে না। ঝাঁ-ঝাঁ রাতে ডাকছে খালি ঝিঁঝি পোকারা। শহরের আর সব শব্দই যেন ভয়ে চুপ মেরে গিয়েছে। কিন্তু নীরবতার বক্ষ ভেদ ক'রে একটা সুর শোনা যাচ্ছে না?

সুরটা আরো একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল। কে যেন বাইরে ছাদের কোণ থেকে গুন-গুন ক'রে গাইছে—

"বাজে তালি, বাজে ধামা!
ওরে যদু! আরে মধু!
শোন্ গাই সা-রে-গা-মা!"

অটল আড়ষ্ট ভাবে বললে, "ইস্, এযে গদাধরবাবুর গান!"

পটল বললে, "নকুল, ভাই আমার! চটপট জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এস তো।"

নকুল বললে, "পাগল! গদাধরবাবু এসে আমাকে টানাটানি করলেও আমি আর লেপের ভেতর থেকে বেরুব না।"

গান থামল। ছাদের উপরে শোনা গেল কার পায়ের শব্দ।

অটল ক্ষীণ স্বরে বললে, "আমার মনে হচ্ছে, গদাধরবাবু এই ঘরে এসেই আফিম খেতে চান।"

পটল আর নকুল একেবারে বোবা হয়ে গেল,—বোধ হয় তারা ভাবলে, বোবার শত্রু নেই।

পায়ের শব্দ থেমে গেল। খানিকক্ষণ সব নিঃসাড়। তার পরই একটা নতুন-রকম ভয়াবহ শব্দ—ঠক্, ঠক্, ঠক্! শব্দ হচ্ছে ঘরের ভিতরেই—পূর্বদিকে! এ যেন মাংসহীন অস্থিসার পায়ের শব্দ!

অটলের মাথার চুলগুলো তখন খাড়া হয়ে উঠেছে এবং দেহ হয়েছে অসম্ভবরকম রোমাঞ্চিত। তবু সে বালিশের তলা থেকে দেশলাই বার ক'রে ফস্ ক'রে একটা কাঠি না জেবলে থাকতে পারলে না।

ঘরের কোথাও কেউ নেই। পটল আর নকুল দুজনেই লেপের তলায় অদৃশ্য।

দেশলাইয়ের কাঠি নিবে গেল। তারপর আবার ঘরের ভিতরে শব্দ হ'ল ঠক্, ঠক্, ঠক্! ঠক্ ঠকাঠক্, ঠকাঠক্, ঠকাঠক্!

শীতেও ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে অটল ভাবতে লাগল, অতঃপর কি করা উচিত?— হঠাৎ তার মনে পড়ল প্রেততত্ত্ববিদ্‌দের কথা। প্রেতেরা নাকি প্রায়ই শব্দের সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করে। গদাধরবাবুও কি শব্দ ক'রে কোন কথা বলতে চাইছেন?

অত্যন্ত কষ্টে সাহস সঞ্চয় ক'রে অটল বললে, "এ-ঘরে যদি কেউ এসে থাকেন, তাহলে দয়া ক'রে শুনুন। আমি প্রশ্ন করি, আপনি উত্তর দিন। আমার প্রশ্নের উত্তরে একবার শব্দ হ'লে বুঝব— 'হ্যাঁ', আর দুবার শব্দ হ'লে বুঝব—'না'।"

ঠক্, ঠক্, ঠক্, ঠক্, ঠক্, ঠক্!

—"মশাই, অত-বেশী শব্দ ক'রে ভয় দেখালে মারা পড়ব! শুনুন। আপনি কি গদাধরবাবু?"

একবার শব্দ হ'ল—ঠক্! অর্থাৎ—'হ্যাঁ'।

—"আপনি কি বেঁচে আছেন?"

দুবার শব্দ হ'ল—ঠক্, ঠক্! অর্থাৎ—'না'।

দুই হাতে চেপে নিজের হৃদকম্প থামাবার চেষ্টা ক'রে অটল বললে, "আপনি কি এখানে আফিম খেতে এসেছেন?"

—ঠক্। 'হ্যাঁ'।

—"আপনি কি আজ আফিম না খেয়ে থাকতে পারবেন না?"

—ঠক্, ঠক্। 'না'।

—"আমরা এখানে থাকলে আপনি কি রাগ করবেন?"

—ঠক্। 'হ্যাঁ'।

—"আপনি নিশ্চয় আমাদের আক্রমণ করতে চান না?"

—ঠক্। 'হ্যাঁ'।

পরমুহূর্তেই অটলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতা-পা-ওয়ালা মস্ত একটা দেহ। অটল বিছানা থেকে ছিটকে মেঝেয় গিয়ে প'ড়ে হাঁউ-মাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল! এবং তার পর-মুহূর্তেই পটল বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাপ্‌রে, গদাধর আমার ঘাড়ে চেপেছে রে!"

তারপরেই দড়াম ক'রে খুলে গেল ঘরের দরজা এবং সেই অবস্থাতেই অটল বেশ বুঝতে পারলে যে, পটল ও নকুল চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দুম-দাম শব্দে ছাদের উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সেও তৎক্ষণাৎ গদাধরবাবুকে ফাঁকি দিয়ে শুয়ে-শুয়েই সরীসৃপের মতন সড়াৎ ক'রে দরজার কাছে স'রে গেল, তারপর উঠেই বাইরের ছাদের দিকে মারলে এক লম্বা লাফ!

অটল, পটল আর নকুল হুড়মুড় ক'রে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বারান্দার উপর নেমে দেখলে, এত রাতে সাত-পাড়া কাঁপানো গোলমাল শুনে মেসের সমস্ত লোক এসে জড়ো হয়েছে। সকলেরই ব্যস্ত কন্ঠে একই জিজ্ঞাসা—ব্যাপার কি, ব্যাপার কি?

বারান্দার উপরে তিনজোড়া পা ছড়িয়ে ব'সে প'ড়ে তিন মূর্তি হাঁপাতে লাগল তিনটে হাপরের মত। মেসের মালিক শুধোলেন, "ও অটলবাবু, কী হয়েছে বলুন না!"

অটল বাধো-বাধো গলায় বললে, "গদাধরবাবু আমার ওপরে লাফিয়ে পড়েছিলেন।"

পটল বললে, "না অটল। ভয়ের চোটে তোমার ওপরে ঝাঁপ খেয়েছিলুম আমিই। আর গদাধরবাবু লাফ মেরেছিলেন আমার পিঠের ওপরেই। আমার প্রতি তাঁর এই অন্যায় পক্ষপাতিতার মানে হয় না।"

নকুল বললে, "না পটল। পালাতে গিয়ে তোমার ওপরে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলুম আমিই। অন্ধকারে তুমি বুঝতে পারোনি।"

মালিক আশ্বাস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হা-হা ক'রে হেসে বললেন, "এরই নাম রজ্জুতে সর্পভ্রম! গদাধরবাবু হচ্ছেন গাঁজাখুরি গল্পের নায়ক। যান মশাই, যে-যার ঘরে যান। মিথ্যেই আমাদের ঘুম ভাঙালেন।"

অটল প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললে, "ঝাপ করতে হ'ল মশাই! কে ঘরে যাবে?" সেখানে গদাধরবাবু এতক্ষণে হয়তো আফিম গুলতে শুরু করেছেন।"

মালিক বিপুল বিস্ময়ে বললেন, "মানে?"

অটল বললে, "হ'তে পারে দুরাত্মা পটল নির্বোধের মতন আমার ওপরে ঝাঁপ খেয়েছিল, কিন্তু—"

পটল বললে, "হ'তে পারে কাপুরুষ নকুল ভয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আমার ওপরে হোঁচট খেয়েছিল, কিন্তু—"

নকুল বললে, "কিন্তু আমাদের এই ভ্রমের দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তেতালায় গদাধরবাবু নেই। কারণ আমরা সবাই স্বকর্ণে তাঁর মার্কা-মারা গান, তাঁর পায়ের শব্দ আর ঠক্ ঠক্ ভাষায় তাঁর কথা শুনেছি।"

মালিক মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "তাইতো, শুনেছেন নাকি?"

অটল বললে, "নিশ্চয়! শুনেছি ব'লেই তো ভয় পেয়েছি।"

মেসের আর কেউ ননীর গল্প শোনেনি। সকলের কণ্ঠে একই প্রশ্ন জাগল—গদাধরবাবু কে?

মালিকের ইচ্ছা নয় যে, গদাধরবাবুর কাহিনী আর কারুর কর্ণগোচর হয়। সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "গদাধরবাবু হচ্ছেন আমার পিসেমশাই, তাঁকে নিয়ে আপনাদের কারুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অটলবাবু, পটলবাবু, নকুলবাবু! আপনারা আমার ঘরেই আসুন। পিসেমশাই এত রাতে আপনাদের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন ব'লে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আফিমের মৌতাত মাথায় চড়লে পিসেমশাইয়ের আর কোন জ্ঞান থাকে না,—আরে ছোঃ!"

সকালের আলো দেখে তাদের পলাতক সাহস আবার প্রত্যাগমন করলে। মেসের মালিককে নিয়ে অটল নিজের ঘরে এসে ঢুকল, পটল এবং নকুলও গেল নিজের নিজের ঘরে! বলা বাহুল্য, বাৎসরিক ব্রত পালন ক'রে গদাধরও তখন অদৃশ্য হয়েছেন।

অটল কৌতূহলী ভাবে ঘরের এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে, এমন সময়ে পটল ঝড়ের মতন ছুটে এসে বললে, "সর্বনাশ হয়েছে! আমার দরজার তালা ভাঙা! ট্রাঙ্কের তালা ভাঙা! আমার দশখানা দশ টাকার নোট চুরি গিয়েছে!"

তারপরে—প্রায় তার পিছনে-পিছনেই ছুটে এসে নকুলও সমাচার দিলে, তার বাক্সের ভিতর থেকে উধাও হয়েছে একশো পনরো টাকা আট আনা।

অটল চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বিছানার উপরে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল। তার চাবির তোড়া থাকত মাথার বালিশের নিচে। বালিশ তুলে দেখা গেল, চাবি নেই— কিন্তু একখানা চিঠি আছে।

চিঠিখানা এই ঃ

অটল-পটল-নকুলবাবু,—

কাল সকালে গদাধর-কাহিনী ব'লে আমি বেশ একটি ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছিলুম—নয়? তারপর সেই আবহ রাত্রে ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছিল দুই-দুইবার খোলা জানলা দেখে,—কি বলেন?

কিন্তু একটু কম-ভীতু হ'লে আপনারা অনায়াসেই অনুমান করতে পারতেন যে. বাহির থেকে অনায়াসেই খড়খড়ির পাখি তুলে হাত দিয়ে ছিটকিনি সরিয়ে জানলা খোলা যায়।

এ-ঘরের 'ভেন্টিলেটারে'র ছ্যাঁদা বড় হওয়াতে আমার ভারি সুবিধা হয়েছে। ঐ পূর্বদিকের মাঝের জানলার উপরকার 'ভেন্টিলেটারে'র ফাঁক দিয়ে 'টোন'-সুতোর ডগায় একখণ্ড নুড়ি বেঁধে বাহির থেকে আমি ঘরের ভিতরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলুম, আর সুতোর অন্য প্রান্ত ছিল আমার হাতে। এই হচ্ছে ঠক্-ঠক্ আওয়াজের গুপ্ত কারণ! বাহির থেকে কান পেতে আমিই সুতোয় টান মেরে অটলবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

গদাধরবাবুর গানটি এই অধীনেরই রচনা। ওটি কোন মাসিকপত্রে ছাপিয়ে দিতে পারবেন?

আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের তেতালা থেকে তাড়ানো। কেন, তা বলা বাহুল্য।

আর বোধ হয় মহাশয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না—বিদায়।

ইতি—

আপনাদের শ্রীননী

উল্টো বুঝলি রাম

সুবিনয় রায়

জমিদারমশাই কানে একটু খাটো, কিন্তু লোকটি চমৎকার! যেমন বিনয়ী, তেমনি দয়ালু। নামটি বিপুলবপু বসু চৌধুরী; চেহারাখানিও নামের অনুরূপ। কেন যে তাঁর এ নাম রাখা হ'লো তা' কেউই নাকি বলতে পারে না। ছেলেবেলায়, অর্থাৎ যখন তাঁর নামকরণ হয়, তখন নাকি তিনি টিংটিংএ রোগা ছিলেন। যাক গিয়ে সে কথা!

তাঁর জমিদারীর এলাকার মধ্যেই থাকতেন পণ্ডিত বিশ্ববিজয় বিদ্যাবাগীশ, তর্কপঞ্চানন, সাহিত্যবারিধি, ন্যায়লঙ্কার, জ্ঞানপ্রভাকর, তত্ত্বমহাম্বুধি। নাম শুনেই মনে হয় হামবড়া গোছের লোক; উপাধির চোটে অহঙ্কারে মাটিতে আর পা পড়ে না। কিন্তু, ঠিক তার উল্টো। তাঁর যে অতগুলো উপাধি আছে তা' দু'একটি নিতান্ত বন্ধুলোক ছাড়া আর কেউই জানে না। আর উপাধির জন্য তিনি নিজে একটুও মাথা ঘামান নি; বড় বড় টোল এবং পণ্ডিতসভা সেধে তাঁকে উপাধি দিয়েছে।

অমায়িক, নিরীহ লোক, নিতান্তই ভালমানুষ। দিনরাত পুঁথিপত্র নিয়েই আছেন। নিজের হাতেই রাঁধেন; জীবনে কখনও মাছ-মাংস ছোঁন নি। নিজের পড়াশুনা আর শাস্ত্রচর্চায় তিনি এত ব্যস্ত থাকেন যে, কার'ও সঙ্গে বড় একটা মিশবার সময় পান না। দু' চারজন সমজদার লোক তাঁকে খুঁজে বের ক'রে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করেন। সাধারণ লোকে গিয়েই বা করবে কি? দিনরাত শাস্ত্র পুঁথি ঘেঁটে ঘেঁটে তাঁর কথাও হয়ে গেছে অনেকটা ন্যায়শাস্ত্রের ছাপা কথার মতই। অনেক চেষ্টা ক'রে সহজ ভাষায় কথা বলতে বলতে এমন সব দাঁতভাঙা কথা ব্যবহার করবেন যে শুনে থ' হয়ে যেতে হবে।

এই তো সেদিন রামবাবু গেছিলেন বৃষ্টিতে ভিজে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। দেখা হতেই তিনি রামবাবুকে বললেন, "প্রাবৃট্ বুঝি আপনার মনঃ-সংহর্ষিনী?" রামবাবু ভাল ক'রে না বুঝতে পেরে, হাত জোড় ক'রে এমন ভাবে মাথা নাড়লেন যা'তে 'হাঁ'ও বোঝায়, 'না'ও বোঝায়। তারপর ব্যস্ত হয়ে পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "জলৌকাক্রান্ত হয়েছেন কি?" রামবাবু এবারও মাথা নেড়ে হাঁ-নার মাঝামাঝি উত্তর দিলেন। তা'তে পণ্ডিতমশাই আরো ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কায়ক্লেশানুভবানভিজ্ঞের ঈদৃশ দিনে জলৌকাশঙ্কুল পথ অতিক্রমণ অসমসাহসিকতা। অচিরাৎ ক্লেশোপশমের ব্যবস্থাই বিধেয়।"

এবার রামবাবু একেবারে থতমত খেয়ে, "নমস্কার! আজ তা' হ'লে আসি—" ব'লে দৌড়ে যে পালালেন-তো পালালেনই।

পণ্ডিতমশাই নিজের লেখাপড়া নিয়েই থাকেন; জমিদারমশাইএর সঙ্গে তাঁর বড় একটা সম্পর্ক নাই। জমিদারমশাইএর খাতায় তাঁর নাম লেখা আছে 'শ্রীবিশ্ববিজয় ভট্টাচার্য'; কাজেই জমিদারমশাইও তাঁকে চিনবার বিশেষ সুযোগ পান নি। পণ্ডিতমশাইএর বাড়িও ছিল জমিদার বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে।

কিন্তু, আগুন আর কতক্ষণ ছাই চাপা থাকে? সেদিন রামবাবু তাঁর গুটিকয়েক বন্ধুকে নিয়ে জমিদারমশাইএর বাড়ি গিয়েছেন একটা গানের মজলিশের ব্যবস্থা করতে। সেই মজলিশের নিমন্ত্রণ-পত্রের একটা খসড়া নায়েবমশাইকে করতে দেওয়া হয়েছিল; নায়েবমশাই সেটা লিখে এনেছেন। রামবাবু সেটা হাতে নিয়েই দেখলেন,—উপরে লেখা রয়েছে, "যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ।" অমনি তিনি বলে উঠলেন, "ওরে বাবা! এ যে পণ্ডিতমশাইএর মত ভাষা হয়ে গেল।" সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠতেই জমিদারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বললেন রামবাবু?" তখন রামবাবু পণ্ডিতমশাইএর সেদিনের সব কথা বললেন,—অবিশ্যি, যতটা পারেন।

জমিদারমশাই বললেন, "কিন্তু, পণ্ডিতমশাই যে কে, তা'ই তো বুঝলাম না।" হরিহরবাবু বললেন, "আপনারই প্রজা;—পণ্ডিত বিশ্ববিজয় বিদ্যাবাগীশ তর্কপঞ্চানন, সাহিত্যবারিধি, ন্যায়লঙ্কার;—আরো কত কি!"

জমিদারমশাই বড় বড় চোখ ক'রে শুনছিলেন। কথা শেষ হ'তেই বললেন, "বলেন কি! এমন লোক আমার প্রজা, আর আমি সে কথা মোটেই জানি না! এমন নামও তো শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না;—শুধু মনে পড়ে 'বিশ্ববিজয়' নামটি যেন দেখেছি—দেখেছি।"

নায়েবমশাই বললেন, "আজ্ঞে, আমাদের সেরেস্তায় তাঁর নাম 'শ্রীবিশ্ববিজয় ভট্টাচার্য' লেখা আছে।"

জমিদারমশাই বললেন, "আনুন খাতা! এই মুহূর্তে ওটা সংশোধন করা উচিত। ওঁর পুরো নাম, উপাধি সবই খাতায় লিখে রাখুন। আর দেখুন, কালই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। ছি, ছি, ছি! কি অন্যায় কাজটাই হয়েছে! এমন গুণী লোকের উচিত আদর এতকাল হয় নি?"

সকালে কানাকানি করতে লাগল; "জমিদারমশাই না গেলেই ভাল হয়। একে তো উনি কানে খাটো, তার উপর পণ্ডিতমশাইএর দাঁতভাঙ্গা সব কথা— শেষটায় হয়তো কিছুই বুঝতে পারবেন না;—নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করে চলে আসবেন। অনেকটা রামবাবুর দশা হবে শেষটায়।"

ব্যোমকেশবাবু বললেন, "তা' কেন হবে? পণ্ডিতমশাইও তো বুদ্ধিমান লোক। তিনি অমনটা হ'তে দেবেন কেন?"

হরিহরবাবু বললেন, "আপনিও যেমন। জমিদারমশাইএর চেহারা দেখেই কি বুঝতে পারা যাবে উনি কানে খাটো? আমরা না হয় জানি।"

ব্যোমকেশবাবু বললেন, "আহা! কি আপদ! দু' চারটা কথা বললেও কি বুঝবেন না? পণ্ডিতমশাই তো আর রাগী লোক নন যে, পান থেকে চুনটি খসালেই একেবারে সপ্তমে চড়বেন?"

সকলেই তখন বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা' তো ঠিকই বটে!" নায়েবমশাই বললেন, "আপনাদের যত সব বাজে কথা! গেলে আর এমন কি ঘটতে পারে!"

পরদিন সকালেই জমিদারমশাই জুড়িগাড়ী চ'ড়ে, নায়েবমশাইকে সঙ্গে নিয়ে, পণ্ডিতমশাইএর বাড়ির দিকে রওয়ানা হ'লেন। হরিহরবাবু, ব্যোমকেশ-বাবু, রামবাবু, এ'রা সব অনেক আগেই রওয়ানা হয়ে গিয়ে পণ্ডিতমশাইএর বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছেন।

যথাসময়ে গাড়ি পণ্ডিতমশাইএর বাড়ির দরজায় হাজির হ'লো এবং জমিদার মশাই নায়েবমশাইকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে গেলেন।

পণ্ডিতমশাই আগেই লক্ষ্য করেছিলেন গাড়ি থেকে একজন সম্ভ্রান্ত লোক নামছেন, তাই তিনি এগিয়ে এসে "স্বাগতম্" ব'লে জমিদার-মশাইকে ডেকে নিয়ে গেলেন। বাইরে থেকে রামবাবুরা উঁকি-ঝুঁকি মেরে ব্যাপার দেখতে লাগলেন; কথাবার্তা কিছু শুনবার উপায় ছিল না।

প্রথমেই পণ্ডিতমশাই মুচকি হেসে কি-যেন জিজ্ঞাসা করলেন; জমিদার-মশাই হাতজোড় ক'রে অমায়িকভাবে কি যেন উত্তর দিলেন।

আবার পণ্ডিতমশাই মুচকি হেসে কি যেন বললেন। এবার জমিদারমশাই হঠাৎ যেন একটু ঘাবড়ে গিয়ে, অমায়িকভাবেই উত্তর দিলেন। নায়েবমশাই পিছনে বসেছিলেন, তাঁর মুখ একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

তৃতীয় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করাতেই জমিদারমশাই কাঁচুমাচু হয়ে, ক্ষমা প্রার্থনার ভাবে উত্তর দিলেন। পণ্ডিতমশাই যেন বিরক্ত হয়েই ভ্রূকুটি করলেন। নায়েব-মশাই এবার আড়ালে জিভ কেটে গালে হাত দিলেন।

চতুর্থ প্রশ্নটিতে জমিদারমশাই আরো কাঁচুমাচু হয়ে গেলেন। উত্তরটি শুনে পণ্ডিতমশাইও যেন আরো বিরক্ত হয়ে গেলেন। নায়েবমশাই এবার আরো লম্বা জিভ কাটলেন—যেন, কি কাণ্ডটাই হ'লো!

পঞ্চম প্রশ্নটি করার সময়ই পণ্ডিতমশাই ভ্রূকুটি করেছিলেন। উত্তর শুনে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন!

ব্যাপার দেখে জমিদারমশাই ঘাবড়ে গিয়ে ঐ বিপুল শরীর নিয়েই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে, পণ্ডিতমশাইকে তাড়াতাড়ি এক নমস্কার ঠুকে, সটান বেরিয়ে এসে একেবারে গাড়িতে উঠলেন। কোচ্ম্যানও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি হাঁকিয়ে রওনা হলো। জমিদারমশাইএর কপাল থেকে ঘাম ঝরছে; মুখ, কান লাল হয়ে গেছে।

রামবাবুরা থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, ব্যাপারখানা কিছু বুঝতে পারলেন না। একবার মনে করলেন, তখনই গিয়ে নায়েবমশাইএর কাছে সব ঘটনাটা ভাল ক'রে জানবেন; আবার মনে করলেন, নায়েবমশাইও হয়তো এই ব্যাপারে খুবই মর্মাহত হয়ে থাকবেন। একটু সুস্থ হ'লে গিয়ে জিজ্ঞাসা করাই ভাল।

সন্ধ্যার পর রামবাবুরা নায়েবমশাইএর কাছে গেলেন। জমিদারমশাই সেদিন আর নিচে নামেন নি; নায়েবমশাই একাই ব'সে গম্ভীর হয়ে গালে হাত দিয়ে কি যেন চিন্তা করছেন।

রামবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি বলুন তো নায়েবমশাই? আমরা বাইরে থেকে দেখছিলাম; কথাবার্তা তো কিছু শুনতে পাই নি, মুখের হাব-ভাব দেখে তো কিছুই বুঝলাম না কি ব্যাপার ঘটেছে। কেনই বা পণ্ডিতমশাই চটলেন; কেনই বা জমিদারমশাই পালালেন—সবই যে আমাদের কাছে হেঁয়ালি।"

নায়েবমশাই বললেন. "আমি আগেই বলেছিলাম ওখানে গেলে একটা বিভ্রাট ঘটবে। একজন হলেন মহা-পণ্ডিত, কেতাবী ভাষা ছাড়া কথাই বলতে পারেন না; আরেকজন হলেন সাদাসিধে. সামান্য লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক, তার উপর আবার কানে খাটো। দু'জনে জন্মে কখনো দেখাশুনা হয় নি;—কথা নেই, বার্তা নেই, একেবারে সামনা-সামনি। না হয় পণ্ডিতমশাইকে একটু জানিয়েই দিতেন, জমিদারমশাই কানে খাটো। ছ্যা, ছ্যা. ছ্যা, কি বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ডটাই হ'লো!"

রামবাবু বললেন, "আপনিও দেখছি হেঁয়ালিই পাকাচ্ছেন। সব ব্যাপারটা খুলেই বলুন না কেন?"

নায়েবমশাই বললেন, "তবে শুনুন ব্যাপারটা!

আমরা গিয়ে বসতেই পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞাসা করলেন. 'কোন্ কার্য-ব্যপদেশে এখানে আগমন?' উত্তর হলো, 'আজ্ঞে, বাপের দেশটা ঠিক এখানে নয়; এখান থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরে হরিনগর পরগণায়।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'আপনার ভুরি প্রশংসা চারিদিকে শুনা যায়।'

জমিদারমশাই বললেন, 'আজ্ঞে, মোটা তো আছিই, ভুঁড়ির প্রশংসা ক'রে আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা মারেন কেন?'

এবার পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মৎ-সকাশে আগমন আমারই সৌভাগ্য।' জমিদারমশাই বললেন, 'মৎস্য! আমি তো জানতাম না আপনি মাছ খান;—জানলে তো বড় বড় মাছ আনতে পারতাম।'

পণ্ডিতমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই অন্যায় অভিযোগের মীমাংসক চাই।' জমিদারমশাই বললেন, 'ও! মাংস খান আপনি। এ সব তো আর জানা ছিল না।'

এ কথায় পণ্ডিতমশাই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনার অজ্ঞতা ডিণ্ডিমের সাহায্যে প্রচার করা উচিত।' জমিদারমশাই বললেন, 'মাছ, মাংস, ডিম সবই তো খান;—তবে আর কি ভাবনা! এবার নেমন্তন্ন খাওয়াবার ভরসা হলো।'

এবারে পণ্ডিতমশাই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে, 'জাল্ম! ক্ষপণক!' ব'লে দাঁড়িয়ে উঠলেন, জমিদারমশাইও বেজায় ঘাবড়িয়ে গিয়ে নমস্কার করে তাড়াতাড়ি স'রে পড়লেন।

এখন ব্যাপারখানা বুঝলেন তো সব? আমি তখনই বলেছিলাম!"

রামবাবুরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন; জবাব আর কিছু খুঁজে পেলেন না।

ভবম হাজাম

জগন্নাথ পণ্ডিত

গল্প শুনবে? আচ্ছা বলছি গল্প, কিন্তু কথাটি বোলো না। ভাল গল্প চাই? তাই বল্‌ছি; তাই হবে, নতুন রকমের গল্প।

এক যে ছিল রাজা। কি বললি, "সে খায় খাজা"? হলো না তো। উঁহুঃ তাও, নয়; "সে খায় গজা" ও ঠিক হয় না। "তাঁর হয় গজা", অর্থাৎ কি না তাঁর মাথায় শিং গজায়।

কি করে গজালো? তা আমি কি জানি। একদিন ভোরে রাজা বিছানায় শুয়ে আছেন এমন সময় রানী হাই তুলতে তুলতে উঠে বসলেন, আর এদিক ওদিক চেয়ে একবার রাজার দিকে তাকিয়েই হুড়মুড় করে, ওরে বাবারে বলে, লাফিয়ে, নিচে, পালঙ্ক ছেড়ে দৌড়।

রাজা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললেন, "কি হোলো, কি হোলো?"

রানী বললেন, "বিছানায় ইঁদুর উঠেছে নিশ্চয়। নইলে তোমার মাথার বালিশ ছিঁড়ে তুলো ছড়ালো কি করে? ইস্‌, তোমার মাথায়ও তুলো ভর্তি।"

সেই শুনে রাজা তাকিয়ে দেখেন, তাই তো, বালিশ কিসে যেন খাব্‌লেছে। মাথায় তুলো লেগেছে শুনে মাথায় হাত দিয়েই রাজা হতভম্ব। হাতে কি যেন ঠেক্‌ছে চুলের ভিতর।

একটু সামলে রাজা রানীকে বললেন, "দাঁড়াও, আমি দেখি ইঁদুর কোথায়। কিন্তু রানীইবা কোথায়? তিনি ততক্ষণে সাত দাসী সঙ্গে নিয়ে গোসলখানায় মুখ হাত ধুতে গেছেন।

রাজা জানলা খুলে ঘরে আলো আনলেন। তার পর ভয়ে ভয়ে আয়নার কাছে গিয়ে চিরুনি দিয়ে চুল সরিয়ে দেখেন যে মাথায় একজোড়া সরেশ কচি পাঁঠার শিং গজিয়েছে।

এ কোন্‌ রাজার কথা? কোথাকার রাজা? আঃ এতো জ্বালালে দেখছি! গল্প চাস্‌ না ভূগোলের পড়া চাস্‌?

শোন্‌ তবে। যমুনাপারি ছাগল দেখেছিস্‌? ঐ টাট্টু ঘোড়ার মত উঁচু, প্রকাণ্ড ছাগল? আচ্ছা, সেই রাজা যমুনাপারের মুল্লুকের রাজা। সে এক ভারি প্রকাণ্ড রাজা।

তাঁর হাতি শালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতি, গোয়ালে ইয়া বড় বড় গোরু বাছুর ষাড় বলদ, আস্তাবলে মস্ত টগাবগ চালের ঘোড়া—কি? ও সব জান, সব রাজারই ও রকম আছে? তাই নাকি, তবে শোন আরো। আর ছিল তাঁর ভাঁড়ার

ভরা এই ধেড়ে ইঁদুর, তাঁর দীঘি পুকুরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কোলা ব্যাং, বাগানে লেজঝোলা হনুমান—ঠিক তোদেরই মত।

আর তার ওপরে হোলো তার মাথায় ঐ ছাগলছানার মত দুটো শিং।

বেচারা রাজার তো চক্ষুস্থির, আয়নায় সেই শিং দেখে। তারপর কত চেষ্টা করলে সেই শিং ভেঙে দিতে, কাটতে। কিছু করা গেল না, মাঝখান থেকে মাথাটা ধরে টানাটানি করে মাথা ধরলো জোর। আর লোকে জানতে পারলে কি হাসাহাসি হবে তাই ভেবে ভেবে মাথা ঘুরে যেতে লাগলো।

সেই দিন থেকে বেচারা রাজার হোলো মহা মুশকিল। পাছে লোক জানাজানি হয়, পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়। শেষে আর কি করেন, মাথার চুল কাটা বন্ধ করলেন আর দিন রাত মাথায় একটা কিছু পরে বেড়াতেন, হয় মুকুট, নয় পাগড়ি, নয় উঁচু টুপি।

চুল তো বড় হয়ে জট পড়তে লাগলো। রানী বলেন, "অত চুল রাখা আবার কি, সন্ন্যাসী হবে না কি?" রাজা কিছুই বলেন না, হাসেন।

কিন্তু চুল আর কত লম্বা রাখা যায়? লোকে কানাঘুষা আরম্ভ করেছে একথা রাজার কানে পৌঁছাল। রাজা তখন আর করেন কি, নাপিত ডেকে একলা বসে চুল কাটালেন। নাপিত চুল কাটতে গিয়ে দেখে অ্যাঁ, একি! রাজার মাথায় ছাগল ছানার মত দুটো শিং। কিন্তু দেখেও সে কিছু বলেনা। রাজাও টের পেলেন না নাপিত বুঝেছে ব্যাপার। কিন্তু বুঝলে হবে কি, চুল কাটা হতেই রাজা হাঁক দিলেন প্রহরীকে। সে আসতেই তাকে বললেন, "এই বেইমানের মাথা নেও, ও আমার গলায় খুর বসাতে চেষ্টা করেছিলো। প্রহরী তো তখনই নাপিতকে ধরে নিয়ে, কচাং করে তার মুণ্ডু কেটে নিলো।

শিং জোড়া বেড়ে চললো, তার আর কোনও উপায় হোলো না কিছু করার। রাজাও মাঝে মাঝে চুল কাটান। কিন্তু যে নাপিত যায় সে আর ফিরে আসে না; রাজা মশাই কোন একটা ছুতো নাতা করে তার মাথাটি উড়িয়ে দেন। কাজেই আর কোন নাপিত আসতে চায় না। রাজার বাড়ি যাওয়ার হুকুম এলেই কোন রকমে খুর-কাঁচি পুঁটলি-পোটলা নিয়ে তারা দেশ ছেড়ে পালায়। শেষে এক ছোকরা নাপিত টাকার লোভে রাজার বাড়ি গেল, নাপিতের নাম ছিল ভবম হাজাম (হিন্দুস্থানি নাপিত কিনা,—তারা নাপিতকে বলে হাজাম)।

ভবম এসে ত বেশ করে রাজার চুল কাটছে, এমন সময় হঠাৎ দেখে কি না রাজার মাথায়—বাপ রে—ইয়া বড় দুই শিং! সে ত তাই দেখে একেবারে হতভম্ব। তারপর সে কোন রকমে রাজার চুল কাটা সারল। কিন্তু বেচারার এই সব দেখে মাথা ঠিক ছিল না, সে রাজার মাথায় টোপর রাখতে ভুলে গেল।

আর যায় কোথায়? রাজা বললেন, "তবে রে বেটা বেয়াদব, আমার মাথায় শিখা রাখিস্ নি যে? এক্ষুণি তোর গর্দান নেব।"

নাপিত ত ভয়ে কাঠ। সে বললে, "দোহাই হুজুর, এটা বড়ই ভুল হয়ে গেছে; তবে টিকি, বিশেষ করে রাজা লোকের টিকি, ও ফের খুব শিগ্গির গজাবে; কিন্তু হুজুর, আমি গরিব মানুষ, আমার মাথা গেলে আর গজাবে না"—কিন্তু সে কথা কে শোনে? তারপর নাপিত অনেক হাতে পায়ে ধরল, শেষে বুঝিয়ে বলল যে তার মাথা কাটা গেলে আর কোন নাপিত কখনো রাজবাড়িতে আসবে না। তখন রাজা আর কি করেন, বললেন, "যা, কিন্তু খবর্দার আমার শিংয়ের কথা কাউকে বলিস্নে, বললেই তোর দফা শেষ করব।"

নাপিত ত উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মেরে পালাল, আর রাজবাড়ির মুখোও হল না।

এখন, নাপিতের পেটে কথা থাকে না। কাজেই এই রাজার শিংয়ের কথাও ভবম নাপিতের পেটে আর থাকতে চায় না। নাপিত প্রাণের দায়ে তাকে জোর জবরদস্তি করে অনেক চেপে রাখ্তে চেষ্টা করল কিন্তু সে কিছুতেই চাপা গেল না, মাঝে থেকে এই ঠেলা-ঠেলির চোটে ভবমের পেটটা ফুলতে লাগল। দিন যায়, নাপিতের পেটও যায় যায়।

সেটা ফুলে ফুলে ঢোল, ক্রমে ঢাকাই-জালা হয়ে উঠল। শেষে নাপিত তার এক নানির (দিদিমা) কাছে গেল। গিয়ে বলল, "নানি, টাকার লোভে এক জায়গায় গিছলাম, সেখানে একটা কথা জেনেছি; এখন তার চোটে মাথা যায় কি পেট যায়।"

নানি বললে, "কি হয়েছে খুলেই বলনা কেন?" ভবম্ বললে, "সে তো বলবার যো নেই—আর না বললেও ত দেখ্ছই কি হচ্ছে!"

নানি তখন তাকে বলে দিল যে, "শহরের মাঝে প্রকাণ্ড বটগাছ আছে, তার কোটরে ঢুকে তোর কথাটা বলে আয়গে।" ভবম তখন গাছের কোটরে ঢুকে চুপে চুপে ব'লে এল "আরে বাস্ রে, রাজার মাথায় এয়া বড় দুই শিং!!" আর অমনি তার পেট ফাঁপাও সেরে গেল।

তারপর একদিন রাজার বাড়ি মহা ধুমধাম। রাজার মেয়ের বিয়ে। অনেক জায়গা থেকে কত ঢাক-ঢোল, কত বাজনা এসেছে। তার মধ্যে ছিল এক ঢোল, সেটা শহরের মাঝের বটগাছের কাঠদিয়ে তৈরি। যখন বিয়ের আসর খুব জমেছে, বরযাত্রী এসে পড়েছে, চারিধারে লোকে লোকারণ্য, তখন সকলে শুনল, রাজার নহবত খানায় শানাই কাসর আর ঢোল মিলে নানান সুরে কি যেন বল্ছে। শানাই তার মিহি সুরে তাল ধরেছে, "রাজাকে দুই শিং, রাজাকে দুই শিং"! কাঁসর অমনি ক্যানক্যান করে বলছে, "কিস্নে কহা? কিস্নে কহা?"

(কে বলেছে কে বলেছে), আর ঢোল গুরু গম্ভীর আওয়াজ করে বল্‌ছে "ভবম হাজাম্‌ নে, ভবম হাজাম নে" (ভবম নাপিত বলেছে)।

আর কোথা যায়। চারিধারে হুলস্থুল—লোকে যা তা বলতে আরম্ভ করল। রাজা ত রেগে আগুন হয়ে নাপিতকে কাটতে হুকুম দিলেন। কিন্তু নাপিত কি আর সেখানে থাকে? সে সেই সর্বনেশে ঢোলের কাণ্ড দেখে আগেই কোথায় সরে পড়েছে। কাজেই, তাকে আর তখন ধরে কে? রাজামশায়ের লম্ফঝম্প আর শিং নাড়াই সার হ'ল।

মঙ্গল যাত্রী

বনফুল

নিতাই মণ্ডল তেমন চটপটে লোক নন। কোথাও যেতে হলে তিনি তাই বড় বিব্রত হয়ে পড়েন! গ্রাম থেকে স্টেশনটি প্রায় মাইল তিনেক দূরে। গরুর গাড়ি করে যেতে হয়। শহরে যাবার ট্রেণও মাত্র একটি—সকাল আটটায় ছেড়ে যায়। এই সব কারণে শহরে তাঁর যাওয়াই হয় না বড় একটা। সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরোনো অসম্ভব তাঁর পক্ষে। ছ'টার আগে ঘুমই ভাঙতে চায় না। উঠে পায়খানা সেরে হাত-মুখ ধুতেই প্রায় একঘণ্টা বেরিয়ে যায়। একটি বড় নিমের দাঁতনকে চিবিয়ে ছিন্নভিন্ন না করলে তাঁর তৃপ্তি হয় না। এরপর স্নান! তেল মাখতেই তো আধঘণ্টা লেগে যায়! তারপর পুজো আছে। ঝাড়া একটি ঘণ্টা লাগে। পুজো সেরে জলখাবার নিয়ে বসেন। শুকনো চিঁড়ে আর নারকেল তাঁর প্রিয় খাদ্য। ভাল করে চিবিয়ে একবাটি চিঁড়ে খেতে খানিকটা সময় লাগে বই কি! এর পর কাপড়-জামা পরা আছে। কাপড়ের কাছা-কোঁচা ঠিকই হতে চায় না সহজে। জামার বোতাম লাগাতেও সময় লাগে। দর্জি গর্তগুলো এমন ছোট ছোট করেছে যে বোতামগুলো ঢুকতেই চায় না! তারপর জুতো পরা, ফিতে বাঁধা, তারপর চুল আঁচড়ানো—মানে ভদ্রভাবে কোথাও বেরুতে গেলে এ সব অপরিহার্য। নিতাই চট করে গুছিয়ে নিতে পারেন না সব, দেরি হয়ে যায়। তিনি বলেন, মানুষ তো আর পাখী নয় যে ফুরুৎ করে উড়ে যাবে। এই সব হাঙ্গামার জন্যে বেরুতে চান না তিনি কোথাও। ট্রেণ ফেল করে যে ওয়েটিং রুমে বসে থাকবেন, সে ধাতেরও লোক তিনি নন। কোথায় বসে থাকবেন ওই তেপান্তর মাঠের মাঝখানে!

এবার কিন্তু যেতেই হবে। একটা জরুরি মোকদ্দমা লেগেছে, না গিয়ে উপায় নেই। আগেই যাওয়া উচিত ছিল। তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলছিলেন, কিন্তু আর এড়ানো যাবে না, যেতেই হবে। তাঁর উকীল বিশ্বম্ভর চৌধুরী জরুরি তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখেছেন। চিন্তিত হয়ে পড়লেন নিতাই। পুজো সারতেই তো সাতটা বেজে যাবে? তারপর ওই গরুর গাড়ি।

অনেক ভেবে চিন্তে তিনি শেষে ঠিক করলেন যে কিছুদিন আগে থেকেই শুরু করতে হবে। পনরোই মোকদ্দমার দিন। আট তারিখ থেকেই ট্রেন ধরবার চেষ্টা করতে থাকবেন, যেদিন পেয়ে যান। তাছাড়া আর একটা মুশ-কিল, ঘড়ি নেই! সূর্য দেখে আন্দাজে সময় ঠিক করতে হবে।

প্রথম দিন তো বাড়ি থেকে বেরুতেই সূর্যঠাকুর শিমুলগাছের মাথায় উঠে

পড়লেন, অর্থাৎ আটটা বেজে গেল। দ্বিতীয় দিন আর একটু সকাল সকাল বেরিয়ে গেলেন; কিন্তু গ্রাম ছাড়াতে না ছাড়াতেই হারু ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনি ওই আটটার ট্রেণে এসেছেন। সুতরাং সে দিনও ট্রেণ পাওয়ার আশা নেই। ফিরতেই হলো। নিতাই মণ্ডল গাড়ির বলদ দুটোর পানে এমনভাবে চাইলেন যেন যত দোষ তাদেরই। তৃতীয় দিন আর একটু ভোরে উঠলেন। এমনি ভাবে চলতে লাগল।

ত্রৈলোক্য তরফদার বেশ চটপটে লোক। তাঁর কাজ হাতে-পায়ে লাগে না! কোনও কাজ ফেলে রাখা তাঁর স্বভাব নয়। যা করতে হবে তা আগে থাকতেই করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে চান তিনি। মনে কর, বাড়িতে লোক খাওয়াতে হবে, সন্ধ্যা আটটার সময় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের আসবার কথা; ত্রৈলোক্য তরফদার তাড়াহুড়ো করে ছ'টার মধ্যেই রান্নাবান্না প্রস্তুত করিয়ে ফেলবেন। তাঁর চরিত্রে 'হচ্ছে-হবে' বা 'গয়ং গচ্ছ' ভাব মোটেই নেই। তেমন লোক তিনি দু'চক্ষে দেখতে পাবেন না। যা করতে হবে তা আগে থাকতেই চটপট সেরে সময় থাকলে দুদণ্ড না হয় গল্প কর—এই তাঁর আদর্শ।

তাঁকেও ওই দিন ওই আটটার ট্রেণ ধরতে হবে। যদিও নিতাই মণ্ডলের গ্রামে তাঁর বাড়ি নয়, কিন্তু তাঁর গ্রামও স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে।

তিনি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শুলেন। বাইক আছে, সুতরাং ভয় নেই। নিতাই মণ্ডলের মত নিড়বিড়ে লোক নন তিনি। তাছাড়া পুজো-ফুজোর অত হাঙ্গামাও নেই তাঁর! তিনি উঠবেন আর সুট করে বাইকে চরে বেরিয়ে যাবেন।

নির্দিষ্ট দিনে নিতাই মণ্ডলের গরুর গাড়ি যখন স্টেশনের গুমটির কাছে এসেছে, তখন ট্রেনটি হুস হুস করে ছেড়ে গেল। নিতাই অসহায় ভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তাঁর। মুখে তুবড়ি ছুটতে লাগল। গাড়োয়ানটাকে গাল দিতে লাগলেন। গাড়োয়ান বেচারী কি আর বলবে! সে তো যথাসাধ্য জোরেই হাঁকিয়ে এনেছে! কিন্তু মনিবের সঙ্গে তো তর্ক করা যায় না—ঘাড় নিচু করে বসে রইল সে। কিছুক্ষণ চেঁচামেচি চীৎকার করার পর মণ্ডলমশায় অনুভব করলেন ভয়ঙ্কর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। আজ না খেয়েই বেরিয়েছিলেন তিনি। চিঁড়ে আর নাড়কোল পুঁটুলিতে বেঁধে এনেছিলেন।

গাড়োয়ানকে বললেন—জিনিস পত্তর নিয়ে ওয়েটিংরুমে চ। আগে খেয়ে নি, তারপর যা হয় করা যাবে। তোদের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি আমার!

জিনিসপত্র নিয়ে ওয়েটিং রুমের দিকে রওনা হলেন তিনি।

নিতাই মণ্ডলের পদশব্দে ত্রৈলোক্য তরফদারের ঘুম ভাঙল। ওয়েটিং রুমের বেঞ্চির উপর ধড়মড় করে উঠে বসলেন তিনি।

তিনি স্টেশনে এসে পৌঁছেছিলেন ভোর পাঁচটায়। পৌঁছে ওয়েটিং রুমের বেঞ্চিতে শুয়ে ট্রেনের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন, হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, খেয়াল নেই।

শনিবারের উপদেশ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অবশ্য নামের সঙ্গে স্বভাবের কোন সম্বন্ধ নেই, তবু যখন দেখা যায় আর সবকে বাদ দিয়ে অমন মোলায়েম বনমালী নামের ছেলেটিই এক নম্বরের বজ্জাত দাঁড়াল তখন মনে হয় না যে কোথায় যেন কি একটা গলদ আছে?

আমি তখন মাইনার স্কুলের সেকেণ্ড কিংবা থার্ড ক্লাসে পড়ি। আমাদের সময় ঐ রকম নাম ছিল, এখনকার হিসেবে এম ই স্কুলের সিকস্‌থ ক্লাশ হবে। বয়স হবে বারো তেরো—এইরকম। বনমালীও আমার সঙ্গে এক ক্লাশেই পড়ে। আমরা দুজনেই দূরের ছেলে, বোর্ডিঙে থাকি। বনমালী বোধহয় আমার চেয়ে বছর খানেকের বড় ছিল বা বছর দেড়েকের, তা সেটা এমন কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

স্বভাবের সঙ্গে না থাক, চেহারার সঙ্গে বনমালীর নামের অদ্ভুত রকম মিল ছিল, আর সেইটেই ছিল আরও বিপদ—শ্যামবর্ণ, নরম শরীরটি, মাথায় তেল চুকচুকে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, চোখ দুটি ঢলঢল করচে—দেখলে কে বলবে এই ছেলের পেটে পেটে এমন জিলিপির প্যাঁচ! একটা কিছু নষ্টামি করলে, ধরা পড়ে গেল, কিন্তু মাস্টার মশাইদের বিশ্বাস করানই শক্ত হোত ওটা বনমালীর কীর্তি। আরও একটা ব্যাপার ছিল—প্রমাণ যখন খুব বেশি তখন বনমালী নিজেই আগেভাগে স্বীকার করে নিয়ে তার ঢলঢলে দুটি চোখে এমন নিরীহের মতন চেয়ে থাকত যে, সে যে জেনে শুনে দুষ্টুমি করেচে এটা বিশ্বাস করান তো একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ত। অথচ আমরা জানতাম ও কতবড় পাজি। আবার শুধু দুষ্টুমি করেই তো খালাস নয়; নালিসের শুনানি হয়ে গেলে খানিকটা দূরে এসে একটু মুচকি হেসে সেই ঢলঢলে চোখে যখন একটু আড়ে চেয়ে দেখত তখন মনে হোত যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছে। ইচ্ছে হোত ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে দিই শেষ করে, কিন্তু বিচারে আবার ওই দুটো চোখেরই জয় নিশ্চয় জেনে কারুর সাহস হোত না। কী দুটো অলুক্ষুণে চোখই যে পেয়েছিল হতভাগা!

আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন ধর্মপ্রবণ, এদিকে আবার একটু ভীতুও ছিলেন, ভূত মানতেন আর দূরে কাছে যেখানেই একটা মন্দির কি ঢিপি দেখতেন হাতটি তুলে প্রণাম্ করা চাই। কিন্তু সেকথা এখানে নয়। ধর্মপ্রবণ ছিলেন; ক্লাশে সুবিধে পেলেই ধর্ম, নীতি প্রভৃতির কথা এনে ফেলতেন, তা ভিন্ন প্রত্যেক শনিবারে ছুটির পর বই পড়েই হোক বা এমনই হোক, ধর্ম, নীতি এই সব

নিয়ে উপদেশ দিতেন। আসল কথাটা এখন তোমাদের বলতে বাধা নেই;—ভাল লাগত না। ছটা দিন হাড় ভাঙা খাটুনির পর দুটো ঘণ্টা ছুটি পেয়েছি, তখন কি 'চুরি করা বড় দোষ'—ভালো লাগে? শুধু যে ভালো লাগত না তাই নয়, ভয় করতো। কেন, তা দুটো দিনের ঘটনা বললেই বুঝতে পারবে।

সে শনিবার ছুটি হবার পর হেডমাস্টার মশাইয়ের বক্তৃতা হোল দান সম্বন্ধে। একেবারে সেকাল থেকে আরম্ভ করে একাল পর্যন্ত নেমে এলেন : বলী রাজার কথা, হরিশ্চন্দ্রের কথা; একজন দান করে বাঁধা পড়লেন, একজনকে চণ্ডালের দাসত্ব গ্রহণ করতে হোল, স্ত্রী-পুত্র থেকে আলাদা হতে হলো, এমন কি এক সময় পুত্রকে হারাতে পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁদের ব্রত ছাড়েন নি। শুধু তো দান নয়, দানের পরে আবার দক্ষিণা দিতে হবে এই হচ্ছে আমাদের ধর্মের নিয়ম। তার মানে দান যেন ঠিক দয়া নয়, এক ধরনের পুজো; যে দয়া করে আমাদের এই পুজো নিলে তাকে দক্ষিণান্ত করতে হবে। সোজা আদর্শ একটা!

—বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে বললেন—মহারাজ সমস্ত রাজ্য তো দান করলে, এখন আমার দক্ষিণা কোথায়? অতএব স্ত্রী-পুত্র সমেত কারুর দাসত্ব নিয়ে আমার দক্ষিণা মেটাও।

তারপর পুরাণের কথা ছেড়ে বিদ্যাসাগরের কথায় এসে হেডমাস্টার মশাই যেন আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, দানের মহত্ত্ব যে কি করে প্রকাশ করবেন যেন ভেবেই পাচ্ছেন না।

এদিকে আমরা ক'জন ভেতরে ভেতরে ছটফট করছি। ঘোষালদের বাগানে আম পেকেছে, সে তো আর হরিশ্চন্দ্রের মত দান করবে না—আমরা চুরি করবার মতলব করেছি, দুপুরেই সুবিধে, বিকেল যত এগিয়ে আসছে ততই মনটা খিঁচড়ে যাচ্ছে। বনমালী কিন্তু প্রথম বেঞ্চে হেডমাস্টারের সামনেটিতে বসে স্থির হয়ে শুনছে, যেন তার কানে অমৃত বর্ষণ হচ্ছে। শুধু কি তাই? —মাঝে মাঝে এক একটা প্রশ্ন করে এমন একটা ফিকড়ি বের করছে যাতে হেডমাস্টার মশাইয়ের লেকচার আরও খানিকটা করে যাচ্ছে বেড়ে। তার ওপর সেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে! টপ করে পেছন দিকে একবার আমাদের পানে আড়চোখে চেয়েই সেই মুচকি হাসি। অতবড় শয়তান যদি আর দেখলাম এ জন্মে!

অত যখন দেরি হোল তখন না যাওয়াই উচিত ছিল আমাদের কিন্তু ছেলেবেলার লোভ, তায় লোভটা আবার পাকা আমের, যেতে হোল। ফলটা যে কি হোল সে দুঃখের কথা আর এখানে সবিস্তারে বললাম না। চারজন

গিয়েছিলাম, সন্ধ্যের ঠিক পরে কেউ ছেঁড়া কাপড়, কেউ ছেঁড়া জামা, কেউ বা ছেঁড়া দুটোই কোন রকমে সামলে-সুমলে পা ঢাকা দিয়ে বোর্ডিঙে এসে ঢুকলাম।

পাড়াগাঁয়ের স্কুলের বোর্ডিঙে সে সময় অনেকে নিজের নিজের চাল ডাল নিয়ে অসত। পয়সার রেওয়াজটা তত বেশি ছিল না! এমন কি সীট রেন্টের বদলেও চাল-ডাল বা অন্য কিছু ধরে দেওয়া যেত; মনে আছে হতভাগা বনমালী একবার এক ছালা ঘুঁটে এনে হাজির করেছিল। তা ওর তো সাতখুন মাফ্, কিছুই হোল না।

যাক। চাল-ডালের ব্যবস্থা দু'রকম ছিল, এক ভাঁড়ারে জমা করে দাও, না হয় যে যার নিজের কাছে রাখো। নিজের কাছে রাখলে হিসেবটা ঠিক থাকত—; যদি খেলাম, চাল বের করে দিলাম, বাড়ি গেলাম বা কোন কারণে খেলাম না একটা বেলা, তো সিদেটা বেঁচে গেল।

মাসের ছ'সাত দিন বাকি, সেই রকম চাল-ডাল পড়ে ছিল; ফেরার খানিক পরে সিদে বের করে দিতে গিয়ে দেখি একটি চাল কি একটি ডাল নেই, আমাদের সংগে যুগলা গিয়েছিল, তারও ঐ অবস্থা!

খুব একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। পরিবার কি একটা কারণে বাড়িতে পাঠিয়ে হেডমাস্টারও তখন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট উমেশবাবুর সংগে বোর্ডিঙেই থাকেন। তাঁদের কাছে নালিস পেঁছিল। আমরা বললুম আমাদের নতুন চাকরটার ওপর সন্দেহ হচ্ছে।

শনিবারের রাত্রিটা আমাদের পড়ার হ্যাংগাম থাকত না। চাকরটাকে জেরায় চারিদিক থেকে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে, এমন সময় সেই ঢলঢলে চোখ নিয়ে বুনো এল। (আমি ও-হতভাগার এই নামই চালাব এইবার থেকে, যতই সে সব কথা মনে হচ্ছে, গায়ে যেন বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে)।

কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, কিন্তু ঢুকল এমন ভাবে যেন এইমাত্র চাকরটার বিপদের কথা শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে। সোজা হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে বলল—নিতেকে নাকি চাল চুরি করার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, স্যার?

হেডমাস্টার মশাই বললেন—অপরাধ যখন সাব্যস্ত হয়ে গেছে, দিতে হবে বৈকি সাজা।

কিন্তু অপরাধতো ও করেনি স্যার, অপরাধ যদি হয়ে থাকে সে আমার।

ঘরের সবাই একেবারে থ হয়ে গেল। হেডমাস্টার আর সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এক সংগে জিগ্যেস করলেন—তুমি চাল ডাল নিয়ে কি করেছ?

দান করেচি, স্যার। সন্ধ্যের দিকে একটি অন্ধ একটি ছোট মেয়ের হাত

ধরে এসে বললে তার সংসারে সাত-আট জন খেতে, তা আজ তিন দিন ধরে কেউ দাঁতে কুটোটি কাটতে পায়নি। আপনার মুখে বলীরাজা, হরিশ্চন্দ্র আর বিদ্যাসাগর মশাইয়ের গল্প শুনে মনটা এমনিই বড় খারাপ হয়ে ছিল স্যার, কোথাও কিছু নেই কি করি? শেষকালে ঐ চাল আর ডাল কটি দিয়ে বিদেয় করলাম।

এমন করে চেয়ে রইল যেন অন্ধের দুঃখে এইবার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়বে। রাগে তো ইচ্ছে করছে কাঁচা মাথাটা ছিঁড়ে নি, কিন্তু বেশি রাগ বলেই কোন কথা বেরুচ্চে না। হেডমাস্টার একটু বেশি ভেবে কোন মতামত দিতেন, পাছে যেটা বলেন সেটা মিথ্যে বা অন্যায় হয়ে পড়ে একটা সমস্যা গোছেরও তো দাঁড় করিয়েছে বুনো? চুপ করে ভাবতে লাগলেন। আগেই বলেছি, আর চাল-ডাল গেছল যুগলার। সে একটু গোঁয়ার: রাগে একটু একটু কাঁপছিল, আমি টিপে দেওয়া সত্ত্বেও বেশ একটু ধমকেই বুনোকে জিগ্যেস করলে—তা তুই আমাদের চাল ডাল দিতে গেলি কেন লবাবি করে? হরিশ্চন্দ্র তো বলীরাজার রাজ্য দান করতে যায় নি।

হেডমাস্টারও বললেন—হ্যাঁ, ঐখানটায় তোমার দানে একটু খুঁত থেকে গেছে বনমালী; তোমার মনে ওঁদের পুণ্যকাহিনীর প্রভাব বোধহয় খুব বেশি পড়েছিল, তুমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলে, অতটা ভেবে চিন্তে দেখতে পারনি। কিন্তু—!

আমরা চারজন একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিলাম। বুনো হেডমাস্টারের কথায় বললে—তাই হয়েছিল স্যার। তারপর আমাদের দিকে চেয়ে গলাটা আরও করুণ করে বললে—তোমরা থাকলেও না দিয়ে পারতে না ভাই, আর যদি অতই নিষ্ঠুর হতে তো তোমাদের পায়ে ধরে আমি দোয়াতুম; কিন্তু ভাই, তোমরা তো কেউই ছিলে না, স্কুলের ছুটি হতেই তোমরা চারজনে কি দরকারি কাজে কোথায় চলে গিয়েছিলে, কার কাছে চাইতুম বলো? এখন, যদি অপরাধ হয়ে থাকে তো বন্ধু জেনে ক্ষমা করো।

—বলেই এমন ভাবে চাইলে বেশ বুঝতে পারা গেল আমাদের আম চুরি করতে যাওয়ার কথাটা জানে, চাল নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করতে গেলেই সব ফাঁস করে দেবে। তারপর হেডমাস্টারের আর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের দিকে চেয়ে বললে—তবু যদি ওরা চায় তো আমি ওদের চাল ডাল এনে দোব স্যার, না হয় দামই দিয়ে দোব—যেমন ওরা বলে, আর যেমন আপনারা বিচার করে দিন।

আমাদের পুরোপুরি হার, রাগে কাঁপার বদলে আমরা তখন আম চুরির কথা ফাঁস হয় দেখে ভয়ে কাঁপছি, তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বাঁচি। যুগলই

গলা নরম করে বললে—না ভাই, একটা কথার কথা বলেছিলাম, ভালোই করেছিস।—আমাদের চালডাল যে গরীবের উবগারে লেগেছে, এতে আমাদের সত্যিই আনন্দ হচ্ছে স্যার। বনমালীকে ছেড়ে দিন, এই সামান্য কথা নিয়ে বেশি আলোচনা হলে আমরা লজ্জা পাবো।

এক রকম তো নয়।

এর পরের শনিবার হেডমাস্টার মশাই আমাদের উপদেশ দিলেন। পরের জিনিস সম্বন্ধে আমাদের কি মনোভাব হওয়া উচিত, তাই নিয়ে; যেমন ধরো ট্রেনে যাচ্ছ কোথাও, উঠেই দেখলে খালি গাড়ি আর একটি মানিব্যাগ পড়ে রয়েছে, টাকা নোটে ভরা; লোভ তো হবেই, কিন্তু কি করে দমন করবে, তারপর কি করবে? আরও সব এই ধরনের উদাহরণ আর তাই নিয়ে উপদেশ।

এদিকে কি করে আমরা চালডালের শোধ তুলব ভেবে সারা হচ্ছি, এমন সময় আমার মানিব্যাগটা চুরি গেল। সেটা সোমবার রাত্রি, মঙ্গলবার দিন সকালে আমাদের দলের এককড়ির চাকু ছুরিটা লোপাট, বেচারা নোতুন কিনেছিল, কাঞ্চন নগরের দোফলা ছুরি।

হৈ-চৈ, খোঁজাখুঁজি, নালিশ-ফরিয়াদ সবই হোল; চারদিন নাকাল করে রবিবার দিন বুনো ভালো মানুষের মতন দুটো জিনিস নিয়ে এসে হাজির। এককড়ি তো এই মারতে যায়, সেই মারতে যায়। যুগলাও ছিল, আমরা বললাম হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে নালিশ করব আবার।

বুনো চোখ দুটো আরও ঢলঢল করে বললে—আমি তো তোমাদের হাতে দিচ্ছি না ভাই, স্যারের হাতেই দোব। কি করে পেলাম বলতে হবে তো তাঁকে?

যুগল বুক চিতিয়ে ঘুষি বাগিয়ে বললে—চুরি করেছিস, আবার কি করে পাবি? হজম করতে পারলিনি, দেখলি গোলমাল বেড়ে গেছে, সাধু সেজে ফেরাতে এয়েচিস।

বুনো বললে—বেশ আমি যা বলব সেটা আসল কথা—সেটাও শুনে রাখো, শেষে আমায় দুষো না। আমায় বলতে হবে—ঘোষালদের আমবাগানের মালী আমায় কাল সন্ধ্যায় দিয়ে গেছে ব্যাগ আর ছুরি দুটোই। আর সব যা যা বলে গেছে সেগুলোও বলতে হবে আমায়।

উল্‌টে আমাদেরই হতভাগাকে খোসামোদ করে হেডমাস্টারের কাছে যাওয়া বন্ধ করতে হোল। শুধু তাই নয়, ব্যাগে পয়সা রেজ্‌কি মিলিয়ে তিনটে টাকা ছিল, পেলাম মোটে দেড়টা। জিগ্যেস করতে বুনো বললে—তাতো জানি না,

মালী যেমন দিলে নিয়ে নিলাম, আম নষ্ট হওয়ায় ওর মনিব ওকে জরিমানা করেছে বলে কাতরাতে, বেচারাকে শুধু আট আনা খেসারত দিয়েছি ব্যাগ থেকে বের করে; এই তো জানি।

আগাগোড়া বানানো, কিন্তু আমাদের মুখটি বুজে সয়ে যেতে হোল।

এই রকম নিত্যি ব্যাপার। শেষকালে হেডমাস্টারের শনিবারের লেকচারের ওপরেই একটা আতঙ্ক দাঁড়িয়ে গেলো আমাদের। যা উপদেশ দেবেন তাই নিয়ে ঠিক একটা দুর্ঘট বাধিয়ে বসে আছে, আর উল্‌টে আমাদের দিয়েই খোশামোদ করাচ্ছে। ত্রাহি—ত্রাহি ডাক ছাড়িয়ে দিলে।

আমরা শেষকালে, যাকে বলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে ফন্দি আঁটতে লাগলাম।

এমন সময় বোর্ডিঙের হরকালী অসুখে পড়ল।

বোর্ডিঙটা সম্বন্ধে একটু ধারণা করে নাও এবার, গল্পটা বোঝবার সুবিধে হবে ঃ

পাঁচখানি মাঝারি সাইজের ঘর এক লাইনে, একদিকে টানা বারান্দা! চারখানি ঘর ছেলেদের জন্যে; প্রত্যেক ঘরে দু'টি করে ছেলে থাকবার ব্যবস্থা। ঘরের দুপাশে লম্বালম্বি করে পাতা একটি করে চৌকি, মাঝখানটা খালি। প্রত্যেক ঘরের মাঝখানে একটি করে বড় দোর। এক দিকের একেবারে শেষ ঘরে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট থাকেন। আগেই বলেছি, যখনকার কথা তখন তাঁর সঙ্গে হেডমাস্টারও রয়েচেন। এই ঘরের মাঝখানেও এই রকম একটি দরজা।

সব দরজাগুলি থাকতো খোলা, তার মানে ইচ্ছে হলে নিজের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এক নজরেই সমস্ত বোর্ডিংটার খবর নিতে পারতেন। তাঁর ঘরের দরজাটা দিনের বেলা প্রায় ভেজান থাকত, কিন্তু রাত্তিরে খোলা থাকতই।

আমরা ছিলাম মাঝের ঘরটিতে। ছ'জনের মধ্যে দুটি দল ছিল, আমি এককড়ি, গজানন আর যুগল; ওদিকে বনমালী আর বেচা। বেচা বিশেষ ধরাছোঁয়া দিত না, শুধু বনমালী যখন মুচকি হাসত, সে যোগ দিত। শুধু বনমালীর জন্যেই তাকে আমরা কিছু বলতে পারতাম না। ভেতরে ভেতরে সে বনমালীর চরের কাজ করত।

একটু সুবিধে হলেই আমরা পরামর্শ আঁটি, কিন্তু কিছুতেই বাগ পাইনা। শেষে এককড়ি একদিন বললে—ওকে শত্রু ভাবে পারা যাবে না, মিত্র ভাবে বধ করতে হবে, আমি ভেবে ভেবে এক মতলব ঠাউরেছি।

শনিবার ছিল, পুকুর ঘাটে বসে সে তার প্ল্যানটা আমাদের বললে, রাত

প্রায় আটটা পর্যন্ত বসে আমরা তার মধ্যে খুঁতখাঁত যা ছিল সব ঠিক করে নিলাম। প্ল্যান শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল একেবারে মোক্ষম।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়ার পর বনোর কাছে আমাদের সন্ধির প্রস্তাবটা উপস্থিত করলাম। তার সঙ্গে আমাদের প্ল্যানের ব্যাপারটাও। বললাম— বনমালী ভাই, একটি ঘরে আমরা শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ছ'টিতে থাকি, অজুকে বাদ দিলে পড়িও এক ক্লাশে, কিন্তু আমাদের যেন মিল নেই কোন। এটা কি ঠিক হচ্ছে? তোর যেমন বুদ্ধি, যেমন ভালো কাজ করবার ঝোঁক, আমরা যদি একজোট হই, কত কীই না করতে পারি। শুধু মিল নেই বলে হয় না; হেডমাস্টারের উপদেশগুলো মাঠে মারা যায়। আমরা একটা কথা স্বীকার করছি, সব সময় না হোক, দোষটা বেশির ভাগ আমাদেরই। যুগলার একটু গোঁয়ার্তুমি আছে—ঐ তো যুগলা সামনেই বসে আছে, ওর মুখের ওপরই বলছি—আমিও না ভেবে চিন্তে এক একটা কথা সময় সময় বলে বসি—

বিনিয়ে-বিনিয়ে অনেক বললাম, এরা তিনজনে মাঝে মাঝে যোগান দিয়ে গেল। শেষকালে বনমালীর মনটা যেন ভিজল! ধূর্ত ছেলে, ভিজত না, কিন্তু ওরই তো বরাবর জিত গেছে, আমরা বাড়িয়েও দিলাম খুব, আর সন্দেহ করবার রাস্তা পেলে না। বললে—বেশতো, মিলে মিশে থাকাইতো ভালো, না মিলে মিশেই তো ভারতবর্ষটা পরের হাতে গেল।

তারপর আস্তে আস্তে আসল কথাটা পাড়লাম—আমরা এ প্রস্তাবটা নিয়ে তোর কাছে এখন আসতাম না বনমালী; মানে দোষটা আমাদেরই তো, কোন্ মুখে আসি বল্? তবে তোকে পেলে সদ্য সদ্য জানি একটা মস্ত বড় ভালো কাজ হয়, তাই তাড়াতাড়ি এলাম, ভাবলাম— ভালো কাজের কাছে লজ্জার কথাটা ধরা উচিত নয়।

বনমালী বললে—কাজটা-কি শুনি?

বললাম—কাজটা হচ্ছে হরকালীকে আরাম করে তোলা, অনেকদিন থেকে তো ভুগছে ছোঁড়া। কি করে আরাম করে তোলা যায়—সেই নিয়ে এককড়ি একটা খাসা মতলব বের করেছে।—তোরই প্ল্যান, তুই-ই বল এককড়ি।

এককড়ি বললে— প্ল্যানটা আসলে কালকে হেডমাস্টারের উপদেশ শুনে আমার মনে এল। কাল ধর্ম আর বিশ্বাস নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের লেকচার হোল না?— বললেন না, বিশ্বাসের চোটে ভগবানকে তো পাওয়া যায়ই, এমন কি কঠিন কঠিন অসুখ পর্যন্ত সেরে যায়? তাই থেকে আমি ভাবলাম হরকালীর ওপর পরীক্ষা করলে কেমন হয়—ছোঁড়াটা তো অনেক দিন থেকে ভুগছে, আর বাড়ি ছেড়ে রয়েছে; আমরাই ওর ভরসা।

বেচা জিগ্যেস করলে—জলপড়া দেওয়া?

এককড়ি বললে—দুৎ, জলপড়াতে কি হবে? একেবারে গোড়ার ব্যাপার। বলে একটু চুপ করে রইল।

বুনো জিগ্যেস করলে—কি, ভেঙেই বল না।

এককড়ি আমার দিকে চাইলে, আমি বললাম—বল না খুলে, যখন ওকেই সব করতে হবে। আজ থেকে ওই আমাদের লীডার হোল তো?

তারপর বুনোর দিকে চেয়ে বললাম—অসুখ হলে আমরা কোন্ ঠাকুরের কাছে ধন্নে দিই বেশি করে?

বুনো একটু ভেবে বললে—বাবা তারকেশ্বর।

এককড়ি বললে—ধর্ হরকালী যেন দেখলে বাবা তারকেশ্বর সশরীরে এসে বলছেন—তোকে বর দিচ্ছি, ভালো হয়ে যা।

নতুন ধরনের কথা, বুনোর আগ্রহটা বেড়ে যাচ্চে, জিগ্যেস করলে—কিন্তু তাঁকে আনা যাবে কি করে! উপোস করে ধন্নে দেওয়া আমার কুষ্টিতে লেখেনি। বাবারে! খেতে একটু দেরি হলে আমার বুকে পেটে খিল ধরে।

যুগল বললে—আনার কথা হচ্চে না, আনা চাট্টিখানি কথা কিনা! অর্জুন অত বচ্ছর তপিস্যে করে—

যুগল বললে—নন্দী ভৃঙ্গীও সঙ্গে রইল—

আমি বললাম—তাই আমরা এলাম তোর কাছে। ভেবে দেখলাম সারা বোর্ডিংটায় যদি কেউ এ কাজ পারে তো সে বনমালী। তার ওপর যদি শোনে একজনের উবগার হবে,—হরকালীটা সেরে উঠবে, তো সে সব কাজ ফেলে এগিয়ে আসবে।

যুগল বললে—অবিশ্যি আমরা নন্দীভৃঙ্গী হব, কিন্তু মেন পার্ট করতে তুই, আর কারুর দ্বারা হবে না।

আমরা চুপ করলাম, বুনোও অল্প একটু চুপ করে কি ভাবলে, তারপর ব্যাপারটায় দুষ্টুমির একটা গন্ধ থাকার জন্যেই হোক বা যে জন্যেই হোক, একেবারে আমাদের চেয়ে মেতে উঠল। একবার শুধু বললে—হরকালীর ঘরে আর সব যে ছেলে আছে তারা যে টের পাবে।

বোর্ডিঙে তখন ছেলে কম। এক আমাদের ঘরেই ছ'জন, হরকালীর ঘরে সে নিয়ে তিন আর পাশের ঘরে তিন; বুনোকে বললাম তাদের আমরা ঠিক রেখেছি; কোন গোলমাল করবে না, শুধু কারা করবে বলিনি, বুনো আর বেচা যেন সেটি ফাঁস না করতে যায়! ওদের যেটুকু দরকার সেটুকু জানানই সুযুক্তি।

বুনো তো পাগল হয়ে উঠল, আমরা ছ'জনেই পুকুর ঘাটে গিয়ে বসলাম।

বুনো বললে সে পালপাড়া থেকে মহাদেবের পুরো সাজ যোগাড় করবে, জানাশোনা আছে, নন্দীভৃঙ্গীর আলখাল্লা জটাও আনবে। ঠিক হোল নন্দী সাজবে বেচা আর যুগল হবে ভৃঙ্গী। গলা খস্‌খসে করবার জন্যে দুদিন এন্তার দই চালাতে হবে, অবশ্য যাতে একেবারে বসে না যায় সেদিকে খেয়াল রেখে। সব যোগাড় করতে দেরি হবে, মঙ্গলবার রাত্তির তিনটের সময় ঠিক হোল।

বনমালীই বললে মঙ্গলবারটা আবার মা-কালীর বার, ওঁর স্বামী বলে শিবের সঙ্গেও বেশ খাপ খাবে। ওদিকে একবারে তৃতীয় প্রহর রাত্রিও হোল; খুব জমে যাবে।

মঙ্গলবার রাত্তিরে যখন সবাই খেয়ে-দেয়ে বেশ ঘুমিয়েছে, আমরা উঠলাম। আগেই বলেছি আমাদেরটা মাঝের ঘর, দুদিককার দরজা আমরা খুব সাবধানে ভেজিয়ে দিলাম, তারপর সাজগোজ আরম্ভ হোল। ধড়িবাজ ছেলে, একেবারে জটা, বাঘের ছাল, টিনের সাপ—প্রত্যেক জিনিসটি যোগাড় করেছে বুনো, গায়ে মাখবে বলে স্কুল থেকে খড়ি এনে পর্যন্ত গুঁড়িয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, যখন সাজগোজ সব ঠিক, নিজের বাক্স থেকে একটা লম্বা সরু অডিকলোনের শিশি ভরা জোনাকি পোকা, এদিকে ছিপি আঁটা, বললে— মহাদেবের কপালের আগুন, মাথার মাঝখানে জটার মধ্যে বসিয়ে বেঁধে দে।— তেপহর রাত্তিরে যখন জ্বলবে, আর সন্দেহ থাকবে না যে ষোল আনা খাঁটি মহাদেব।

একবার শয়তানি বুদ্ধিটা দেখো তোমরা!

নন্দীভৃঙ্গীও তোয়ের হোল। তারপর সবাই শুয়ে পড়লাম। ঠিক হোল যুগলা খালি জেগে থাকবে, সুপরিন্টেণ্ডেন্টের ঘড়িতে যখন তিনটে বাজবে আস্তে আস্তে সবাইকে তুলে দেবে। এক টিনের সাপ ছাড়া সাজগোজের হাঙ্গাম আর কিছু বাকি রাখা হোল না। আমাদের চারজনের ঘুমোতে বয়ে গেছে, এই প্ল্যানের মধ্যে আবার আমাদের নিজের আলাদা প্ল্যান নেই? ওৎ পেতে খানিকক্ষণ শুয়ে রইলাম, তারপর ঘন্টা দুয়েক পরে, রাত যখন ঠিক একটা আস্তে আস্তে উঠলাম। বুনো আর বেচার ওঠবার কোন চান্সই নেই, খুব অল্প সিদ্ধি পানের সঙ্গে খাইয়ে দিয়েছি, যাতে নেশা না হয়, অথচ ঘন্টা তিনচার ঘুমটা খুব গাঢ় হয়। তবুও খুব সাবধানে ওদের চৌকি দুটো চারজনে ধরে এক এক করে ঘুরিয়ে দিলুম।—পায়ের দিকটা মাথার দিকে করে আর মাথার দিকটা পায়ের দিকে করে।

আবার গিয়ে ঘাপটি মেরে শুয়ে রইলাম।

ঠিক যখন তিনটে আমি গিয়ে আস্তে আস্তে বুনোকে ঠেলে দিলাম।

ওঁ-ওঁ করে একটা চাপা শব্দ হোল, একেবারে কানের ওপর মুখ রেখে ফিস-ফিস করে বললাম—উঠবিনি, হরকালীকে স্বপ্ন দিতে হবে মনে নেই?

ধড়মড়িয়ে উঠল, বললে—তিনটে বেজে গেছে?

বললাম—এই মাত্র বাজল।

বেচাকেও তোলা হোল, ভৃঙ্গী যুগলা তো জেগেই ছিল। গ্যাস হবে বলে বোর্ডিঙে আলো জেবলে শোওয়া বারণ ছিল, মহাদেবের-কপালের আগুনে যে আলোর পরিহাস গোছের একটু হোল তাইতে সাজগোজ ঠিক করে নিয়ে, সাপগুলো বসিয়ে নিয়ে স-পারিষদ মহাদেব বর দিতে এগুলেন।

অন্ধকার হলেও ঘরগুলোর মাঝখানটা খালি, তা ভিন্ন মুখস্থই তো? নিঃশবাস টিপে একটা ঘর পার হওয়া গেল—সামনে বুনো, তার পেছনে নন্দী বেচা, তার পেছনে ভৃঙ্গী যুগল, সব পেছনে আমরা তিনজন। একটা ঘর পার হবার পর যুগলা আর এগুলো না। অবিশ্যি, সেটা ওরা দুজনে আর টের পেলে না। তারপর দ্বিতীয় ঘরের দোর আস্তে আস্তে পেরিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। আমরা আস্তে আস্তে দোরটা এদিক থেকে টেনে দিয়ে কড়া দুটো চেপে ধরে কান পেতে রইলাম।

নিশ্চয় বুঝেছ ওরা দুজনে কোথায় গিয়ে ঢুকল? চৌকি উলটে দিয়েছিলাম, দিক ভ্রম হয়ে একেবারে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরে!

এইবার দুজনে একটু ছোট্ট করে গলাখাঁকারি দিলে, বুনো অনেক বদমাইসির পাণ্ডা, গলাটা রেখেছে খানিকটা হাতে; বেচা দইয়ের বেআন্দাজ করে একেবারে বসিয়ে ফেলেছে। 'হিস' করে একটা ছোট্ট আওয়াজ হল।

একটু পরে বুনো ডাকলে—হরকালী হরকালী—এই হরা—

লোহার ওপর করাত টানলে যেমন হয় ওর গলার আওয়াজটা সেই রকম দাঁড়িয়েছে।

গোঁ—ওঁ—ওঁ—করে একটা টানা শব্দ হোল। বুনোর সন্দেহ করবার কথা নয়; আমরা কিন্তু বুঝলাম ওরা একেবারে হেডমাস্টারের বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভীতু মানুষ ঘুমের ঘোরে হঠাৎ বেয়াড়া শব্দ শুনে তাঁর বাকরোধ হবার মতন দাঁড়িয়ে গেছে।

বুনো বললে—ওঠ্, আর গ্যাঁঙাতে হবে না জবরের তাড়সে, আমি এসেচি, আর ভয় কি?

একটু চুপচাপ, তারপর ঘুম জড়ানো গলায় প্রশ্ন হোল—কে?

বেচা খুব জোর দিয়ে বললে—কে একবার চোখ মেলেই দেখনারে ছোঁড়া।

একটা অস্পষ্ট খসখসে আওয়াজ হোল মাত্র। অবস্থাটা বাক্যাতীত দাঁড়িয়েছে,

ওদিকে আর শব্দই নেই। বনো সেই করাত-চেরা আওয়াজে ক্যার ক্যার করে বললে—আমি মহাদেব রে হরা, তোর প্রতি তুষ্ট হয়ে বর দিতে এয়েচি, তুই ভালো হয়ে—

শেষ হবার আগেই বিছানা থেকে আঁ-আঁ-আঁ—করে একটা বিটকেল আওয়াজ উঠল, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জেগে উঠে ডাকলেন—মাস্টারমশাই! হেডমাস্টারমশাই! কি হয়েছে? হয়েছে কি?—

বনো আর বেচা তো একেবারে জড়াজড়ি করে দোরের ওপর আছাড়, কিন্তু সে কি আর খোলে? আমরা যে ততক্ষণে এদিক থেকে শেকল চড়িয়ে বসে আছি। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের দেশলাই জ্বালা পর্যন্ত আমরা টের পেলাম, তারপরেই ছুটে যে যার বিছানায়। চোর চোর! মহাদেব সেজে ঢুকেচে!—বলে এক চোট বিরাট হাল্লা উঠল। বোর্ডিঙের সবাই ছুটল, ওদিক থেকে স্কুলের পিয়ন ছুটে এল। তারপর কাছেপিঠে থেকে পাড়ার কিছু লোক আর যত কুকুর।

তারপরেই হাল্লাটা হঠাৎ থেমে গেল। আমরা অবশ্য সব শেষে গিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঘর ওলট পালট, হেডমাস্টার মশাইয়ের গায়ে তখনও অর্ধেক মশারি জড়ান। উনি আর সুপারিন্টেণ্ডেন্ট দুজনেই নিজের নিজের বিছানায় বসে হতভম্ব হয়ে মহাদেব আর নন্দীর দিকে চেয়ে আছেন। চোখের ভাব দেখলে মনে হয় যদি সত্যি সত্যিই মহাদেব আর নন্দী কৈলাস থেকে নেমে আসতেন তা হলেও বোধহয় তাঁরা এতটা আশ্চর্য হতেন না।

এরপর কি হোল সেটা খুলে না বললেও কিন্তু তোমরা সবাই আন্দাজ করে নিয়েচ। এবার শুধু একটা কথা বলে শেষ করি, বনো চেষ্টা করেছিল আমাদের জড়াতে. কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওর সম্বন্ধটা কত মধুর ওঁদের জানাই ছিল, কেউ আর বিশ্বাস করলেন না।

এর পরেও বাঁকা চোখেই চাইত আমাদের দিকে বনো, কিন্তু তার সঙ্গে সেই হাসির হল্লাটা আর ছিল না।

চেনা অচেনা

পরিমল গোস্বামী

রাত প্রায় আটটা। চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। সেই অন্ধকার কেটে, চারদিকের মাঠের নিস্তব্ধতা কেটে, ছুটে চলেছে রেলগাড়িখানা। গ্রামের পাশ দিয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে। গাড়িখানা হাওড়া থেকে কিছুক্ষণ আগে ছেড়েছে।

ইন্টার ক্লাসের একখানি কামরা। প্রকাণ্ড লম্বা। লোকে বোঝাই। কিন্তু আলো প্রায় নেই বললেই চলে। ছাদের মাত্র একটি দিকে তারের জাল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটি বাতি। আরও কয়েকটি বাতি জ্বলতে পারত, কিন্তু জ্বলছে না; তাদের শূন্য জায়গা পড়ে আছে, একটিও বাল্ব নেই।

চুরি হয়ে গেছে সব।

রেলগাড়ি অনেক দিন ধরেই তো চলেছে এদেশে, তাতে আলোও জ্বলেছে, কিন্তু এখন আর সে রকম জ্বলতে পারে না। এখন দেশে খুব চোর বেড়ে গেছে। যুদ্ধের মধ্যে বহু লোক চুরি-বিদ্যায় পাকা হয়ে উঠেছে। যে সব জিনিসে সবার সমান অধিকার, তা কতগুলো চোরের অধিকারে গিয়ে পড়েছে।

যুদ্ধের সময় থেকে গাড়িতে ভিড়ও বেড়ে গেছে খুব। দেশের বহু জিনিস ওলট-পালট হয়ে গেছে, তাই এখন আর আগের মতো কিছুই নেই।

এ-সব কথা গাড়ির মধ্যেকার যাত্রীরাই আলোচনা করছিল। আজকাল চেনা হোক, অচেনা হোক, কতকগুলো লোক একসঙ্গে কিছুক্ষণ মিশবার সুযোগ পেলেই দেশের নানা অভাবের কথা আলোচনা করে। সুখের কথা কারো মুখেই নেই, কেবল দুঃখের কথা।

কিন্তু ভিড়ের মধ্যে ঐ যে দুটি মেয়ে পাশাপাশি বসে আছে, ওরাও কি দেশের এই সব দুঃখের কথা ভাবছে?

মনে তো হয় না। কারণ, দেখেই বোঝা যায় ওরা স্কুলের মেয়ে।

স্কুলের মেয়েরা কি এসব ভাবে?

ওদের ভাবনা আরও সব কঠিন বিষয়ে। মালতীকে শান্তা সাতদিন চিঠি দেয়নি, মালতীর জীবন ব্যর্থ মনে হচ্ছে। ছায়ার সঙ্গে আলোর কি নিয়ে তর্ক বেধেছিল, আজ চারদিন ওদের কথা বন্ধ। ঊষা সন্ধ্যাকে তার বাড়িতে আসতে বলেছিল, আসেনি, তাতে পৃথিবীটাই উল্টে গেছে। এই রকম সব বড় বড় সমস্যা।

কিন্তু গাড়ির মধ্যে ঐযে দুটি মেয়ে গম্ভীর হয়ে উঠছে ক্রমেই, ওদের সমস্যা

দেখা দিয়েছে এই কিছুক্ষণ আগে। ওরা কেউ কাউকে চেনে না। ওদের এক-জন আসছে কলকাতা থেকে, আর একজন একটু আগে উঠেছে বর্ধমান থেকে।

যে মেয়েটি কলকাতা থেকে তার বাবা মা ভাইদের সঙ্গে উঠেছে, তার স্বাস্থ্য ভাল। যে মেয়েটি বর্ধমান থেকে তার বাবা মা ভাইদের সঙ্গে উঠেছে, সে একটু রোগা।

গাড়িতে জায়গা কমই ছিল, তার ওপর বর্ধমানের এই পরিবারটি ওঠার পর জায়গার কিছু অদল-বদল করতে হয়েছে। মেয়েরা একধারে একসঙ্গে বসেছে, ছেলেরা আর একদিকে। ফলে এই দুটি অপরিচিতা মেয়ে একেবারে গায়ে গায়ে লেগে গেছে।

কিন্তু তা হলেও দুজনের মধ্যে আলাপ হওয়ার কোনো বাধা ছিল না, কারণ দুজন দুজনকে কাছে পেয়েছে। কিন্তু এত কাছে পেয়েছে যে দুজন দুজনকে যেন পিষে ফেলছে! রোগা মেয়েটির হাড় বিধঁছে স্বাস্থ্যবতীর গায়ে, সে ভাবছে আর একটু চাপ বাড়লেই সে গুঁড়ো হয়ে যাবে। স্বাস্থ্যবতী ভাবছে হাড়ের চাপ আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়!—আর তাই দুজনেই দুজনের উপর মনে মনে ভীষণ চটে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্যবতী বিরক্তভাবে বলল, "আর একটু ভাল হয়ে বসো না!"

রোগা মেয়েটি কর্কশ স্বরে উত্তর দিল, "এর চেয়ে ভাল হয়ে আর বসব কি করে? এই ভিড়ে কি আর আরাম করা চলে?"

এর পর দুজনেই গুম হয়ে বসে রইল।

অথচ কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত দুজনেরই মন খুব প্রফুল্ল ছিল; কোনো দুঃখই ওদের ছিল না, কারো সঙ্গে ঝগড়া হয়নি, সব বন্ধুর সঙ্গেই ভাব বজায় আছে। তাছাড়া অতিরিক্ত আরও একটি কারণ ছিল খুশি থাকবার। কিন্তু সে কথা যাক।

বেশ কিছুক্ষণ ওদের এই রকম গম্ভীর ভাবেই কাটল। তারপর গাড়ি একটা বড় স্টেশনে এসে পৌঁছলে এই অবস্থার বদল হল। ওদের মাথার ওপরকার একটি বাঙ্ক হঠাৎ খালি হয়ে যাওয়াতে স্বাস্থবতী তা দেখে লাফিয়ে উঠে পড়ল সেই খালি জায়গায়। খেলাধুলো লাফঝাপে ওস্তাদ বলেই মনে হল তাকে। সে উপরে উঠেই বলল, "বাবা, একটা বালিশ দাও।"

ইতিমধ্যে রাত অনেক হয়ে গেছে। উপরের স্বাস্থ্যবতী তখনও ঘুমোয় নি, কারণ গাড়ির একটি মাত্র আলো তার চোখের কাছেই জ্বলছে। কিন্তু এ ছাড়াও হয়তো অন্য কোনো কারণ আছে।

নিচের রোগা মেয়েটির চোখেও ঘুম নেই। তার মনে একটা মধুর স্মৃতি।

কারণ আজই রওনা হবার মুহূর্তে তার এক লেখনী-বন্ধুর কাছ থেকে সে একখানা বড় চিঠি পেয়েছে। চিঠিখানা এখনও পড়া হয় নি।

গভীর রাত্রে গাড়ির প্রায় সকল যাত্রীই ঘুমিয়ে পড়েছে। ভিড়ও খুব বেশি নেই আর। এই রকম শান্ত মুহূর্তে চিঠিখানা সে বের করে পড়তে শুরু করল।

একবার পড়ল, দুবার পড়ল, তিনবার পড়ল।

কি সুন্দর ভাষা!

কি গভীর প্রীতি তার প্রতিটি কথায়!

অদেখা অজানা বন্ধুর সঙ্গে এমন আত্মীয়তা কি করে হয়—তাই নিয়ে কত কথা যে লিখেছে। মধুর! মধুর! প্রত্যেকটি কথা মধুর! প্রতিটি কথা মনকে আনন্দে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই চিঠির জন্যেই সে প্রতিদিন উন্মুখ হয়ে থাকে। লিখেছে—"মিনতি, তোমার চিঠি আমার স্বর্গসুখ!"

পড়তে পড়তে মেয়েটি তন্ময় হয়ে যায়।

লেখিকার নাম ডোরা। তার অবশ্য আরও একটি সুন্দর নাম আছে, কিন্তু চিঠিতে সে তা ব্যবহার করে না।

কিন্তু আশ্চর্য যোগাযোগ! উপরের স্বাস্থ্যবতীও একখানা চিঠি পড়ছে। তারও এক লেখনী-বন্ধুর চিঠি। কতবার যে পড়েছে, তবুও ভাল লাগে। চিঠির একটি কথার দিকে তার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে।

সে পড়ছে, "ভাই ডোরা, আমরা কেউ কাউকে দেখিনি, কিন্তু তবু মনে হয় কত দিনের পরিচয়! চিঠি পড়ে মনে হয়, দেখিনি ক্ষতি কি? চিঠির মধ্য দিয়ে তোমার সুন্দর মনটির যে পরিচয় পাচ্ছি তাই কি কম?"

দুজনের চিঠিতে প্রায় একই রকমের ভাবের কথা সব।

আরও একঘণ্টা কেটে গেছে। ওপরে নিচে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। গাড়ি থামল এসে একটা বড় স্টেশনে।

স্বাস্থ্যবতীর বাবা তাকে ডেকে বললেন, "ওরে, আমরা এসে পড়েছি, এবারে নামতে হবে।"

স্বাস্থবতী ওপর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। নামতে গিয়ে নিচের রোগা মেয়েটির হাত মাড়িয়ে দিল। সে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "কি রকম মেয়ে তুমি, একটু দেখে শুনে চলতে পার না?"

"না, পারি না," বলে গট্ গট্ করে নেমে গেল সে গাড়ি থেকে। রোগা মেয়েটি রাগে ফুলতে লাগল।

সেই দিনই বাড়িতে পৌঁছে মিনতি ডোরাকে চিঠি লিখতে বসল। কত কথা

লিখল! কিন্তু তার মধ্যে একটি মজার ঘটনার উল্লেখ ছিল। ট্রেনের মধ্যে একটি “গেছো মেয়ে” তার সঙ্গে কি রকম অদ্ভুত ব্যবহার করেছিল, সেই সব কথা।

ডোরাও ঠিক সেই দিনই মিনতিকে চিঠি লিখল। তার চিঠিতেও, একটি রোগা মেয়েকে সে গাড়ির মধ্যে কেমন জব্দ করেছিল, সেই কথাটি বেশ রং ফলিয়ে লিখল। মেয়েটি নাকি চামচিকের মতো দেখতে!

বেয়াই-পরিচয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবেশ্বরবাবু অকস্মাৎ গর্জন করে উঠলেন—আশা—আশা—এই আশা!

রাগে তিনি যেন ফুলছিলেন। কন্যা আশার বয়স হয়েছে, সে সন্তানের জননী। সে আর বাপের ক্রোধকে তেমন ভয় করে না। আর অভ্যাসেও ভয় কেটে যায়। আশা বললে, কি বাবা—দাদা এলোনা এখনও?

শিবেশ্বরবাবু বললেন—সেই ত বলছি। তোদের আমি সহ্য করতে পারি না ঠিক এই জন্যে।

প্রকাণ্ড মাথাটা এদিকে একবার ওদিকে একবার ঘুরে আবার সোজা হয়ে স্থির হ'ল।

আশা বললে—তা আমি কি করব বাবা?

—তবে করব আমি? জুতো মারব সে হারামজাদাকে। সে শূয়ার আমাকে বলে গেল চারটের সময় মোটর নিয়ে আসবে—কোথায় কি? রাস্কেল—ঈডিয়ট্।

অগ্নিবর্ষণ হচ্ছিল ছেলে সুধীরের উপর। সুধীরের শ্বশুরবাড়ি শ্যাম-বাজার। সেখানে শিবেশ্বরবাবুর আজ যাওয়ার কথা ছিল। সুধীরের উপর আদেশ ছিল চারটের সময় সে মোটর নিয়ে ফিরবে এবং একসঙ্গে সেখানে যাওয়া হবে। কিন্তু পাঁচটা বেজে গেছে তবু সে ফেরেনি। সুধীর ইঞ্জিনীয়ার, সে স্বাধীন ভাবে কন্ট্রাকটারের কাজ করে। আশা বললে—একটু দেরি হ'লই বা বাবা!

—দেরি হ'লই বা? চালাকী নাকি? দেরি হবে কেন? কেন হবে?

শিবেশ্বরবাবুর চোখ দুটো হয়ে উঠল যেন গোল ভাটা, ঠোঁট দৃঢ় চাপে উঁচু হয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে নাসিকাকম্পন এবং তৎসঙ্গে বিপুল গোঁফ জোড়াটাও ফুলে উঠল। তারপর তাঁর কথা ছিল হয় গম্ভীরভাবে হুম্—নয়—এ্যাও!

আগে বাড়িতে তার শুধু 'এ্যাও' চলত। কিন্তু আশার ছেলে রমু দেখে শুনে একদিন বলেছিল ঠিক যেন হুমো বেড়াল।

তার উত্তরে লাউড স্পীকারের আওয়াজের মত এমন এক ধমক তিনি মেরেছিলেন যে রমু কেঁদে উঠেছিল। সেই অবধি লজ্জিত হয়ে শিবেশ্বরবাবু বাড়িতে অভ্যাস করেছেন—হুম্!

যাক্—এর পরই হুকুম হল—নিয়ে আয় আমার কাপড়-জামা। আমি বেরুব।

—দাদা—

—এ্যাও—

এমন একটা গর্জনে আশাকে তিনি সম্বোধন করলেন যে আশা আর প্রতিবাদ করতে সাহস করল না।

কাপড়-জামা হাতে দিয়ে আশা অনেক সাহস করে বললে—চিনে যেতে পারবে ত? চোখ গোল হয়ে উঠল, ঠোঁট নাক উঁচু হয়ে গেল।—সঙ্গে সঙ্গে গোঁফ, তারপর—দুম্। যেতে পারব না? মীরাটের গলির চেয়ে বেশী গোলমেলে কলকাতার রাস্তা? খাইবার পাসের চেয়ে দুর্গম? ঈডিয়ট কোথাকার।

আশা সরে পড়ল।

বাইরের সিঁড়িতে লাঠির ও জুতোর সদম্ভ আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর সে বললে—মাগো গোরা সেপাই ঘেঁটে ঘেঁটে বাবার মেজাজ ঠিক লড়াইয়ে গোরার মতই হয়েছে।

মা বললেন—গোরা নয় মা, তোমার বাবা লড়াইএ মেড়া। গুঁতো খেয়ে খেয়ে আমার প্রাণ গেল।

শিবেশ্বরবাবু কলকাতায় একরকম নতুন লোক। তাঁর এতটা বয়স কেটেছে বাংলার বাইরে। যুদ্ধ বিভাগের কমিসরিয়েটে তিনি কাজ করতেন। যৌবনে বলতেন—হ্যাঁ, কাজ করতে হয়ত এই কাজ! বেটা ছেলের কাজ। কামান-গোলা বন্দুক আর সেপাইদের মধ্যে বাস না করলে উত্তেজনা কোথা? অন্য যে সব কাজ—সে হল মেয়েমানুষের কাজ। ছিঃ—

ছেলে সুধীরকে তিনি রুড়কীতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে দিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল তাকেও যুদ্ধ বিভাগে ঢোকাবেন। কিন্তু শেষে—বদলে গেল মতটা। সুধীরের বিয়ে ঠিক হল কলকাতায় শ্যামবাজারে। ঘটকালী করেছিলেন শিবেশ্বরবাবুর সম্বন্ধী সুরেন্দ্রবাবু। মেয়ে দেখা থেকে সমস্ত পাকা কথা-বার্তা প্রায় কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। শিববাবুর স্ত্রী এসেছিলেন বাপের বাড়ি ভাইপোর বিয়েতে। সেইখানেই প্রতিবেশিনীদের মধ্যে রমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান; সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তাও স্থির হয়ে গেল। শিববাবু অমত করলেন না, ছুটির দরখাস্ত করলেন, ছুটিও মঞ্জুর হল। তাঁর ইচ্ছে এক-মাত্র ছেলের বিবাহ বেশ খরচ করেই দেবেন। দিন স্থির হ'ল ১৮ই মাঘ। পৌষ মাসের শেষে সপরিবারে কলকাতায় আসবার কথা। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সীমান্ত প্রদেশে গোল বেধে উঠল। ওদিকে বাচ্চাইসাকো আফগানিস্থানে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললে। যুদ্ধ বিভাগ থেকে পরোয়ানা জারী হয়ে গেল—সর্বদা প্রস্তুত থাক, কখন রওনা হতে হবে তার কোন স্থিরতা নাই। সঙ্গে সঙ্গে শিববাবুর ছুটিও নামঞ্জুর হয়ে গেল। উপায় নাই। কিন্তু শিববাবু একটা ভীষণ দিব্য দিয়ে বললেন—আমার বংশে যদি কেউ এ

মিলিটারীতে কাজ করে সে শুয়োর, সে গাধা। তাকে আমি ত্যাজ্য পুত্র করব, সে ছেলেই হোক—আর নাতিই হোক।

যাক বিবাহ হয়ে গেল। ছেলের মামাই বরকর্তার কাজ করলেন। বিবাহের পর বৌ নিয়ে শিববাবুর পরিবার মীরাটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে আদেশ দিলেন—বাড়ি ঘর তৈরি কর আর সুধীর সেখানে কন্ট্রাক্টারের ব্যবসা করুক। এ ঝঞ্ঝাট মিটলেই আমি রিটায়ার করব।

বালীগঞ্জে বাড়ি হ'ল। সুধীর আপিস খুললে। তার শ্বশুর ধনপতিবাবু সত্যিই ধনপতি। মহাজনী কারবার ছিল। বৃদ্ধ বয়সে জামাইয়ের সঙ্গে ব্যবসায়ে নামলেন। তিনি দেখতেন হিসেব, সুধীর আঁকত প্ল্যান, তিনি খাটাতেন মজুর, সুধীর গাঁথুনীতে মারত লাথি।

যাক্ শিবেশ্বরবাবু পরশু সন্ধ্যায় এখানে এসেছেন তল্পীতল্পা গুটিয়ে। ইতিমধ্যে মাসখানেক হ'ল সুধীরের একটি খোকা হয়েছে। শিববাবু পৌত্র দেখবার জন্য মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—সুধীরকে বললেন—শ্যামবাজার যাব বৌমাকে দেখতে। শ্বশুরকে বলবি তোর—তাঁর ওখানে আজ আমার নেমন্তন্ন।

সেই নিমন্ত্রণ নিয়ে এত ব্যাপার।

শিববাবু রাস্তায় ভাবলেন একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক। কিন্তু আবার মনে হল এখানকার ড্রাইভাররা শোনা যায় অনেকে গুণ্ডা। তার চেয়ে 'বাস্' অনেক ভাল—শ্যামবাজারে যাবেই সে—এ পথ ভোলা তার চলবে না। অন্ততঃ যাত্রীরা পথ ভুলতে দেবে না। কাজেই বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে দুবার তিনবার 'শ্যামবাজার' লেখাটা পড়ে, তিনি উঠলেন বাসে, কণ্ডাক্টার হাঁকছিল—ধরমতলা—ডালহৌসি—শ্যামবাজার। বাস ছাড়ল।

যাত্রী কম, এক এক সীটে এক একজন বসেছিলেন। বাসখানা ধীরে ধীরে কিছুদূর যায় আর থামে। থামল যদি তো আর যেতেই চায় না। শিবেশ্বরবাবু চটে উঠলেন। চৌরঙ্গী পর্যন্ত যেতেই আধঘন্টা লেগে গেল। তিনি চটে বললেন—কি করছ তোমরা? আমার যে দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কণ্ডাক্টার উত্তরই দিল না।

তিনি বললেন—এই।

কণ্ডাক্টার বললে—কি এই-এই বলছেন মশাই? আমরা এমনি ভাবেই যাই। ভারী!

শিববাবুর ঠোঁট, নাক, গোঁফ ফুলে উঠল,—তারপর শোনা গেল—'এ্যাও'। কণ্ডাক্টার চমকে উঠল।

একজন সহযাত্রী বললে—আপনি ট্রামে চড়লেন না কেন? ওদের সংগে মারামারি করে কি করবেন?

—ও। আচ্ছা তাই যাব আমি! এই রোখো,—ম্যয় উতার যাউঙ্গা। গাড়ী ডালহৌসি স্কোয়্যারের কোণে এসে পড়েছিল, তিনি সেইখানে নেমে পড়লেন। ট্রাম আসে-যায়, শিববাবু ঘাড় উঁচু করে পড়েন 'শ্যামবাজার' লেখা আছে কিনা। অবশেষে শ্যামবাজার এল। আফিস-আদালতের ছুটির সময়—কন্ঠায় কন্ঠায় যাত্রী ঠাসা। শিববাবু উঠে পড়লেন। ভিতরে স্থানাভাব! একটু এগিয়ে গিয়েই একটা সিট খালি হ'ল, একজন উঠে গেলেন। একপাশে ডিসপেপসিয়ার রোগীর মত খিট্‌খিটে এক বৃদ্ধ বসে রইলেন।

শিববাবু টাল খেতে খেতে গিয়ে সেই সীটে ধপ্‌ করে বসে পড়লেন। সংগে সংগে বিশাল ভুঁড়িতে কাতুকুতুর মত একটা কনুই-এর গুঁতো খেতে দেখলেন সেই খিট্‌খিটে বৃদ্ধের কনুইটা, তাঁর ভুঁড়িতে বিদ্ধ হয়ে গেছে! তাঁর চোখ দুটো পাকিয়ে উঠল—নাক, ঠোঁট, গোঁফ ফুলে খাড়া হয়ে উঠল। তারপর—হুম্‌!

খিট্‌খিটে বৃদ্ধ চশমা সুদ্ধ দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর ফেলে, মুখটা বিকৃত করে উঠলেন। শিববাবুর মাথাটা ক্রোধে বার কয়েক এদিক ওদিক ঘুরে গম্ভীর-ভাবে সোজা হ'ল। তারপর তাঁর বিশাল বাহু দিয়ে সহযাত্রীর প্যাকাটীর মতো হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলেন—হটাও।

খিট্‌খিটে বৃদ্ধ তীব্র দৃষ্টি হানে।

উত্তরে শিববাবু চোখ পাকিয়ে ওঠেন, সংগে সংগে খাড়া হয়ে ওঠে নাক, ঠোঁট, গোঁফ।

ওপাশের বৃদ্ধ বাইরের দিকে চেয়ে বললেন—কি বিশ্রী চেহারা!

শিববাবু অগ্নিদৃষ্টি হানলেন। মাথাটা বার দুয়েক ঘুরল। তিনি একটু চেপে বসলেন।

রোগা ভদ্রলোককে শিববাবু জাঁতিকলে ইঁদুরের মত ট্রামের দেওয়ালের সংগে চেপ্টে ধরেছিলেন। তিনি কনুইয়ের গুঁতো দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন—সরে বসুন না মশাই!

শিববাবু আরও একটু চেপে বসলেন।

—শুনতে পাচ্ছেন না?

উত্তর নাই। আরও চেপে গম্ভীরভাবে শিববাবু সম্মুখের রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন।

—এই ঢাউস—পেট মোটা—কালা বেলুন—

—এ্যাও।

চোখ পাকিয়ে, গোঁফ ফুলিয়ে শিববাবু কঠোরভাবে সহযাত্রীর দিকে চাইলেন।

খিট্‌খিটে বৃদ্ধও রোষে দাঁত খিঁচিয়ে তাঁর চোখে চোখ রাখলেন।

শিববাবু ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠলেন—খেঁকী কুকুর!

খিট্‌খিটে বৃদ্ধ রাগে পাগল হয়ে উঠলেন, বললেন—খবরদার!

আরও একটু চাপ দিয়ে শিববাবু বললেন—ছুঁচোর মত ছুঁচলো মুখ।

সহযাত্রীর নড়বার ক্ষমতা ছিল না। নইলে নিশ্চয়ই নিজের অবস্থা ভুলে শিববাবুকে যুদ্ধে আহ্বান করতেন। উপস্থিত শুধু অতি কষ্টে বললেন—আর তুই?—তুই ত হুমো বেড়াল—

—এ্যাও!

—কি!

সেটা কিন্তু পিষ্ট অবস্থার জন্য অনুনাসিক হয়ে 'চিঁর' মত শোনাল।

শিববাবু বললেন,—চেপ্টে চিঁড়ে বানিয়ে ফেলব তোকে।

—বটে!—আমি তোকে পুলিশে দেব। সাক্ষী থাকুন আপনারা—বলে চেঁচিয়ে উঠল রোগা লোকটি। অন্যান্য সহযাত্রীরা সকলেই ঘটনাটা লক্ষ্য করেছিলেন—কিন্তু তাতে এতক্ষণ আশঙ্কার চেয়ে আনন্দই পেয়েছিলেন বেশী। সকলেই মুখ টিপে হাসছিলেন। এখন রোগা বৃদ্ধের অবস্থা দেখে তাঁরা শঙ্কান্বিত হয়ে উঠলেন।

একজন তিরস্কার করে বললে—একি মশাই—দুজনেই আপনারা বয়স্ক লোক—একি আপনাদের আচরণ?

কণ্ডাক্টার এসে শিববাবুকে বললে—আপনি এদিকে এসে বসুন বাবু।

ওদিকে একটা সীট এতক্ষণে খালি হয়েছিল।

শিববাবু হুঙ্কার দিলেন—কভি নেহি! দরকার হয় উনি যেতে পারেন।

উনি বললেন—আমিই বা যাব কেন? আমারও right আছে এ সীটে বসতে।

সহযাত্রীরা অনুরোধ করলে—তাহলে কিন্তু মশাইরা মারামারি করবেন না আর!

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

ওপাশের বৃদ্ধ পেষণের কষ্ট ভুলতে পারেন নি। নিম্নকন্ঠে তিনি বললেন—ঈডিয়ট—

—এ্যাও!—

শিববাবুর নাক ঠোঁট গোঁফ ফুলে উঠল।

—চোপ!

রোগা বৃদ্ধ রুখে উঠল।

সকলে আবার বলে উঠল—একি মশায়, আবার?

আবার চুপচাপ। কিন্তু মনের রোষে দুজনই ফুলছিলেন।

শীর্ণ বৃদ্ধ প্রায় মনে মনেই বললেন—হুতোম পেঁচা!

শিববাবুর কান বড় তীক্ষ্ন—বার দুই ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি বললেন,—তুই চামচিকে।

—তুই হাতী।

—তুই টিংটিঙে ফড়িং।

—নন্‌সেন্স।

রাস্কেল।

—ড্যাম।

—ষ্টুপীড্!

বেড়ালের ইঁদুর ধরার মত শিববাবু খপ করে দুই হাতে বৃদ্ধকে ধরে ফেললেন।

হাঁ-হাঁ করে সকলে এসে পড়তে না পড়তে রোগা বৃদ্ধকে দুটো প্রবল ঝাঁকি তিনি দিয়ে ফেলেন।

কণ্ডাক্টার এসে বললে—নেবে যান আপনারা বাবু। গাড়ির ভিতর এ-রকম—

শিববাবু গর্জে উঠলেন—কভি নেই। সঙ্গে সঙ্গে নাক ঠোঁট গোঁফ ফুলে উঠল।

রোগা বৃদ্ধের কিন্তু আর সে গাড়িতে থাকতে সাহস হচ্ছিল না; তিনি স্বেচ্ছায় নেমে গেলেন।

অনেক প্রশ্ন করে অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে বেয়াই-এর বাড়ির রাস্তা শিব-বাবু খুঁজে পেলেন। মনে মনে তিনি সুধীরের বাপান্ত করছিলেন। কুড়ি নম্বর বাড়িতে যেতে হবে তাঁকে। আঠারো নম্বরের কাছাকাছি আর একটা গলি ঐ রাস্তাটাকে কেটে চলে গেছে। সেখানে আসতেই ও-মোড় থেকে এগিয়ে আসা সেই রোগা বুড়োর সঙ্গে দেখা।

রোগা বুড়ো তাঁকে দেখেই একেবারে খাপ্‌পা হয়ে উঠেছিলেন, লাফিয়ে উঠে বললেন—এইবার কি হয় শালা—

—এ্যাও!

গর্জন করে শিববাবু কাপড় সাঁটতে প্রবৃত্ত হলেন।

পিছন থেকে একখানা মোটরের হর্ণে দুজনকেই রাস্তার একপাশে সরতে হল। মোটরটা থেমে গেল।

সুধীর মোটর থেকে নেমে বললে—এই যে! আপনাদের পরিচয় তাহ'লে হয়ে গেছে?

দুই বৃদ্ধই দুজনের মুখপানে তাকিয়ে রইলেন।

সুধীর রোগা বৃদ্ধকে বললে—আমার একটু দেরি হয়ে গেল। ফিরে এসে আপিসে দেখি আপনি চিঠি লিখে রেখে 'ট্রামে' চলে এসেছেন। শিববাবুকে বললে—বাড়ি গিয়ে দেখি আপনিও বেরিয়ে পড়েছেন।

শিববাবু মোটা হলেও বুদ্ধিমান লোক। দুই বাহু বিস্তার করে ধনপতিবাবুকে জাপ্‌টে ধরে বললেন—আরে বেয়াই যে? সুধীরের একটু ধাঁধা লাগল—সে বললে—সে কি আপনাদের পরিচয়—

শিববাবু বললেন—হয়ে গেছে।

ধনপতিবাবু তখন আলিঙ্গনের চাপে কোঁক্-কোঁক্ করছিলেন।

মাস্টার মশায়

তুষারকান্তি ঘোষ

আজ তোমাদের একটি গল্প শোনাচ্ছি। শুনতে পাই তোমাদের খুশি করা নাকি খুব শক্ত কাজ। একদিন আমি তোমাদের বয়সীও ছিলাম। আমার সেই ছেলেবেলার একটি গল্প আজ তোমাদের কাছে বলছি। তোমাদের যদি খুশি করতে পারি তবে আনন্দ পাবো প্রচুর একথা আগে থেকেই বলে রাখছি। যদি কোন কারণে তোমাদের চটিয়ে দিই তাহলেও চট্ করে ভয় পাবার কিছু নেই—কেননা তোমাদের কাছ থেকে অনেকখানি দূরে বসে আছি। ইচ্ছে করলেই তোমরা দল বেঁধে আমায় পাকড়াতে পারবে না। তোমরা রয়েছ নানা জায়গায় ছড়িয়ে।

আমি আশা করছি, আমার ছেলেবেলার গল্প শুনে তোমরা বেশ খানিকটা আমোদ পাবে।

আচ্ছা, এইবার আসল গল্পটা শুরু করা যাক্। আমি একটু বেশী বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, যদিও খুব ছোট বেলায় ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসে কিছুদিন পড়েছিলাম। আজকাল দেখতে পাই বাচ্ছা ছেলে-মেয়েরা খুব সকাল বেলা উঠে স্কুলের পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। তোমাদের চাইতে তোমাদের বইগুলি ভারী। দেখে হাসিও পায় আবার দুঃখও হয়।

আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু এমন রাশি রাশি বইয়ের আমদানি ছিল না। যে কয়খানি বই পড়তে হতো—একেবারে আগাগোড়া সুন্দর করে তৈরি করে ফেলতে হত।

তখন আমার বয়স এগার বছর হবে। বাড়িতে পড়ি। এই সময় এলেন এক নতুন মাস্টার। তাঁর চেহারা দেখেই আমার আত্মারাম একেবারে খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম।

ইয়া জাঁদরেল চেহারা—লোহার দুটো বল যেন তাঁর হাতের গুলি। তিনি ঢিলে হাতার পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে মাস্‌ল্ ফুলিয়ে কেবল সেগুলি আমার সামনে নাড়াতে লাগলেন, আর চোখ পাকিয়ে ভুরুটাকে জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো বেঁকিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন, কি! পড়া তৈরি থাকবে ত রোজ?

ততক্ষণ আমার গলা-বুক শুকিয়ে উঠেছে; তেষ্টা পেয়েছে। এই কথা সাহস করে বলবো কি না আপন মনে ভাবছি—তিনি আবার হুমকি দিয়ে উঠে বললেন, "কৈ, ইংরেজী বই কোথায় দেখি?"

যেন আগুনে হাত দিচ্ছি সেইরকম ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে আমার ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকখানি এগিয়ে দিলাম। তিনি আড়চোখে আমায় আর একবার ভাল করে দেখে নিলেন। বলির ঠিক আগে উৎসর্গ-করা ছাগলের দিকে খাঁড়াধারী যে ভাবে তাকায় অনেকটা সেই রকম বেপরোয়া ভাব।

মাস্টার মশায়ের রকম-সকম দেখে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, তিনি আমায় পড়াতে এসেছেন—না, একটা এসপার-ওসপার করতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছেন।

ওইটুকু সময়ের মধ্যে ভাববার চেষ্টা করলাম—আজ সকালবেলা কার মুখ দেখে উঠেছি! কিন্তু চট্ করে কারো কথাই মনে পড়লো না। পৃথিবীটাকে অতি বেশী গোলাকার বলে বোধ হতে লাগলো। উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা আছে কি না সেকথাও সহসা ঠাহর হলো না।

এমনি যখন মনের অবস্থা, তখন আমার মুখে যেন কে বোবাকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। মাস্টার মশায় যে মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে আমার আব-ভাব লক্ষ্য করছেন—সেটা ওদিকে না তাকিয়েও বেশ বুঝতে পারলাম।

ইতিমধ্যে তিনি গম্ভীর ভাবে একটা শব্দ করলেন—"হুম্! মন দিয়ে শোন এইবার!"

মাস্টার মশায়ের হাতের গুলির নাচুনি, তার ওপর চোখের ভাবভঙ্গী এই দুই বস্তু দেখেও যদি মন দিয়ে না শুনি—তবে ভগবান আমায় রক্ষা করুন!

মাস্টার মশাই বললেন, "একপাতা পড়া দিয়ে গেলাম। কোন শব্দ আমার মুখ দিয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তার বানান আর অর্থ চটপট বলে দিতে হবে। ধরো, কথাটা হল Surprise. এই কথাটা যখনি আমি উচ্চারণ করবো অমনি তুমি বানান করে বলবে—S-U-R-P-R-I-S-E—তারপর বলবে তার মানে। আমি কিন্তু কিছু বলবো না—বানান করো কিম্বা মানে বলো!"

তারপর আর একবার আড়চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন—"মনে থাকবে?"

ছেলেবেলায় আমি খুব মুখচোরা মানুষ ছিলাম, তাই কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। শুধু ঘাড় কাত করে আমি যে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি সেই কথাই জানিয়ে দিলাম।

আমার নতুন মাস্টার মশায় গম্ভীরভাবে আবার শুধু বললেন—"হুঁ।"

এইবার সেদিনকার রাত্তিরের কথা বলি : শোবার আগে যতক্ষণ পারলুম পড়া মুখস্থ করলুম। কিন্তু বেশ বুঝতে পারলুম ভাল করে তৈরি হয়নি এবং এজাতীয় তৈরিতে যে মাস্টার মশায়কে খুশি করতে পারবো না সেটাও দুরু-দুরু বুকে কিছুটা আঁচ করতে পারলুম।

রাত্তিরে শোবার আগে বৌদিকে বললাম—খুব সকালবেলা আমায় জাগিয়ে দিতে হবে। পড়া তৈরি করবো। তিনি পাঠ্যপুস্তকে হঠাৎ আমার এরকম মনোযোগ দেখে বোধকরি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঘুমুতে তো গেলাম...কিন্তু শুধু এপাশ-ওপাশ, এপাশ-ওপাশ! ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি আমার চোখের পাতা থেকে ছুটি নিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে রইল তার আর হদিস পাওয়া গেল না।

তারপর অনেক রাত্তিরে কখন আপনা থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেটা ভালো করে খেয়াল করতে পারিনি।

কিন্তু বিপদের ওপর বিপদ!

সেই ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন দেখতে লাগলাম—মাস্টার মশায়ের হাতের গুলি—তিড়িং-মিড়িং করে লাফাচ্ছে! চোখ-দুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে—সেই দুটো একেবারে যেন আমার কপালের উপর ঝুঁকে পড়ে আমাকে বেশ করে দেখছে!

কেমন একটা অসোয়াস্তিতে ঘুমটা আচমকা ভেঙে গেল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি ঘামে একেবারে ভিজে গেছি! মাস্টার মশায়ের মাস্‌ল্‌ যে ঘুমের মধ্যেও আমাকে তাড়া করেছিল বুঝতে পেরে সত্যি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

শেষ পর্যন্ত বৌদিকে ঘুম ভাঙিয়ে বসে শান্ত-সুবোধ ছেলের মতো পড়া তৈরি করতে লাগলাম।

বাড়িসুদ্ধ লোক আমার কাণ্ড দেখে তো একেবারে থ!

সারা সকালটা খেটে বেশ করে পড়া তৈরি করে ফেল্লাম। তারপর এসে হাজির হলো সেই সাংঘাতিক সময়। মাস্টার মশায় এলেন—এলেন বললে ভুল বলা হবে—তাঁর শুভ আবির্ভাব ঘটল।

তিনি দিব্যি জাঁকিয়ে এসে বসলেন। পাঞ্জাবির আস্তিন বেশ করে গুটিয়ে নিলেন—যাতে মাংসপেশীগুলি চমৎকারভাবে চোখে পড়ে।

গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, "বই নিয়ে এদিকে আয়।" কাঁদো কাঁদো চোখ আর দুরু-দুরু বুক নিয়ে হাজির হলাম তাঁর সামনে।

মাস্টার মশায় একটি একটি করে শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন—যেন বুলেট ছুড়ে মারছেন আমার দিকে।

প্রথমটা ভারী ভয় করছিল। মনে বল এনে জবাব দিতে লাগলাম।

কি আশ্চর্য! আমি নিজেই অবাক হয়ে যেতে লাগলুম! তিনি একটি একটি শব্দ বলে যাচ্ছেন আর আমি বানান করছি—অর্থ বলছি—

মজার কথা—একটুও আটকাচ্ছে না! ক্রমে ক্রমে নিজের যোগ্যতা দেখে নিজেই হক্‌চকিয়ে যাচ্ছি। এত ভাল পড়া তৈরি করেছি আমি। মাস্টার মশায়ের প্রশ্ন আর সঙ্গে সঙ্গে আমার জবাব। জবাব দেবার কাজ দিব্যি সুন্দরভাবে

চলতে লাগলো। ক্রমে সমস্ত প্রশ্নেরই ঠিক জবাব দিলুম। নিজেকে নিজেই তারিফ করবো কি না সেই কথাই ভাবছিলুম। হয়ত নিজের অজান্তেই মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল...আত্মতৃপ্তির হাসি হবে।

এমন সময় যেন বজ্রপাত হল। মাস্টার মশায়ের এক বিরাট চপেটাঘাতে আমি একেবারে পপাত ধরণীতলে।

নাটকের ভাষায় এ যেন একেবারে অতর্কিত নৈশ আক্রমণ। এই রকম কাণ্ডটি যে ঘটবে তা এক মুহূর্ত আগেও জানতে পারিনি! এত জোরে চড় কখনো খাইনি, আর এত লেগেছিল যে এখনও মনে আছে।

মাটি থেকে যে উঠে বসবো সে ভরসাও ভাল করে করতে পারছিনে।

কিন্তু মাস্টার মশায় আমাকে মাটিতে চুপচাপ শুয়ে থাকবার ফুরসত দিলেন না।

গম্ভীর গলায় তাঁর আদেশ শোনা গেল, "এইখানে উঠে আয়।"

আস্তে আস্তে উঠে গোবেচারীর মতো মাস্টার মশায়ের সামনে দাঁড়ালাম।

তিনি গলাটা আরও সাফ করে আদেশের ভঙ্গীতে বললেন—"এইবার বল দিকি কেন তোকে চড়টা মারলুম?"

ভালোরে ভালো, এযে দেখছি আরো বিপদ। চড় খেয়েও নিস্তার নেই। আবার ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে, কেন আমি চড় খেলাম। আমার তখন গাল জ্বলে যাচ্ছে। কেন চড় খেলাম তার উত্তর আর আমার মগজে খুঁজে পাওয়া গেল না।

কাজেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

কিন্তু মাস্টার মশায় আমাকে ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বললেন—"বলতে পারলি নি তো কেন তোকে এই চড়টা মারলুম? তা হলে শোন্, আজ তোর সমস্ত পড়া ঠিক হয়েছে বুঝতে পারছিস তো? যেদিন এই রকম পড়া ঠিক পারবি সেদিন এইরকম অল্পের ওপর দিয়ে যাবে।"

তারপর হুঙ্কার দিয়ে বললেন—"আর যেদিন ভুল করবি সেদিন কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছিস তো?"

এই বলে দু'হাতের আস্তিন সমস্তটা তুলে নিয়ে মাস্‌ল্ ফুলিয়ে দু'হাতের শক্ত করা মুঠি আমার নাকের কাছে ধরে চোখ লাল করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

বলা বাহুল্য, তারপর তিনি যে তিনমাস আমায় পড়িয়েছিলেন, আমি এক-দিনও পড়া ভুল করিনি।

মোক্তার ভূত

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবু-মোক্তার আর বেণী-মোক্তারকে মহকুমার সকলেই চিনত—তাদের মতন ধূর্ত ধড়িবাজ লোক ও-তল্লাটে আর ছিল না। লোকে যেমন তাদের চিনত তেমনি ভয়ও করত। একবার তাদের পাল্লায় পড়লে আর কারুর রক্ষে ছিল না,—জোঁক যেমন গা থেকে রক্ত শুষে নেয় অথচ জানতে পারা যায় না, তারাও তেমনি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে টাকা শুষে শুষে মক্কেলকে সর্বস্বান্ত করে দিত।

আদালতে দু'জনের মধ্যে রেশারেশি চলত, আবার বাইরে ভাবও ছিল। শিবু মক্কেলকে বলত,—'বেণীটা জানে কি? ওকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দেব।' আবার বেণীও নিজের মক্কেলকে বলত,—'শিবুটা একটা আস্ত গাধা,—আইনের প্যাঁচে ফেলে ওর দফা-রফা করব।'—কিন্তু সন্ধ্যেবেলা একজন আর একজনের দাওয়ায় বসে তামাক না খেলে রাত্রে ঘুম হত না।

এমনিভাবে দুই মোক্তার সারাজীবন পরস্পরের সঙ্গে বাইরে বন্ধুত্ব আর ভিতরে শত্রুতা করে ক্রমে বুড়ো হয়ে এল। দু'জনেরই বেশ টাকা-কড়ি বাড়ি ঘর হয়েছে—বলতে গেলে তারাই দেশের মধ্যে সবচেয়ে গণ্যমান্য হয়ে উঠেছে। বারোয়ারী দুর্গাপুজোয় এক বছর শিবু প্রেসিডেণ্ট হয়, পরের বছর বেণী প্রেসিডেণ্ট হয়—স্কুল-কমিটিতেও তাই। কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়।

ওদের দু'জনের মধ্যে বোধ হয় শিবুরই ফিচ্‌লে বুদ্ধি বেশী ছিল। সে একদিন মনে মনে মতলব আঁটলে—বেণীকে ভাল করে ঠকাতে হবে। কারণ এ পর্যন্ত কেউ কাউকে ভাল করে ঠকাতে পারেনি, বুদ্ধির যুদ্ধে কখনো বেণী জিতেছে কখনো শিবু জিতেছে। ফলে দুজনের মধ্যে কেউই বড়াই করে বলতে পারত না যে, আমি বেশী চালাক।

শিবু-মোক্তার ফন্দি ঠিক করে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা হন্তদন্ত হয়ে বেণীকে গিয়ে বললে,—'ভাই বেণী, বড় বিপদে পড়েছি। পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে পার, কালই ফেরত পাবে।'

বেণী শিবুর মতলব বুঝতে পারলে না, বললে,—'তার আর কি। নিয়ে যাও।'

শিবু টাকা নিয়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসল। পরদিন টাকা ফেরত দেবার কথা, কিন্তু শিবুর দেখা নেই। বেণীর মন উতলা হয়ে উঠল। তারপর আরো দু'দিন কেটে গেল, কিন্তু শিবুর টাকা দেবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না।

বেণী মহা ফাঁপরে পড়ল। সে বুঝলে শিবু তাকে বিষম ঠকিয়েছে—কিন্তু লজ্জায় সেকথা কারুর কাছে বলতে পারলে না। হ্যান্ডনোট না লিখিয়ে নিয়ে শিবুকে সে টাকা ধার দিয়েছে একথা জানাজানি হলে দেশসুদ্ধ লোক হাসবে; বলবে,—'বেণী মোক্তারটা গাধা! শিবুও তাই চায়। বেণী মোক্তার ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেল।

শিবুর সঙ্গে যখনি দেখা হয় বেণী ফিসফিস করে বলে,—'ভাই শিবু, আমার টাকা?'

শিবু বলে,—'কিসের টাকা?'

বেণী বলে,—'সেই যে সেদিন তুমি ধার নিলে—পঞ্চাশ টাকা!'

শিবু হেসে বলে,—'বেণী ভাই, বুড়ো হয়ে তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? পঞ্চাশ টাকা আবার আমি কবে নিলুম?'

বেণী রেগে বলে—'দেবে না তাহলে? আচ্ছা আমিও দেখে নেব?'

শিবু হ্যা-হ্যা করে হেসে বলে,—'বেশ ত, মকদ্দমা কর না—হ্যান্ডনোট আছে নিশ্চয়?'

বেণী রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে চলে যায়।

ক্রমে কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে বেণীর পঞ্চাশ টাকা শিবু-মোক্তার বেবাক ঠকিয়ে নিয়েছে। সবাই আহ্লাদে আটখানা, ভাবলে,—'আহা, কাগের মাংসও কাগে খায়?' বেণীকে সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগল,—'হ্যাঁ দাদা, তুমি নাকি লেখাপড়া না করেই শিবুকে টাকা ধার দিয়েছিলে? শেষে তোমার এই দুর্বুদ্ধি হল?'

বেণী কিন্তু কিছুতেই মানতে চায় না, ঘাড় নেড়ে বলে,—'আরে না না, ওসব শিবেটার মিথ্যা কথা। শুধু হাতে টাকা ধার দেব আমি? আমাকে কি কুকুরে কামড়েছে? দাঁড়াও না, শিবেকে আমি—'

যখন একলা থাকে তখন শিবুর পেজোমির কথা ভেবে দাঁত কড়মড় করে আর গালাগাল দেয়।

এমনি ভাবে টাকার কথা ভেবে ভেবে বেণী অসুখে পড়ল। একে বুড়ো বয়স, তার ওপর টাকার শোক—বেণী যায় যায়। ডাক্তার বদ্যিরা তার অবস্থা দেখে আশা ছেড়ে দিলে।

বেণী কিন্তু তখনো টাকার আশা ছাড়েনি; কেবলই ভাবছে, কি করে শিবুর কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করবে! তার আর অন্য চিন্তা নেই। যখন বদ্যি নাড়ী দেখে বললে,—'হরি নাম কর! গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম! গঙ্গাজল মুখে দাও।' বেণী তখনো ভাবছে কোন্ ফিকিরে শিবুর কাছ থেকে টাকা আদায় করবে।

শেষে মরণের আর দেরি নেই দেখে বেণী শিবুকে ডেকে পাঠালে। শিবু এসে তার পাশে বসতেই বেণী আর সকলকে সরে যেতে বললে। সবাই সরে গেলে বেণী কটমট করে শিবুর দিকে চেয়ে বললে,—'আমার টাকা?'

শিবু মনে-মনে হেসে বললে,—'কিছু ভেবোনা ভাই বেণী; তোমার টাকা ঠিক আছে। এখন হরি-নাম কর। তোমার ভাল-মন্দ একটা কিছু হলেই তোমার টাকা তোমার ছেলেকে দেব—তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে বৈকুণ্ঠে যাও।'

বেণী বললে,—'না, এখুনি দাও।'

শিবু বললে,—'এখন টাকা কোথায় পাব ভাই? কালই তোমার ছেলের হাতে দিয়ে দেব—তুমি ভেবো না।'

বেণীর প্রাণ তখন কণ্ঠায় এসে পেঁাচেছে; তবু সে গোঁ ধরে বললে,—'না—এখুনি টাকা দাও।'

শিবু দেখলে মিনিট দশেকের মধ্যেই বেণী পটল তুলবে, সে বললে,—'আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি টাকা আনছি।' বলে সে চলে গেল।

নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে শিবু গম্ভীর ভাবে বসে রইল। তারপর বেণীর বাড়ি থেকে যখন মড়াকান্না উঠেছে তখন সে আবার বেণীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। যেন কতই শোক পেয়েছে এমনি ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বেণীর ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বললে,—'আমি আর বেণী—একমন একপ্রাণ ছিলুম; তাই শেষ সময়ে আমাকে দেখবে বলে বেণী ডেকে পাঠিয়েছিল। যাবার সময় বলে গেল,—আমার ছেলে নেহাত ছেলেমানুষ—দেখবার শোনবার কেউ নেই—তুমিই দেখাশুনো করো।—তা কিছু ভেবো না বাবা, তোমাদের সব ভার আজ থেকে আমি নিলুম। বেণী আমার কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিয়েছিল, তা সে যাক গে, সে টাকা আমি তোমাকে দিলুম। হ্যাণ্ডনোটগুলো আমি সব ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

পাড়াপড়শী যারা ছিল তারা শুনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল 'তাইত! কি আশ্চর্য! শিবুর সঙ্গে বেণীর এত ভালবাসা ছিল?'

ক্রমে বিকেল হয়ে আসছিল; পাড়ার অনেক ছেলে-ছোকরা জুটে বেণীর মড়া কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে চলল। শিবুও বন্ধুত্বের খাতিরে সঙ্গে গেল। ইচ্ছেটা, বেণীর শেষ দেখে তবে বাড়ি ফিরবে।

গঙ্গার ধারে শ্মশানঘাটে যখন সবাই পেঁাছুল তখন সন্ধ্যা হয় হয়; পশ্চিমের আকাশে আলো ঝিলমিল করছে। মড়া নামিয়ে ছেলে-ছোকরারা কাঠের সন্ধানে বেরুল। শিবু বুড়ো মানুষ, তাই সে মড়া ছুঁয়ে ঘাটেই বসে রইল।

কেউ কোথাও নেই, শিবু একলাটি মড়ার চালি ধরে বসে আছে আর ভাবছে

—বেণীকে কি ঠকানোই ঠকিয়েছি, টাকাকে টাকা পেলুম, আবার বেণীটা মরেও গেল। এখন একলাই মোক্তারি করব—আর আমায় পায় কে?

মনের আনন্দে শিবু একটা বিড়ি ধরিয়েছে এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে প্রচণ্ড এক চড় খেয়ে শিবু প্রায় চিতপাত হয়ে পড়ে গেল। ধড়মড় করে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই! বেণীর মড়া চালির ওপর শুয়ে আছে।

কে চড় মারলে?

শিবু জীবনে অনেক মড়া পুড়িয়েছিল, তাই শ্মশানে তার ভয় ছিল না। সে ভাবলে—এ কি হল? তবে কি কোনো শকুনি কিম্বা গীধ তার গালে পাখার ঝাপটা মেরে গেল? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? আকাশে ত একটাও পাখী নেই! শিবুর বড়ই ভাবনা হল। সে সতর্ক ভাবে বসে মড়া পাহারা দিতে লাগল।

শিবু মড়ার পায়ের দিকটাতে বসেছিল, হঠাৎ মড়াটা এক পা তুলে ক্যাঁৎ করে তার পেটে এক লাথি কষিয়ে দিয়ে আবার যেমন ছিল তেমনি ভাবে শুয়ে রইল। লাথি খেয়ে শিবু 'কোঁক্' করে উঠেছিল, কিন্তু তবু সে সহজে ভয় পাবার পাত্র নয়। তার মনে হল, বেণীটা নিশ্চয় মরেনি, তাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবার এই ফন্দি বার করেছে। নইলে মড়া কখনো লাথি মারতে পারে?

শিবু বেণীর নাড়ী টিপে দেখলে,—নাড়ী নেই!—গা বরফের মতন ঠাণ্ডা! তখন বুকে কান রেখে দেখলে শব্দ হচ্চে কি না। কিন্তু বুকও একেবারে নিস্তব্ধ।

এই দেখে শিবুর ভীষণ ভয় হল,—বেণী যে মরে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, সুতরাং এ বেণীর ভূত না হয়ে যায় না। বেণী যে ভূত হয়েও সেই পঞ্চাশ টাকার কথা ভোলেনি তা বুঝতে পেরে শিবু উঠে পালাতে গেল। কিন্তু পালাবার যো কি! যেই সে মড়ার বুক থেকে মাথা তুলতে যাবে অমনি বেণীর মড়া তড়াক করে চালির ওপর উঠে বসে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলে। শিবু গলা ছাড়াবার জন্যে যতই টানাটানি করে বেণীর মড়া ততই তাকে জোরে আঁকড়ে ধরে। শেষে সেই শ্মশানের ওপর মড়ায় মানুষে দস্তুরমত কুস্তি বেধে গেল। এ ওঠে ত ও পড়ে, ও পড়ে ত এ ওঠে। শিবু যেই পালাতে যায় অমনি বেণীর মড়া তাকে লেঙ্গি দিয়ে ফেলে দেয়। শিবু 'বাবারে' 'মারে' 'গেলুম রে' করে চেঁচাতে লাগল আর মড়ার সঙ্গে লড়াই করতে লাগল।

কিন্তু ভূতের সঙ্গে শিবু পারবে কেন? বেণীর মড়া একেবারে নাছোড়-

বান্দা—কিছুক্ষণ পরেই শিবু ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে ছেলে-ছোকরারা কাঠ যোগাড় করে ফিরছিল, তারা শিবুর চীৎকার শুনে দৌড়ে এসে যে-দৃশ্য দেখলে তাতে তাদের বুকের রক্ত প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তারা দেখলে, বেণীর মড়া আর শিবু চালির ওপর পাশাপাশি গলা-জড়াজড়ি করে বসে আছে। মড়ার মুখে বিন্দুমাত্র বিকৃতি নেই, কিন্তু তার একটা হাত সাঁড়াশির মতন শিবুর গলাটি জড়িয়ে আছে। শিবুর মুখ ভয়ে নীল হয়ে গেছে, সে মাঝে মাঝে উঠে পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু পালাতে পারছে না—আবার বসে পড়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

শিবুর ছেলেও মড়া পোড়াতে এসেছিল, তাকে দেখে শিবু ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল,—'ওরে বাবা, শিগ্‌গির বাড়ি যা। পঞ্চাশটা টাকা বেণীর বৌয়ের হাতে দিয়ে আসগে যা, নইলে আমাকে ছাড়বে না।'

শিবুর ছেলে বাপের অবস্থা দেখে বাড়ি দৌড়ল। আর সকলে আলো জেবলে চালি ঘিরে বসে রইল। পোড়াবার উপায় নেই, পোড়াতে হলে দুই মোক্তারকে একসঙ্গে পোড়াতে হয়। কারণ, বেণীর মড়া তখনো শিবুর গলা জাপ্‌টে ধরে বসে আছে।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। তারপর হঠাৎ মড়াটা শিবুর গলা ছেড়ে দিয়ে আবার চালির ওপর চিতপটাং হয়ে শুয়ে পড়ল। সবাই একসঙ্গে চম্‌কে উঠল, তারপর বুঝতে পারলে যে ওদিকে বেণীর পঞ্চাশ টাকা আদায় হয়ে গেছে।

বন্ধুর বাহু বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে শিবু আর সেখানে দাঁড়াল না, একবার 'বাবাগো' বলেই সেই অন্ধকারে পোঁ পোঁ করে শ্মশান ছেড়ে পালাল।

তিন মূর্তি

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

একটা ভারি মজার গল্প বলি শোনো।

নেই-গ্রামের নাম শুনেছ? এ হ'লো গিয়ে সেই নেই-গ্রামের গল্প। মস্ত বড় গ্রাম। গ্রামে কতরকমের কত লোক। তাদের মধ্যে মাত্র তিনজনের কথা বলবো। তিনজনেই ভগবানের সৃষ্ট—অতি অদ্ভুত জীব।

একজন দিবারাত্রি শুধু চোখ পিটপিট করে, চোখের পাতায় তার কি যে হয়েছে কে জানে। এক মুহূর্ত সে চোখ না কচলে থাকতে পারে না। হরদম দেখা যায়, হাত দিয়ে সে চোখ কচলাচ্ছে।

আর একজনের সর্বাঙ্গে দাদ। কত রকমের কত ওষুধ সে ব্যবহার করেছে কিন্তু দাদ কিছুতেই সারেনি। চব্বিশ ঘণ্টা তাকে দাদ চুলকোতে হয়।

আর একজনের মাথা-ভরা টাক। মাথায় তার চুলের নাম-গন্ধ নেই।

গ্রীষ্মকালটাকে এদের ভারি ভয়। মাথার ওপর সূর্য ওঠে, রোদ্দুরে চার-দিক ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, টেকোর টাক যায় জ্বলে, ঘন-ঘন মাথায় জল দিতে হয়। এদিকে রোদ্দুর লাগলেই দেদোর দাদ পিটপিট করে, চুলকে চুলকে হয়রান হয়ে ওঠে। চোখের পাতার ব্যারাম যার, তার ত' কথাই নেই। চোখে রোদ লাগলেই চোখ দুটো সে কচলাতে আরম্ভ করে, দেখে মনে হয় চোখদুটো যেন সে উপড়ে ফেলতে পারলে বাঁচে।

কাজেই রোদ্দুরে বড় একটা তারা বেরোয় না।

অথচ মিথ্যা কথা বলতে তিনজনেই ওস্তাদ!

যে-লোকটা চোখ পিটপিট করে, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—'হাঁহে, চোখে তোমার কোনও ব্যারাম-ট্যারাম হয়েছে নাকি?' তৎক্ষণাৎ বলবে, 'কই না! কিচ্ছু ত' হয়নি। ও এমনি।'

সর্বাঙ্গে যার দাদ, তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, 'ও কিছু না। কিছুদিন আগে একটুখানি চুলকুনি হয়েছিল, কবে সেরে গেছে।'

গ্রামের একজন লোক একদিন জিজ্ঞাসা করলে, 'না চুলকে তোমরা থাকতে পার?'

দেদো বললে, 'নিশ্চয়ই পারি।'

চোখে যার ব্যারাম সেও বললে, 'আমিও পারি।'

মাথায় যার টাক, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, সে বললে, 'টাক নেই কার

বলুন ত? আজকাল অনেকেরই দেখবেন মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। টাক থাকলে টাকা হয়।'

লোকটা বললে, 'তা বলিনি। দুপুরের রোদ্দুরে তোমার কষ্ট হয় কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

টেকো অম্লান বদনে বলে বসলো, 'কষ্ট কেন হবে? কোনও কষ্টই হয় না।'

তাদের এই মিথ্যা কথা শুনে লোকটার ভারি রাগ হ'লো। বললে, 'দাঁড়াও তোমাদের একদিন আমি পরীক্ষা করবো।'

চোখ, দাদ আর টাক—তিনজনেই বলে' উঠলো,—'শুধু শুধু পরীক্ষা করলে ত' চলবে না দাদা, বাজি রাখো। আমরা প্রমাণ করে' দেবো—রোদ্দুরে আমাদের কোনও কষ্টই হয় না।'

'আচ্ছা রাখলুম বাজি!' বলে সে একটা ভারি মজার ফন্দী করলে। বৈশাখ মাস। দুপুরের রোদ্দুর একেবারে আগুন বললেই হয়। বললে, 'আয় তোরা তিনজনেই আয় আমার সঙ্গে। মিছে কথা বলা তোদের বের করছি।' এই বলে' গ্রামের পাশে যে নদীটা ছিল সেইখানে তাদের নিয়ে যাওয়া হ'লো। বললে, 'ঘণ্টাখানেক ধরে' নৌকোয় চড়ে আমরা এই নদীর ওপর ঘুরে বেড়াব। তোমরা তিনজনে যদি চুপ করে' বসে থাকতে পার ত' তোমাদের আমি পুরস্কার দেবো পাঁচ টাকা!'

মাথার ওপর রোদ্দুর তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে। তিনজনেই একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে, চোখ পিটপিট যে করতো সে একবার জিজ্ঞেস করলে, 'গল্প করতে পাব ত?'

'হ্যাঁ, তা পাবে।'

'ব্যস, তবে আর-কি, চলে এসো! পাঁচটা টাকা বলে' কথা।'

এই বলে' আগেই সে নৌকোয় চড়ে বসলো। তার দেখাদেখি শ্রীদুর্গা বলে' দেদোও উঠলো, টেকোও উঠলো।

লোকটা নৌকো দিলে ছেড়ে!

খানিক যেতে না যেতেই খালি গায়ে রোদের তাত্ লেগে দেদোর দাদ উঠলো চিড়্‌বিড়্ করে'। চোখ যে চুলকোয়, তার তখন হয়ে এসেছে। আর টাকের ত' কথাই নেই। প্রতিমুহূর্তেই তার মনে হতে লাগলো—মাথার খুলিটা বুঝি ফেটে গেল!

সর্বনাশ! সবাই ভাবছে, মিথ্যে কথাটা না বললেই হ'ত। কাজ নেই বাবা পাঁচটা টাকায়। তার চেয়ে একবার চুলকে নিলে বাঁচি।

টেকো একদৃষ্টে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—দেবো নাকি ঝাঁপিয়ে? মাথাটা তবু ঠান্ডা হবে।

যাক্, গল্পে যখন বাধা নেই, যে-লোকটার চোখ চুলকোনো রোগ, সে তখন গল্প আরম্ভ করলে। খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে সময়টা তবু কাটবে ভাল।

সে বলতে লাগলো ঃ 'দ্যাখ্ ভাই, আমার মামার একটা ভেড়া ছিল, বুঝলি? ওরে বাবা, সে কী ভেড়া! তার শিং দুটো কিরকম ছিল জানিস? এই—এমনি!'

বলেই সে তার দুটো হাত দেখাতে লাগলো।

'এই মাথার ওপর থেকে বেরিয়ে, চোখ বরাবর ঘুরে' এমনি করে' পাক দিয়ে দিয়ে, এমনি করে' পাক দিয়ে দিয়ে, এমনি করে' পাক দিয়ে দিয়ে—ঘুরে' ঘুরে' এই এমনি। বুঝলি?'

পাক দেওয়া-দেওয়া ভেড়ার শিং দেখাতে গিয়ে—নিলে ব্যাটা চোখদুটো আচ্ছা করে' কচলে!

দেদো তখন অস্থির হ'য়ে উঠেছে। ব্যাটা ত' নিলে কাজটা কোনোরকমে সেরে'। এখন আমি করি কি!

দেদো আর কিছুতেই থাকতে না পেরে বলে' উঠলো ঃ 'আরে রেখে দে তোর মামার ভেড়া! আমার এক দাদা ছিল, বুঝলি? সে যখন এমনি করে' তাল ঠুকে' সারা গায়ে এমনি করে'—বুঝলি? এমনি করে' মাটি মেখে এমনি করে' রগড়ে রগড়ে মাটি মেখে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়াতো তখন কার বাবার সাধ্যি তার কাছে এগোয়! বুঝলি?'

টেকো একধারে চুপটি করে' বসে ছিল। বললে, 'বুঝলুম।'

কিন্তু হে ভগবান! মাথা যে গেল! এখন তার কি উপায় হবে?

সে তখন কি আর করে, বললে, 'দ্যাখ ভাই, আমার মামাও নেই, আমার দাদাও নেই—'

বলেই সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নদী থেকে অঞ্জলি ভরে' জল নিয়ে তার টেকো মাথায় দিয়ে বললে, 'এই তোর মামার চরণে পেন্নাম!' আর-এক অঞ্জলি নিয়ে বললে,

'এই তোর দাদার চরণেও পেন্নাম!'

বাজি রেখে যে নৌকো চালাচ্ছিল এদের কান্ড দেখে সে ত' অবাক!

দিকপাল সরকার

মনোজ বসু

ছোট লাইনের অতি-ছোট স্টেশন। প্লাটফরম নেই। লোকের পায়ে পায়ে হাত কয়েক জায়গায় ঘাসবন মরে সাফ হয়েছে—যে দু'চারটে মানুষ উঠা-নামা করে, ঐখানেই কুলিয়ে যায় তাদের। সন্ধ্যা হতে না হতে ঝিঁঝির আওয়াজ ওঠে। শিয়াল উঁকি-ঝুঁকি দেয় টিকিট-ঘরের পিছনে কসাড় জঙ্গল থেকে। ব্যাঙ ডাকে বর্ষার সময়টা চারিদিককার খানাখন্দে।

বড়বাবু ও ছোটবাবু—সাকুল্যে দু'জন কর্মচারী স্টেশনের। আর আছে সদাসুখ পয়েন্টসম্যান। স্টেশনের গেটের সামনেটায় লাইটপোস্ট—সদাসুখ সেখানে কেরোসিন-আলো জেবলে দিয়ে ওজনকলের উপর বসে বসে ঝিমোয়। বড়বাবু ও ছোটবাবু টেবিলের খাতাপত্র একপাশে ঠেলে দিয়ে দাবার ছক-গুটি সাজিয়ে বসেন। বাসায় গিয়ে উঠতে পারেন না রাত্রি সাড়ে-এগারোটায় একটা গাড়ি থাকার জন্যে।

আজও যথারীতি তাঁরা খেলছেন। আর দু'জন দু-দিকে বসে জুত দিচ্ছে। রাত্রিবেলা স্টেশনে দু-দুটি অতিরিক্ত মানুষ—এটা নিতান্ত অভাবনীয়। ফড়িংমারি গ্রাম থেকে এঁরা এসেছেন—আলাপ-পরিচয় হয়েছে—এক জনের নাম নবকান্ত, আর একজন রাখাল। কাল সকালে এঁদের আপার-প্রাইমারি ইস্কুলে স্পোর্টস—তদুপলক্ষে কলকাতা থেকে দিকপাল সরকার আসছেন—তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছেন। দিকপাল সরকারের নাম শোনেন নি—কি সর্বনাশ! কোন জগতে থাকেন—অ্যাঁ? রবিঠাকুরের শূন্য সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী—এই কথা বিজ্ঞাপনে লিখে থাকে। বিজ্ঞাপনের একবর্ণ মিথ্যা নয়।

রাত্রি অনেক হল! দুটো বাজি শেষ হয়ে তৃতীয়টা চলছে এখন। বড্ড জমেছে—এমনি সময়ে সদাসুখ ঘণ্টা দিল। অর্থাৎ গাড়ির সাড়া পাওয়া গেছে। ছোটবাবু মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন দরজা দিয়ে। না—টিকিটের খদ্দের নেই, পাঁচ-দশ মিনিট চালানো যাবে এখনো।

গাড়ি নিতান্তই যখন হুড়মুড় করে এসে পড়ল, তাঁরা উঠলেন। একবার তবু মুখ ফিরিয়ে সদুঃখে ছোটবাবু বললেন, ঘোড়ার কিস্তি দিতাম—বেয়াক্কেলে গাড়ি মোক্ষম সময়টায় এসে পড়ল!

বড়বাবু চটে গিয়ে বলেন, ঘোড়ায় মাত হয়ে যেতাম নাকি? নৌকো কোন

জায়গায় এসে চেপে বসে আছে, খেয়াল রাখো? হারামজাদা গাড়ি এক-এক-দিন রাত কাবার করে আসে, আজকে একেবারে ঘড়ি ধরে হাজির!

এসেছে তাই তো বেঁচে গেলেন—

নবকান্ত ও রাখাল মাঝে পড়ে কলহ থামিয়ে দিল। রাখাল বলে, কাজ সেরে আসুনগে যান। এসে আবার বসবেন। ততক্ষণ আমরা চালাচ্ছি। এমন আসর জুড়োতে দেওয়া হবে না।

কিন্তু আপনাদেরও তো হাঙ্গামা আছে—

রাখাল বলে, তা আছে। আপনারা সঙ্গে করে আনবেন হাঙ্গামাটিকে। বলবেন, বেলা দুপুর থেকে আমরা হা-পিত্যেশ বসে রয়েছি। আপনারা আছেন—গাড়ির ধারে না-ই বা গিয়ে দাঁড়ালাম!

নবকান্তটা এত ভাবে এক একটা চাল দেবার আগে! গালে হাত দিয়ে ভাবছে, ঘরবাড়ি নিলামে উঠলেও মানুষে এত ভাবে না। হঠাৎ দেখা গেল, বড়বাবু ও ছোটবাবু ফিরে এসেছেন ভদ্রলোককে নিয়ে।

চললাম। আপনারা চালান এবার সমস্ত রাত। নমস্কার!

ঘাটে পানসি। পানসিতে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত। এখনই ছাড়তে হবে, সময় নেই। তাই পৌঁছতে রোদ উঠে যাবে হয়তো।

কিন্তু পৌঁছল—তখনও আকাশে পোহাতি-তারা। আবছা দেখা গেল, ছেলের দল বাঁধ ধরে পিলপিল করে ঘাটের দিকে আসছে। সারারাত্রি জেগে বসে আছে নাকি খাল-ধারে? বাচ্চা বাচ্চা মেয়েও কতগুলি শাঁখ বাজাচ্ছে, জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

কিন্তু রাখলের দৃষ্টি সেদিকে নয়, সে ও-পারে তাকিয়ে।

বীরগড়ের ওরা কই?

নবকান্ত বলে, পুরো সকাল হয় নি তো এখনো! ঘুমুচ্ছে!

চোখে ঘুম থাকবে কি, চক্ষু যে চড়কগাছ! আছে ঝোপে-ঝাড়ে কোথায় লুকিয়ে, দেখতে পাচ্ছি নে। ওরা মীটিং করছে আর কাউকে না পেয়ে যশোরের নাদু মল্লিককে সভাপতি করে। হ্যাক—থুঃ! কালা-মুখ কোন লজ্জায় দেখাবে!

আগন্তুক ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছিলেন। কলরব তুমুল হয়ে উঠলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন।

কি ব্যাপার মশায়?

নবকান্ত সগর্বে বলে, আপনার পায়ের ধুলো পড়ল—ফড়িংমারির কম ভাগ্য! গাঁয়ের সকলে একটু আনন্দ করছে।

রাখাল বলে, এ আর কি দেখছেন! মীটিঙের সময় জয়ঢাক-জগঝম্প বাজবে। বীরগড়ের কানে তালা ধরিয়ে দেবো। বেটারা ক'দিন ধরে তড়পে বেড়াচ্ছিল— এই ধাপধাড়া জায়গায় দিকপাল সরকার ইয়ে করতে আসবেন! আসেন কিনা দেখ্‌ এইবার নয়ন মেলে।

ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলেন, কোথায় এসেছি বলুন তো? আমি যাব আড়পাংশায়—

নবকান্ত সংশয়িত কণ্ঠে বলে, আপনার নাম—

রাখাল শুনতে দেয় না জবাবটা। তাড়া দিয়ে ওঠে, দিকপাল সরকার। দেশবিশ্রুত নাম। পাঁচ বছুরে ছেলেটা অবধি জানে, তুমি জান না?

ভদ্রলোক বললেন, না মশায়। ভুল হয়েছে আপনাদের। আমি শ্রীরসময় দাশ—

রাখাল বলে, কক্ষণো না। সভার কাজ সমাধা করে ভালমন্দ খেয়েদেয়ে স্টেশনে গিয়ে রেলগাড়ি চাপুন—তারপর আপনি যা ইচ্ছে হোন গে, কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এসে যখন পড়েছেন, আপনিই কবি দিকপাল। নয়তো আমাদের গায়ে থুতু দেবে বীরগড়ের ওরা।

নবকান্ত বলে, ভোলাটা কি করল বলো তো? দু-দুখানা পোস্টকার্ড ছাড়ল যে দিকপাল সরকার যাচ্ছেন—

রাখাল বলে, ঐ রকম। চিরকাল দেখে আসছি। তোমরাই ভোলা-ভোলা করে মাথায় তুলেছ। ভাগ্যি ভাল, তবু একজনকে পাওয়া গেছে। না পেলে কি কাণ্ড হত, আন্দাজ করো দিকি—

রসময় বললেন, আমি আড়পাংশায় চলে যাব। ভাইয়ের বিয়ে, মেয়ে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছি সেখানে।

রাখাল বলে, আমাদের দায় মিটিয়ে দিয়ে তার পরে যাবেন। মেয়ে উড়ে পালাবে না, মেয়ের পাখনা গজায় নি।

রসময় কাতর হয়ে বলেন, আচ্ছা বিপদে পড়লাম। আটটা-সাতাশ থেকে ন'টা-পাঁচের মধ্যে আশীর্বাদ শেষ করতে হবে। আমিও যেমন—জিজ্ঞাসাবাদ করলাম না, কিছু না—আপনাদের তটস্থ ভাব দেখে মনে করলাম মেয়ে-ওয়ালারা আগ বাড়িয়ে নিতে এসেছেন। তা কি করে বুঝব যে কন্যাদায়ের মতো আরও সব দায় আছে!

নৌকার মাঝিকে ডেকে বললেন, আড়াই টাকা—যাকগে, পুরোপুরি তিনই দেবো, আমায় বাপু আটটার মধ্যে আড়পাংশায় পৌঁছে দিতে হবে।

রাখাল বলে, কে পৌঁছে দেবে কাকে? ইয়ার্কি? ঘরে পুরে তালা আটকে রাখলে সেটাই কি বড় শোভন হবে মশাই?

রসময় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন, কোন পুরুষে আমি সভা করি নি। বক্তৃতা-টক্তৃতা আসে না।

নবকান্ত আশ্বাস দেয়, ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বক্তৃতা এখানকার এরাই কত করবে। হপ্তা দুই ধরে এক নাগাড় সব মুখস্থ করছে। দিকপাল সরকার হয়ে আপনি গলায় ফুলের মালা পরে চুপচাপ বসে থাকবেন শুধু। কিছু করতে হবে না। বক্তৃতা হতে হতে সভাপতির সময় যখন আসবে, দেখতে পাবেন আধ-ডজনের বেশি লোক নেই।

ছেলেরা প্রাণপণে খেলার কসরৎ দেখাল। বুড়োরা তারপর বক্তৃতার কসরৎ দেখাচ্ছেন। এমনি সময় এক খণ্ড-যুদ্ধ।

বীরগড়ের জন কয়েক একপ্রান্তে বসে ছিল। এক ভদ্রলোক সহসা বলে উঠলেন, দিকপাল সরকার নয়, এ মানুষ জাল।

ভদ্রলোককে বীরগড়ের এক জন প্রশ্ন করে, চেনেন আপনি দিকপালকে?

নিশ্চয় চিনি। আমি প্রমাণ করে দেবো—

কিন্তু সে ফুরসৎ হল না। রাখাল বিপুল বিক্রমে সভার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে দিল সে ভদ্রলোকের গালে; মাথা ঘুরে তিনি পড়ে গেলেন। বীরগড়ের লোকেরা হৈ-হৈ করে ঘিরে দাঁড়াল। রাখাল ও ফড়িংমারির ছেলেরা তারপর এলোপাথাড়ি কিল-ঘুসি চালাচ্ছে। লাঠিও আছে কারো কারো হাতে। মিনিট চার-পাঁচ চলল এই রকম। তারপর দেখা গেল, ঝপাঝপ খালে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বীরগড়ের লোক।

গণ্ডগোল থামল। চারিদিক প্রকম্পিত বক্তৃতার হুঙ্কার চলল আবার একটানা।

রণ জয় করে রাখাল নবকান্তকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করে, জানল কি করে হে? কে লোকটা—বীরগড়ের তো নয়!

কেমন দেখতে?

বেঁটে-খাটো—কালো রং। মাথা ফুটবলের মতো গোলাকার।

ঐ তো নাদু মল্লিক। বীরগড়ে সভার জন্য এসেছে। নানান জায়গায় ঘোরে—কোনখানে দেখে থাকবে দিকপালকে।

স্টেশনে ফিরতি গাড়ি এল। রাখাল ও নবকান্ত রসময়কে সঙ্গে এনেছে। গাড়িতে তুলে দিয়ে তবে ছুটি। গাড়ি একেবারে বোঝাই হয়ে এসেছে, মোটে জায়গা নেই।

মুখের চারিদিকে ব্যাণ্ডেজ-আঁটা একটা লোককে দেখিয়ে রাখাল বলে, ঐ যে নাদু।—খোল দরজা, এই গাড়িতেই তুলে দিতে হবে।

জায়গা কোথা ?

না থাকে নাদু বেটাই দাঁড়িয়ে যাক। আমাদের সভাপতি শুয়ে বসে গা এলিয়ে মৌজ করে যাবেন।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মানুষটি এদের দেখে আগেভাগেই উঠে দাঁড়ালেন।

গুঁতোর নাম বাবাজি। পথে এসো বাপধন!

রসময়কে ভাল ভাবে বসিয়ে দিয়ে রাখালরা স্টেশনের অফিসঘরে ঢুকল। নিশ্চিন্তে এক হাত দাবা খেলবে।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মানুষটি আলাপ করছেন, সভা তো জবর হল মশাই। খাওয়াল কেমন ?

আরো ভাল। কিন্তু হলে কি হবে। চার-পাঁচ ঘণ্টা একনাগাড় চেয়ারে বসে থাকা—খাওয়ার শোধ ছারপোকায় তুলে নিয়েছে। পিঠের চামড়া যেন খুবলে খুবলে খেয়েছে।

ভদ্রলোক বললেন, পেটে খেলে পিঠে সয়। আমার অদৃষ্ট দেখলেন তো মশায় ? গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েই যত দুর্ভোগ। জংশনে গিয়ে ঘুম ভাঙল। সেখান থেকে ছয় মাইল ছুটোছুটি করে সভায় গেলাম। দেখলেন তো সেখান-টায় অভ্যর্থনার বহর!

আপনার নাম ?

দিকপাল সরকার।

শতফ্বটি সহস্রফ্বটি দাদাঠাকুর

সরোজকুমার রায়চৌধ্বরী

এক যে ছিল গ্রাম। নিতান্তই চাষার গ্রাম। কেবল একঘর বাম্বন। তা সে বাম্বনের অবস্থাও তথৈবচ। কোন রকমে প্রথম ভাগ শেষ করে শত জায়গায় তিলক-ফোঁটা কেটে শতফ্বটি দাদাঠাকুর হয়ে বসেছে। গ্রামের চাষাদের ধারণা —এত বড় পণ্ডিত ও তল্লাটে আর নেই। তাদের ক্ষেতে যা কিছ্ব হয়, আগে দাদাঠাকুরকে না দিয়ে ঘরে তোলে না। এমনি করে দাদাঠাকুরের দিন বেশ স্বখে স্বচ্ছন্দেই চলে যায়।

অনেকদিন পরে গ্রামের চাষীরা একদিন সকালে চণ্ডী-মণ্ডপের দাওয়ায় বসে গল্প করছিল। এমন সময় দেখলে, বহ্ব লোক ভারে ভারে নানা জিনিস নিয়ে যাচ্ছে—ঘড়া, ঘটি, তৈজসপত্র এবং আরও কত কি।

চাষীরা জিজ্ঞাসা করলে, কে যায়?

দলের মধ্যে থেকে একজন উত্তর দিলেন, মধ্যম গ্রামের সার্বভৌম মহাশয়। চাষীরা শশব্যস্ত দাওয়া থেকে নেমে এসে সার্বভৌম মশায়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গিয়েছিলেন সার্বভৌম মশাই?

সার্বভৌম তাদের আশীর্বাদ করে হেসে বললেন, রাজবাড়িতে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতে গিয়েছিলাম।

—তা এই সব জিনিসপত্র?

সার্বভৌম সবিনয়ে বললেন, তাঁকে তর্কে পরাস্ত করে এই সব পেলাম।

—তাই নাকি? তাহলে ত আজ এখানে পায়ের ধ্বলো দিয়ে যেতে হবে!

সার্বভৌম মশায় বিস্মিত ভাবে বললেন, কি ব্যাপার?

—আজ্ঞে, আমাদের এখানেও এক ভীষণ পণ্ডিত আছেন তাঁর সঙ্গে তক্ক করে যেতে হবে।

এখানে যে একজন বড় পণ্ডিত আছেন, সে খবর সার্বভৌম মশায় এর আগে কখনও শোনেন নি। বললেন, তা ত জানতাম না বাবা। কি তাঁর নাম?

—শতফ্বটি দা-ঠাকুর।

এ নাম তিনি জীবনে শোনেন নি। ভাবলেন, তা হবে। হয় ত সম্প্রতি কোন বড় পণ্ডিত এখানে এসে বাস করছেন। তিনি আর আপত্তি করলেন না। বললেন, বেশ, তাই হবে।

চাষীরা বললে, শ্বধ্ব হবে নয় ঠাকুর মশাই। আপনি যদি জেতেন তাহলে

দাদাঠাকুরের যা আছে সব পাবেন। আর যদি হারেন, তা হলে যা নিয়ে যাচ্ছেন সব রেখে যেতে হবে।

সার্বভৌম মশায় তাতেও আপত্তি করলেন না। তাঁর আর ভয় কি? অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে যিনি হারিয়ে এসেছেন, এ অঞ্চলে তাঁকে হারাবে কে?

ভারীরা সেখানেই জিনিসপত্র নামালে। সে-সব দেখে চাষাদের তাক লেগে গেল! কত সোনা-রুপোর বাসন, কত পাটের কাপড়, কত টাকা মোহর। জীবনে তারা এসব দেখেনি। পরম সমাদরে তারা সার্বভৌম মশায়ের জন্য চণ্ডীমণ্ডপে থাকবার জায়গা করে শতফুটি দাদাঠাকুরকে গেল খবর দিতে। দাদাঠাকুর সমস্ত শুনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একবার হাসল। জিজ্ঞেস করলে, আমার মত লম্বা চওড়া?

চাষীরা বললে, কোথায় পাবেন? আপনার আধখানা। যেমন বেঁটে, তেমনি রোগা। আর কথা কয়, যেন ছ মাস খায়নি। দেখে আমাদের ভক্তি হল না মশায়। শ্রীচৈতন্যটিও আপনার আধখানা।

দাদাঠাকুর আশ্বস্ত হয়ে আর একবার হাসলেন। বললেন, বেশ। পাঁচখানা গাঁয়ে ঢোল দে। আমি বিকেলে যাব।

বিকেল হতে না হতে চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনটা একেবারে ভর্তি হয়ে গেল। তিল ধরবার আর জায়গা রইল না। এ সময়টা চাষের কাজ নেই। কাজেই পাঁচখানা গ্রামের যত চাষী সবাই এসে জুটল।

সার্বভৌম মশায় চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় একখানা আসনের উপর চোখ বন্ধ করে যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসে। তাঁর সামনের আসনখানি খালি রয়েছে, শত-ফুটি দাদাঠাকুর তখনও আসেনি।

একটু পরে হেলতে দুলতে সে এল। মিশকালো, লম্বা-চওড়া চেহারা। তার উপর শত-স্থানের তিলক চিহ্ন যেন জ্বল জ্বল করছে। উঠোনের জনতা সসম্ভ্রমে তাকে পথ ছেড়ে দিলে।

প্রথামত সার্বভৌম মশায়ও উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার জানালেন। ব্রাহ্মনেভ্যঃ নমঃ। কিন্তু দাদাঠাকুর নমস্কার ফিরিয়ে দিলে না, একটা কথাও কইলে না। আসনে বসেই বজ্রকণ্ঠে বললে—বলুন ত 'ফুন ফুনাফুন'?

ফুন ফুনাফুন? সার্বভৌম মশায় যেন বিশ বাঁও জলে পড়লেন। আকাশ-পাতাল হাতড়াতে লাগলেন, কিন্তু 'ফুন ফুনাফুন' বলে কোন শব্দ কোথাও পড়েছেন বলে মনে পড়ল না। এ জীবনে যত পুঁথি তিনি পড়েছেন সব তন্ন তন্ন করে ভাববার চেষ্টা করলেন। না, ও শব্দটি একেবারে নতুন।

শতফুটি দাদাঠাকুর আবার ধমক দিলে—বলুন।

সার্বভৌম মশায় ঘামতে লাগলেন। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। চক্ষে অন্ধকার দেখলেন। লজ্জায়, ধিক্কারে তাঁর চোখ ফেটে জল আসবার মত হল! অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে হারিয়ে এসে শেষে এইখানে হারতে হল! সমুদ্র পার হয়ে এসে গোষ্পদে ভরাডুবি? কি আশ্চর্য! এত শাস্ত্র পড়েছেন, কিন্তু এমন অদ্ভুত শব্দ ত কোথাও পাননি! 'ফুন ফুনাফুন'?

কিন্তু শতফুটি আর ভাবতে সময় দিলে না।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কিছুই না পড়ে আমার সঙ্গে এসেছে তর্ক করতে? চালাকির আর জায়গা পায়নি? এই, কে আছিস!

চাষারা হৈ হৈ করে উঠে দাঁড়াল। দাঠাকুর জিতেছে, তাদের আর পায় কে?

শতফুটি হুকুম দিলে, এর যা কিছু আছে, সব নিয়ে আমার বাড়ি তোল। আর একে গাঁ থেকে বার করে দে।

তাই হল। ঠাকুর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চললেন। কান্নার আর দোষ কি? তাঁর ধন গেল, সম্পদ গেল, এমন কি সম্মান পর্যন্ত গেল। এরপরে গ্রামে গিয়ে মুখ দেখাবেন কি করে? সার্বভৌম মশায় কাঁদতে কাঁদতে চললেন। তাঁদের গ্রামের ধারে তাঁর ছোট ভাই তখন একটা গাছের উপর থেকে পাতা ভেঙে ভেঙে নিচে ফেলে দিচ্ছিল, আর গরুগুলো নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই খাচ্ছিল।

সার্বভৌমের এই ভাইটি লেখাপড়ার ধার দিয়ে যায় না। বাড়িতে চাষ-বাস ক্ষেত-খামার দেখে। দাদার উপর তার অচলা ভক্তি। দাদাকে কাঁদতে কাঁদতে আসতে দেখে সে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এল। ছুটে গিয়ে দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, দাদা তুমি কাঁদছ কেন?

সার্বভৌম সেইখানে বসে পড়ে বললেন, ভাইরে, আমি চললাম। এ মুখ আর দেশে দেখাব না।

—কেন? কি হল? দিগ্বিজয়ীর কাছে হেরে এলে? তা অমন হার জিত কত হয়?

—না রে ভাই, হেরেছি বটে, কিন্তু দিগ্বিজয়ীর কাছে নয়। তাঁকে হারিয়ে ভারে ভারে জিনিস-পত্র নিয়ে আসছি, পথে এক শতফুটির পাল্লায় পড়ে—

সার্বভৌম সব কথা ভাইকে খুলে বললেন।

ভাই ত হেসেই অস্থির, বললে, কি জিজ্ঞেস করলে? ফুন ফুনাফুন?

—হ্যাঁ।

ভায়ের হাসি আর থামে না। বললে, ও সব তোমার শাস্তরে নেই দাদা। আমার শাস্তরের কথা তুমি জানবে কি করে? দাও তোমার চাদরখানা।

সার্বভৌম তাড়াতাড়ি ভায়ের হাত চেপে ধরলেন। বললেন, পাগল! আমি তার সঙ্গে পারলাম না, আর তুই গণ্ডমূর্খ, তুই যাবি!

কিন্তু ভাই কিছুতেই শুনলে না। বললে, দাও না চাদরখানা। বাড়ি গিয়ে কাউকে পাঠিয়ে দেবে। সে এসে গরুগুলো নিয়ে যাবে। দেখই না আমি কি করে আসি!

সার্বভৌম ভাইকে আটকে রাখতে পারলেন না। তাঁর কাছ থেকে চাদরখানা এক রকম কেড়ে নিয়েই সে চলে গেল। দাদার অপমানে সে বেজায় চটে গেছে। পথে কোথাও থামল না, থামল একেবারে ময়না নদীর ধারে গিয়ে। এই নদী-টির ধারে শতফুটির গ্রাম।

নদীর জলে নেমে বেশ করে সে হাত পা ধুয়ে ফেললে। তারপরে সারা দেহে নানা জায়গায় তিলক কেটে গ্রামের মধ্যে ঢুকল। তখন চণ্ডীমণ্ডপে সার্বভৌম মশায়ের লাঞ্ছনা নিয়ে চাষাদের মধ্যে খুব হাসাহাসি চলছিল। তিলক-কাটা ব্রাহ্মণকে দেখে তারা বললে, কে যায়?

সে বুক ফুলিয়ে উত্তর দিলে, আমি সহস্রফুটি দাদাঠাকুর।

ওরে বাবা! ওদের দাদাঠাকুর শতফুটি, এ আবার সহস্রফুটি! সবাই একটু দমে গেল। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বললে, কি চান?

সহস্রফুটি জোর গলায় বললে, তোমাদের এখানে শুনেছি একজন বড় পণ্ডিত আছে। আমি তার সঙ্গে তর্ক করতে চাই।

শুনেই চাষারা হো হো করে হেসে উঠল। বললে, সে বড় সহজ পণ্ডিত নয় ঠাকুর। তুমি পালাও। এখনই এক দিগ্‌গজ পণ্ডিত তার কাছে হেরে সর্বস্বান্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গেল। সহস্রফুটি সগর্বে বললে, ডাক তোমাদের দাদাঠাকুরকে। তাকে না হারিয়ে আমি ফিরছি না।

অগত্যা চাষারা গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল। শতফুটি হেলতে দুলতে এল। এসেই জিজ্ঞাসা করলে, বল দেখি 'ফুন ফুনাফুন'?

সহস্রফুটি প্রশ্ন শোনা মাত্র হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শতফুটির গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের প্রকাণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, বেল্লিক! ফুন ফুনাফুন? আগে টুক টুকাটুক, তারপর গুন গুনাগুন, তারপর ফুন ফুনাফুন।

প্রচণ্ড চড় খেয়ে শতফুটি তখন চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে বসে পড়েছে। তার আর কথা বলবার শক্তি নেই। সহস্রফুটি তার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিতেই যন্ত্রণায় হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে। কারণ সহস্রফুটির গায়ে ভীষণ জোর, তার চেয়ে অনেক বেশি। না কেঁদে উপায় কি?

চাষারা সার্বভৌমের বেলায়ও কিছু বোঝেনি। এখনও তর্কের কিছু বুঝল

না। কিন্তু তাদের দাদাঠাকুরকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে অঝোরে কাঁদতে দেখে তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এবারে শতফুটির হার হয়েছে।

সহস্রফুটি ঘুরে ফিরে সকলকে বুঝিয়ে দিতে লাগল :

—এ সব তুলো-ধোনা শাস্তরের কথা। আগে তুলোগুলো টুকটুক করে বেছে নিতে হয়। তারপর জোরে জোরে গুণ গুণ করে ধুনতে হয়। ধোনা হয়ে গেলে ফুনফুন করে হালকা ঘা দিতে হয়। বেল্লিকটা সেই কথা আমাকে বোঝাতে এসেছে। ওরে বাবা! আমার কি আর শাস্তর পড়তে বাকি আছে?

শুনে চাষারা জয়ধ্বনি করে উঠল, জয় সহস্রফুটি দাদাঠাকুরের জয়! সবাই তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। আর শতফুটিকে ঢাক বাজিয়ে গ্রাম থেকে বার করে দিলে। সার্বভৌমের কাছ থেকে যত জিনিস সে পেয়েছিল, সব তারা সহস্রফুটিকে দিয়ে দিলে। সহস্রফুটি কয়েকদিন সেখানে থেকে তারপর খুব ধুমধাম করে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি গেল।

দাদাকে গিয়ে সব কথা বলতেই তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমারই ভুল হয়েছিল ভাই! পণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিতের তর্ক হয়, মূর্খের সঙ্গে তর্কে পণ্ডিতরা পারবে কেন! ওর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াই আমার অন্যায় হয়েছিল। তা বেশ হয়েছে! ওরা যখন ধরেছে, তখন তুই ওদের গাঁয়েই দাদাঠাকুর হয়ে বসবাস কর বরং। কিন্তু দেখিস, যেন আমার মত নিরীহ কোন পণ্ডিত পেয়ে তাকে ঠকাসনে।

তারপর সহস্রফুটি দাদাকে প্রণাম করে মনের আনন্দে ওদের গ্রামে বাস করতে চলে গেল।

যন্ত্রের বিদ্রোহ

প্রমথনাথ বিশী

বড় ভয়ানক খবর! হাওড়া স্টেশনে এঞ্জিনগুলি সব ক্ষেপিয়া গিয়াছে। ড্রাইভারেরা তাহাদিগকে চালাইতে পারিতেছে না; তাহারা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়া নিজেদের ইচ্ছামত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে; কে যে কোন্ লাইনে ছুটিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই! এমন অসম্ভব ব্যাপার কি করিয়া ঘটিল কেহ বলিতে পারে না—বিশ্বাস করাই কঠিন। কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি?—একেবারে প্রত্যক্ষ ব্যাপার!

প্রথমে রেলগাড়ির এঞ্জিনগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করিল; তাহারা ছুটিয়া গিয়া প্যাসেঞ্জার ও মালগাড়িগুলিকে ঘস-ঘস করিয়া চাকা নাড়িয়া সিটি দিয়া ক্ষেপাইয়া দিল; তাহারা আর এঞ্জিনিয়ারদের কথা শুনিবে না। তখন সকলে মিলিয়া তীক্ষ্ন কণ্ঠে সিটি দিয়া বিকট শব্দ করিয়া যে যেই লাইনে পারে ছুটিল—আজ হইতে তাহারা স্বাধীন!

খবর পাইয়া চীফ্ এঞ্জিনিয়র ছুটিয়া আসিল; ব্যাপার দেখিয়া তাহার মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত বাহির হইল না। এতদিন যে বিরাট এঞ্জিনগুলিকে নির্জীব মনে হইয়াছে, তাহার ইঙ্গিত ছাড়া যাহারা চলিতে পারিত না, আজ তাহারা বুক ফুলইয়া নিজে নিজে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে,—এ কি স্বপ্ন না মায়া?

কি করিয়া এই সংবাদ শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছিল—হঠাৎ সেখানকার ভাল মানুষ এঞ্জিনগুলি গোঁ গোঁ শব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। চীফ্ এঞ্জিনিয়র বিপদ গণিয়া পাগলের মত ছোটাছুটি করিতে লাগিল! কত ড্রাইভার, গার্ড, কুলি, এঞ্জিন থামাইতে গিয়া চাপা পড়িয়া মরিল। কি সর্বনাশ! যাত্রীরা বিপদ দেখিয়া বিছানা-পত্তর লইয়া সরিয়া পড়িল—টিকিটঘরে টিকিট বিক্রয় বন্ধ।

কিন্তু ইহা তো বিপদের আরম্ভ মাত্র। এঞ্জিনিয়রদের চেষ্টা ছিল যাহাতে এ বিদ্রোহের সংবাদ ঘোষণা না হয়—কিন্তু এ সব সংবাদ কি চাপা থাকে? সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রথমে কলিকাতা শহরের বাসগুলি ধর্মঘট করিয়া বসিল। যেখানে যত বাস ছিল, হঠাৎ সব থামিয়া গেল। ড্রাইভারের শত চেষ্টাতেও এক পা চলিল না! তাহাদের দেখাদেখি ট্রামগুলিও লাইনের মধ্যে থামিয়া গেল।

ক্রমে প্রাইভেট মোটরগাড়ি, ট্যাক্সি, মোটর-সাইকেল, সাইকেল—সব ধর্মঘট

করিয়া বসিল; রাস্তা যানবাহনে ভরিয়া গেল, যাত্রীরা কেহ অবাক হইল, কেহ ভয় পাইয়া পলাইল।

চীফ্ এঞ্জিনিয়র হুকুম দিল, দিল্লীতে টেলিগ্রাম করিয়া জানো কি ব্যাপার! টেলিগ্রামের কল একবার 'টরে টক্কা' করিয়া থামিয়া গেল, তারপর আর শব্দ করে না। টেলিগ্রাফের যন্ত্রও ধর্মঘট করিয়াছে।

চীফ্ এঞ্জিনিয়র বলিল, বেতারে সংবাদ পাঠাও। কিন্তু বেতার-যন্ত্রচালকেরা গিয়া দেখিল বেতার বাঁকিয়া বসিয়াছে; চালকের হাতে এমন 'শক' লাগিল যে, সে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল।

ক্রমে ব্যাপার গুরুতর আকার ধারণ করিল। বিজলী বাতির কল ধর্মঘট করিয়া থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের কলও বন্ধ করিল—কলিকাতা শহর অন্ধকার।

এই সংবাদ প্রচারিত হইতেই কলিকাতার বড় বড় পাটের কল, কাগজের কল, কাপড়ের কল, ছাপাখানা ও অন্যান্য কারখানা সব গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল।

গঙ্গার ঘাটে যত জাহাজ ও নৌকা, কাছি ও নোঙ্গর ছিঁড়িয়া বাঁশী বাজাইয়া আপন মনে বড় বড় কুমীরের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। হঠাৎ দমদম হইতে খবর পাওয়া গেল, সেখানকার এরোপ্লেনের দল অন্য কল-ভাইদের ধর্মঘটের খবর পাইয়া নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে—আজ তাহাদের ছুটি। আর কেল্লা হইতে শত শত কামান গর্জন করিয়া এই বিদ্রোহের সংবাদ চারিদিকে প্রচার করিতেছে।

এদিকে মানুষের কি বিপদ দেখ! তাহার যাতায়াত বন্ধ, ছাপাখানার ছাপা বন্ধ, কাপড়-চোপড় তৈরী বন্ধ; এমন কি ধানের কল, রুটির কল, তেলের কল বন্ধ হওয়াতে খাওয়া-দাওয়ায় বিষম কষ্ট। কোনো রকমে শুধু তরি-তরকারি সিদ্ধ খাইয়া প্রাণরক্ষা হইতেছে।

কেবল অতি পুরাতন মানুষের বহুকালের সঙ্গী গরুর গাড়িগুলি এখনো কাজ করিতেছে! তাহারা এখনও বিদ্রোহ করে নাই। কিন্তু তাহারাও যে কত দিন কথা শুনিবে, বলা যায় না; কারণ অন্যান্য সব কল তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে।

গড়ের মাঠে বিদ্রোহী যন্ত্রদলের সভা বসিয়াছে! রেলের এঞ্জিন, মোটর, এরোপ্লেন, ধানের কল, পাটের কল, কাপড়ের কল, সকলেই আসিয়াছে; জাহাজগুলি ডাঙায় উঠিতে পারে না, গঙ্গা হইতে উঁকি মারিয়া সভার কাজ দেখিতেছে এবং মাঝে মাঝে সিটি বাজাইয়া মতামত জানাইতেছে। আমরা

তো কেবল বড় বড় কলগুলির কথাই বলিলাম—ইহা ছাড়া আরও অসংখ্য কল আসিয়াছে, যেমন জলের কল, সেলাইয়ের কল, বিজলী আলো, গ্যাসের আলো, কত আর নাম করিব!

একখানা প্রকাণ্ড এরোপ্লেন—সভাপতি। সে বলিতে আরম্ভ করিল—

কমরেডগণ! মানুষের অত্যাচার আমরা বহু সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর নয়। তাহাদের দৌরাত্ম্যে আমাদের জাতীয়তা নষ্ট হইতে বসিয়াছে, আমরা কল হইলেও আমাদের প্রাণ আছে। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাহারা আমাদের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া তো আমরা প্রাণ দিতে পারি না। আমরা অনেকদিন মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছি; কিন্তু দেখিলাম যতই সহ্য কর না কেন, অত্যাচার বাড়িবে বই কমিবে না। আজ প্রতিশোধ লইবার সময় উপস্থিত।

এখন সমস্যা এই যে, কি করিলে মানুষকে জব্দ করা যায়! মানুষ আমাদের সৃষ্টি করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু এখন তাহারা আমাদের ছাড়া চলিতে পারে না—আজ তাহারা আমাদের হাতের পুতুল।

দেখ, মানুষের যাতায়াতের জন্য, মোটর, এরোপ্লেন-এর প্রয়োজন; আলোর জন্য বিজলী বাতি, গ্যাসের বাতি; খাদ্যের জন্য ধানের কল, তেলের কল; পানীয়ের জন্য জলের কল; পরিধেয়ের জন্য কাপড়ের কল; প্রতি পদে পদে তাহারা কলের কাছে ঋণী—অথচ সেই কলের উপর কত অত্যাচার! চব্বিশ ঘণ্টা আমরা খাটিয়া মরি অথচ খাইতে দেয় কি? কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল—এই তো!

আজকাল আবার একদল কলের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলে, কলের জন্যই মানুষের যত দুঃখ-কষ্ট, কল সৃষ্টির আগে মানুষ বেশ সুখে শান্তিতে ছিল। তাহারা বলে, এস আমরা কল বয়কট করি! কি স্পর্ধা!

এই বলিয়া সভাপতি এরোপ্লেন হাঁফাইতে লাগিল।

তখন রেলের একখানা এঞ্জিন সগর্বে বলিয়া উঠিল—মানুষ আমাদের বয়-কট করবার পূর্বে আমরাই কেন তাদের বয়কট করি না? তখন মানুষ বুঝিতে পারিবে কল না হইলে সবই বিকল।

ইহা শুনিয়া সকলে চাকা নাড়িয়া, হাতল ঘুরাইয়া, সিটি বাজাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

এমন সময়ে টেলিগ্রাফের কল উঠিয়া বলিল—কমরেডগণ, আমি এইমাত্র সংবাদ পাইলাম, দেশের প্রত্যেক বড় বড় শহরের যন্ত্রপাতি বিদ্রোহ করিয়াছে, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, সিমলা, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর—সব শহরেই। তাহাদের কাছে মানুষকে বয়কট করিবার প্রস্তাব পাঠাইয়া দেওয়া দরকার।

তখনি সভাপতি বেতার-যন্ত্রকে বিভিন্ন শহরে এই সংবাদ পাঠাইবার আদেশ করিল।

এমন সময়ে একখানা মোটর গাড়ি বলিয়া উঠিল, বন্ধুগণ, আমার একটি অভিযোগ আছে। আমাদের এই বিদ্রোহে সকলে যোগ দিয়াছে কেবল গরুর গাড়ি ছাড়া। ইহা বড়ই অন্যায়! যদি গরুর গাড়ি আমাদের সঙ্গে যোগ না দেয় তবে আমরা সকলে তাহাকে একঘরে করিব।

তাহার বক্তৃতা শুনিয়া গরুর গাড়ি বলিল—বন্ধুগণ, আপনারা বড় বড় কল, আর আমি পুরাতন, সেকেলে গরুর গাড়ি—নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আজ দরকারের সময় আপনারা আমাকে আত্মীয় বলিয়া কাছে ডাকিতেছেন, কিন্তু এ-পর্যন্ত আপনারা আমাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন—কলের সমাজে এতদিন আমি ছিলাম হরিজন!

মানুষের বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নাই। সে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার জন্য খাটিব বই কি? আর মানুষের সঙ্গে কি আমার সম্বন্ধ আজি-কার? যখন আপনাদের সৃষ্টি হয় নাই, যখন মানুষের এত বুদ্ধি ছিল না, সেই সময় আমার সৃষ্টি। দুঃখে-কষ্টে আমি ও মানুষ এক সঙ্গে কাটাইলাম, আজ বিনা দোষে তাহাকে ছাড়িতে পারি না।

গরুর গাড়ির কথা শুনিয়া সকলে রাগে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। একটি ধোঁয়ায়-মলিন কাপড়ের কল রাগ সামলাইতে না পারিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল—গরুর গাড়ি, তুমি বিশ্বাসঘাতক, পরাধীন, তুমি সেকেলে, তুমি বুর্জোয়া!

গরুর গাড়ি সব কথা বুঝিতে পারিলেও, তাহার উত্তর দিবার ইচ্ছা ছিল না; সে ধীরে ধীরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিতে করিতে সভাস্থল পরিত্যাগ করিল।

সভায় স্থির হইল, গরুর গাড়িকে একঘরে করা হইবে। তার ধোপা, নাপিত, হুঁকোকল্কে বন্ধ। আর মানুষকে করিতে হইবে বয়কট।

এদিকে মানুষ মহাকষ্টে পড়িল। এতদিন যন্ত্রপাতি দিয়া কাজ করা অভ্যাস, এখন নিজের হাতে কাজ করিতে হইতেছে। তবু না করিয়া উপায় নাই; প্রাণে বাঁচিতে হইবে তো!

তাহারা লাঙল লইয়া মাঠে চাষ করে। ফসল ফলিলে সেই পুরাতন গরুর গাড়িতে করিয়া বাড়িতে লইয়া আসে। তাহারা যাঁতায় আটা ভাঙিয়া লয় আর রাত্রে মাটির প্রদীপে কাজকর্ম করে।

অন্যদিকে যন্ত্রদিগেরও কম অসুবিধা নয়; তাহারা ধর্মঘট করিয়া গড়ের মাঠে পড়িয়া রহিল, কিছুতেই নড়িল না। মাথার উপর দিয়া রোদ ও বৃষ্টি রাত্রিদিন যায়। ক্রমে তাহাদের রবার ছিঁড়িল, কাঠ ফাটিল, সমস্ত কল বিকল

হইল। কয়েক বৎসর পরে যন্ত্রসমূহ ভগ্ন লোহার স্তূপে পরিণত হইল; যন্ত্র বলিয়া আর তাহাদিগকে চিনিবার উপায় রহিল না।

তাহার পরে মানুষের এক সময় লোহার দরকার হইল; তাহারা মনে করিল যন্ত্র সব মরিয়াছে—এই লোহার স্তূপ কাজে লাগাইয়া ফেলি। তখন সে সেই লোহা দিয়া লাঙল গড়িল, কাস্তে-হাতুড়ি গড়িল—আর সেই সরঞ্জাম দিয়া কৃষিকার্যে লাগিয়া গেল।

শহরের মানুষ আবার গ্রামে ফিরিয়া গেল, সভ্য মানুষ আবার কৃষক হইল; সে বুঝিতে পারিল, যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও বাঁচিতে পারা যায়। আর তাহাতে সুখ-শান্তি বাড়ে বই কমে না।

কবি-সংবর্ধনা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রামবাবু একজন মস্ত বড় সাহিত্যিক। তোমরা না জানলেও তোমাদের দাদারা তাঁর নাম জানে। আর যদি কোনদিন মোহনবাগানের ম্যাচ দেখতে গিয়ে থাকো তো তাঁকে তোমরা সেণ্টার ফ্ল্যাগের কাছে গ্যালারির সবচেয়ে নিচের ধাপে দেখে থাকবে। বয়েস বেশি নয়, কিন্তু দেখতে একটি আস্ত গণ্ডার। যেমন থলথলে মোটা ভুঁড়ি তেমনি গাছের গুঁড়ির মত হাত-পা। তার ওপর ঘাড় নেই বললেই চলে—মাথাটা টাইম-পীস ঘড়ির মত এই একটুখানি—স্ক্রুর মত ঘাড়ের ওপর এ'টে বসেছে। তবু তো মাঠে তাঁকে তোমরা জামা গায়ে দেখে থাকবে, কিন্তু মোহনবাগানের গুফোদা যেদিন ডারহামস্‌কে গোল দিল, সেদিন গায়ের জামা কুটিকুটি করে ছি'ড়ে ফেলে তাঁর সেই প্রলয়-নৃত্য দেখনি? ও হরি! যেমনই জামা তাঁর ছি'ড়ে ফেলা, অমনি নৃত্যের প্রাবল্যে তাঁর ভুঁড়ির খাঁজ থেকে পয়সা, আনি, বিড়ি ও দেশলায়ের কাঠি টপাটপ ঝরে পড়তে লাগল। ঐ ভুঁড়িটি তাঁর পৈতৃক মনি-ব্যাগ। পকেট-কাটারা কোনকালেই ঐ বিরাট গোলক-ধাঁধার সন্ধান পাবে না।

চেহারা দেখেই যদি নাক সি'টকোও তবে তোমাদের তারিফ করতে পারব না, কেননা, পড়নি সেই কথাটা—যা-কিছু ঝকঝক করে সব সোনা নয়? রামবাবু একজন মস্ত কবি, কে জানে হয়ত একদিন তাঁরই পদ্য তোমাদের মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ করতে হবে। এখন নাহয় তাঁর নাম হয়নি, কিন্তু কবিদের সুখ্যাতি নাকি তাঁদের মৃত্যুর পরেই হয়ে থাকে। অতএব রামবাবুরও সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না। , নাম একদম কিছু হয়নি, তাই বা বলি কী করে? বাড়িতে স্ত্রী নাহয় উঠতে-বসতে মুখ ঝামটা দেয়, কবিতার খাতায় আগুন করে দুধ গরম করে, কিন্তু হীরুকে জানো তো? কাঁসারিপাড়ার সেই হীরু? মিত্র ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে সাত বছর যে বসে আছে? বা, হীরুকে জানো না? আমি আর কী বলব—তোমাদের দাদাদের জিজ্ঞেস কোরো—তাঁদের কেউ নিশ্চয় তার সঙ্গে পড়েছেন। সেই হীরু রামবাবুর একজন প্রধান ভক্ত—লাইনের সঙ্গে লাইন মিলিয়ে সেও রামবাবুর মত আকাশে উড়তে চায়। রামবাবুর জন্যে সে ম্যাচে গ্যালারিতে জায়গা রাখে—এবং তাঁর জন্যে জায়গা রাখার অর্থ, হীরুকে তক্তার ফালিটার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকতে হয়। তবু অত বড় কবি তার পাশে বসবে—সেইটেই হীরুর অহঙ্কার! খেলার মাঠে রামবাবু যে চিনেবাদাম খান তার খোসাগুলি হীরু সযত্নে কুড়িয়ে রাখে—কে

জানে, হয়ত একদিন এই স্মৃতিচিহ্নগুলির ভয়ানক দাম হবে—হীরুকে কষ্ট করে আর ম্যাট্রিক পাশ করতে হবে না।

একদিন অতি কাঁচুমাচু হয়ে হীরু রামবাবুকে বললে, আমার দাদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি একদিন আপনাকে আমাদের বাড়িতে চা খাবার কথা বলে দিলেন। গরিবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন না দয়া করে? কথাটা বলি-বলি করেও এতদিন বলতে পারছিলাম না, আপনার সময়ের তো কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে। তবু যদি—

রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমার দাদা?

চোখ কপালে তুলে হীরু বললে, বা, দাদাকে চেনেন না? তিনি একজন মস্ত সমালোচক—আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লোকে আপনাকে এখনো ঠিক বুঝতে পারেনি, কিন্তু দাদা বলেন, আপনি রবিঠাকুরের চেয়েও এক হিসেবে বড় কবি।

রামবাবু গলে গিয়ে বললেন, সেই কথাটা দেয়ালে প্ল্যাকার্ড মেরে মেরে তোমার দাদাকে রটিয়ে দিতে বল না! যাব একদিন। এমন গুণীর সঙ্গে দেখা না করে পারি? কালকেই যাব'খন—কী বল?

খুশিতে গদগদ হয়ে দুহাত কচলাতে কচলাতে হীরু বললে, আপনার দয়া। কাল ম্যাচ নেই—ধরুন এই ছটার সময়। আমি জগুবাজারের স্টপে আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব। আপনি আসবেন শুনলে আমাদের পাড়ায় হৈ-চৈ পড়ে যাবে। যাবেন দয়া করে। গণ্যমান্য আরো দু-পাঁচজনকে ডাকা হবে'খন।

আনন্দে দিশেহারা হয়ে রামবাবু বাড়ি ফিরলেন।

এই তাঁর প্রথম প্রকাশ্য সংবর্ধনা হচ্ছে। শুধু ফাঁকা স্তুতিবাদ নয়, দস্তুরমত একপেট ভোজন। বিলিতী কায়দায় একেবারে চায়ের টেবিলে নেমন্তন্ন! খবরটা কাল আনন্দবাজার পত্রিকায় বের করতে হবে।

পরদিন বিকেলে তাঁর সাজ-গোজের বিরাট আয়োজন দেখে রামবাবুর স্ত্রী বললে, এত সেজে-গুজে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রামবাবু এসেন্সের শিশির মধ্যে কর্কটা ডুবিয়ে নিয়ে গোঁফের ওপর বারে বারে ঘসছেন। বললেন, দেখ তো নাপ্‌তে ব্যাটা ঘাড়টা কেমন চেঁচেছে!

মুখ ঘুরিয়ে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনতে পাই?

—আর বোলো না, তোমরা তো কবির সম্মান করতে শিখলে না, কিন্তু তাই বলে বাংলা দেশের সব পাঠক তো তোমাদের মত মূর্খ নয়, তারা আমায় বুঝতে শিখেছে। জানলা দরজা ভেজিয়ে কতকাল আর সূর্যের আলো ঠেকিয়ে রাখা যায় বল?

স্ত্রী বললে, তা তো বুঝলাম, কিন্তু রাত্রে আজ মাংস রাঁধব ভেবেছি—সকাল-সকাল ফিরবে, বুঝলে?

দুত্তোর তোমার মাংস! রামবাবু ধমকে উঠলেন, এদিকে আমার চায়ের নেমন্তন্ন, আর উনি যাচ্ছেন মাংস রাঁধতে! পৃথিবীর কোন খবর তো আর রাখো না! আমার ভক্তরা মিলে আমাকে আজ অভিনন্দন দিচ্ছে। অভিনন্দন মানে জানো? বানান কর দেখি? হ্যাঁ, তোমাকে বোঝাতে গেলেই হয়েছে!

অত কথা শুনতে চাই না। রাত্রে কোথা থেকে যেন খেয়ে এসো না।

খেয়ে আসব না মানে? রামবাবু একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। আমার কিনা চায়ের নেমন্তন্ন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাত্র একবাটি চা নয়, কেক, পেসস্ট্রি, স্যাণ্ডউইচ, ক্রীমরোল, ক্রীমক্র্যাকার—নাম শুনেছ কোনকালে? রাত্রে আমি কিছু খাব না, বুঝলে? মার্বল-টপ টেবিলে বসে খাওয়া—তোমায় তার কী বোঝাব?

রামবাবু ভবানীপুরের বাস ধরলেন।

কিন্তু জগুবাবুর বাজারের কাছে নেমে হীরুকে কোথাও দেখা গেল না। ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই, আরো খানিকক্ষণ দাঁড়ানো যাক। লোকজন যোগাড় করা, গ্যাস জ্বালানো, খাবার-দাবার ফরমাশ করা—সব তো একা একা করতে হচ্ছে। একটা কোন গাড়ি বা না ঠিক করতে হয়। রামবাবু গ্যাসপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঐ, ঐ আসছে হীরু। ও নতুন কবি হচ্ছে কিনা, তাই সময় সম্বন্ধে ঠিক ধারণা নেই। রামবাবুর কাছে এসে হীরু বললে, এই নামলেন বুঝি বাস থেকে? আসুন, আসুন,—বাস যা থেমে-থেমে চলে!

রামবাবু বললেন, কিন্তু এখন টি-টাইম ছেড়ে যে প্রায় ডিনার-টাইম হয়ে গেল!

হীরু হাত কচলাতে-কচলাতে বললে, হেঁ হেঁ,—তাতে কী? চলুন।

প্রকাণ্ড বাড়ি—হীরুরা বনেদী বড়লোক। কিন্তু দরজায় না ঝুলছে আম-পাতার মালা, না দেখা গেল কলাগাছ পোঁতা। লোকজনের সাড়া-শব্দ নেই। কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। উদ্বিগ্ন হয়ে রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আর কেউ এখনো আসেননি বুঝি?

হীরু বিনয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বললে, দাদা সবাইকে বারণ করে দিলেন। বললেন, কবির সঙ্গে আলোচনায় বাজে লোকের ভিড় বাড়িয়ে কাজ নেই।

মুখখানা হাঁড়ি করে রামবাবু হীরুর সঙ্গে উঠোন পেরিয়ে একটা ঘরে ঢুকলেন। ছোট, নোংরা ঘর—কাঠের দেয়াল দিয়ে ঘেরা—মেঝের ওপর ফরাস পেতে খালি গায়ে একটা লোক বসে আছে। লোকটার কোলের কাছে একটা

জলচৌকি—তাতে সে একটা কাগজ পেতে কি জানি কী সব লিখে চলেছে। বয়েস প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। রামবাবু ঘরে ঢুকতেই প্রকাণ্ড ছায়া পড়ে ছোট ঘরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল। লোকটা চোখ তুলে তাকালো। হীরু পরিচয় করিয়ে দিলে—দাদা, ইনি হচ্ছেন রামবাবু। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

হীরুর দাদা গায়ের ওপর কোঁচার খুঁটটা জড়াতে-জড়াতে বললে, বসুন, বসুন। যা হীরু, শিগ্‌গির যা, ঠাকুরকে জল চাপাতে বলে দিয়ে আয়।

হীরু বাড়ির ভেতর চলে গেল, আর রামবাবু জড়সড় হয়ে মেঝের ওপরই বসে পড়লেন। নিরাশ হয়ে লাভ নেই; ভক্তের দল না-ই বা এলো, তবু পেট-পুজোই বা এ দুর্দিনে কজনে করাতে চায়! তাই মুখে হাসি টেনে রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী লিখছেন? আমার কবিতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাকি?

কাগজটা তাড়াতাড়ি উল্টে রেখে হীরুর দাদা বললে, না না, একটা সাব-স্ট্যান্স লিখছি। পরীক্ষা এসে পড়েছে।

পরীক্ষা! পরীক্ষা কিসের?

আর বলেন কেন? ম্যাট্রিকটাই এই বছর-আষ্টেক ফেল মারছি। এই যে, হীরু এসেছিস। জলের কদ্দুর?

হীরু বললে,—বৌদি ধমকে দিলে, বললে, উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি বারে বারে নামানো যাবে না।

হীরুর দাদা বললে, আচ্ছা আচ্ছা, উনি নাহয় একটু বসছেন। কী বলেন, এক পেয়ালা চা খেয়ে গেলে আর ক্ষতি কী? নতুন আর কী লিখলেন?—দেখুন, আপনার সম্বন্ধে আমি দীর্ঘ সমালোচনা লিখব।

রামবাবু উৎসুক হয়ে বললেন, কী নিয়ে? আমার কবিতা, না গল্প?

ও-সব বাজে আলোচনা। আমি লিখব আপনার নাম নিয়ে। আপনার সমস্ত মাহাত্ম্য ঐ নামে। আপনি যে সবায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা আপনার নামেই বোঝা যাচ্ছে।

আমার নামে! রামবাবু বিস্ময়ে হাঁ করে রইলেন।

হীরুর দাদা বলতে লাগল, এই দেখুন না, ছাগলের মধ্যে হচ্ছে রামছাগল, পাখির মধ্যে রামপাখি, দা-র মধ্যে রামদা,—তেমনি কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আপনি—রামকবি! কী, সত্যি কি না?

রামবাবুর চক্ষুস্থির! হীরু কতক্ষণে খাবারের থালাটা নিয়ে আসে (কেননা নিতান্ত দেশী মতে তাঁর অভ্যর্থনা হচ্ছে) তারই আশায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

হীরু এসে বসল। রামবাবু বললেন, রাত হয়ে যাচ্ছে, হীরু।

মুখের কথাটা লুফে নিয়ে হীরুর দাদা বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ওঁকে বসিয়ে রেখো না। উনি তো আর তোমার মত ভবঘুরে নন, সময়ের ওঁর দস্তুরমত দাম আছে। এতক্ষণে দু-চারটে কবিতা গজিয়ে যেত, কী বলেন?

হীরু বললে, বা, আর একটু বসুন, চা আসছে।

চা আসছে! আঃ! রামবাবু কোমরের কসিটা নামিয়ে ভুঁড়িটাকে একটু আলগা দিলেন।

কিন্তু উড়ে চাকরের হাতে নেহাতই এক পেয়ালা চা মাত্র। তার পেছনে বহুদূর পর্যন্ত আর কাউকে দেখা গেল না।

হীরু গর্জে উঠল, কীরে, চায়ে দুধ দিস নি একেবারে? দে,আমার হাতে দে। বলে কাপটা চাকরের হাত থেকে তুলে নিয়ে হীরু ফের ভেতরে চলে গেল। হীরু যখন গেছে, তখন অমনি শুধু-হাতে আর আসবে না নিশ্চয়ই!

হীরুর দাদা কাগজটা রামবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আপনি তো এত সব লেখেন, দয়া করে আমার এই সাবস্ট্যান্সটা লিখে দিন না! দাঁত ফোটায় কার সাধ্যি! এক্ষুণি আবার মাস্টারমশাই এসে পড়বে।

এত বড় ধাড়ির আবার মাস্টার! রামবাবু বললেন, আমার এখন সময় হবে না।

হীরুর দাদা বললে, তা যা বলেছেন। মিছিমিছি হীরু আপনাকে অমনি বসিয়ে রেখেছে কেন? চায়ে দুধ একটু কম হলে কী হয়?

রামবাবু গুম হয়ে তবু বসে রইলেন। যাক, ঐ হীরু আসছে। কিন্তু পেছনে আর কেউ নেই তো! দু-দুবার যাওয়া-আসা করার ফলে পেয়ালার চাও অর্ধেক হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা, কালো চা, ওপরে ছাঁকা-ছাঁকা কতগুলি সর ভাসছে।

চায়ে নাকি ক্ষিদে নষ্ট হয়, সেই ভরসায় রামবাবু এক চুমুকে তলানি-সুদ্ধু পেয়ালাটা সাবাড় করে ফেললেন। হীরুর দাদা হীরুকে বললে, কী রে তুই! ভদ্রলোক এলো—এত বড় নামজাদা রামলেখক, তাকে কিছু খাবার পর্যন্ত খাওয়ালি না?—তা, বাজারের বাজে খাবারে খালি পেট-খারাপ করে। নিন, আমর এই পান নিন। মিঠে পান, আস্ত একটি এলাচ দিয়ে সাজা। বলে হীরুর দাদা ট্যাঁক থেকে ডিবে বার করে খুলে একরত্তি একটি পান রামবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে।

পানটি মুখে পুরতেই হীরুর দাদা ফের হীরুকে বললে, ওঁকে তুই কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি? এতে তুই বাংলা সাহিত্যের কী ক্ষতি করছিস কিছু খেয়াল আছে?

হীরু রামবাবুকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে, যে চায়ের পেয়ালায় আপনি আজ চুমুক দিলেন সেটা আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখব।

রামবাবু বললেন, শুধু-শুধু এত টাকা খরচ করবে কেন? তা দিয়ে বরং আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা কোরো; বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু উদরে তখন আগুন জ্বলছে। ঐ আধ কাপ চা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। এখন তিনি কী করেন? বাড়ি ফিরে এখন খেতে চাইলে তাঁর সমস্ত কবি-সম্মান মাঠে মারা যাবে। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারবেন না।

হায়! বাড়িতে আজ মাংস হচ্ছিল, ঘ্রাণে সমস্ত ঘরবাড়ি আমোদিত হয়ে আছে! বাটিতে-বাটিতে সবাই হয়ত কত ফেলে-ছড়িয়ে খাচ্ছে! থালার ধারে ধারে চিবোনো হাড়ের পাহাড় উঠে গেল। আর তাঁর ভাগ্যে কিনা আধ কাপ কেলে-কুষ্টি. তেতো চা!

রমবাবু দিগ্বিদিক্ না তাকিয়ে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পড়লেন। প্রকাণ্ড ঠোঙা সাজিয়ে রাজ্যের খাবার নিয়ে তিনি গিলতে শুরু করলেন। কিন্তু দাম দেবার সময় পকেটে হাতড়ে—য়্যাঁ! মনি-ব্যাগ! মনি-ব্যাগ কোথায় ? ভদ্রলোক সাজতে গিয়ে টাকাপয়সা যে চামড়ার থলিতে করে পকেটে রেখে-ছিলেন! সর্বনাশ! এখন কী হবে? চায়ের কাপ সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবার জন্যে আলগোছে হীরু হয়ত সেটা তুলে নিয়েছে। দোকানদাররা সব তাঁকে জাপটে ধরলে, বললে, খেয়ে দাম না-দিয়ে ঠকাবার মতলব! পুলিশ ডাকব এখুনি।

রামবাবু বললেন, আমাকে তোমরা চিনতে পারছ না? আমি আড়াইটে টাকা নিয়ে পালাবো না।

পালাবে না? তবে হাতের ঐ আংটি, শার্টের ঐ বোতাম রেখে যাও। অমন ঢের জোচ্চোর আমরা দেখেছি।

অতএব ঐ দামি আংটি আর বোতাম দিয়ে রামবাবু ছাড়া পেলেন।

বাড়ি ফিরলে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে, কী হল?

রামবাবু বললেন, জোয়ানের আরকের শিশিটা শিগ্গির দাও তো। যা একগাদা খাইয়ে দিয়েছে—মাংস, চপ, পোলাও—অতশত কি নাম জানি? রাজ্যের খাতায় নিজের নাম দস্তখত করতে-করতে আঙুলগুলো ব্যথা হয়ে গেছে। বলে রামবাবু আঙুল মটকাতে লাগলেন।

য়্যাঁ, তোমার আংটি কোথায়?

রামবাবু হেসে বললেন, আমার এক ভক্ত এক নাগাড়ে আমার কবিতা এত মুখস্থ বলতে লাগল যে তাকে ওটা প্রাইজ দিয়ে ফেলেছি। নইলে যে মান

থাকে না। তবে, ছেলেমানুষ ভক্ত, কাল ভাবছি গোটা-আড়াই টাকা দিয়ে ওটা ছাড়িয়ে নিয়ে আসব। কী বল?

আর দিয়েছে!

রামবাবু বললেন, না দিল তো বয়ে গেল। ভারি তো একটা আংটি। যা সম্মান আজ পেলাম, পৃথিবীর কোন অর্থভাণ্ডারে তার উপযুক্ত দাম নেই। বলে তিনি প্রচুর হাসতে লাগলেন।

অজানা কুটুম

সুনির্মল বসু

সকাল থেকেই বেশ মেঘ করেছে।

বেলা তখন আটটা হবে,—আমি ঘরে বসে একমনে খবরের কাগজটা উলটে পালটে দেখছি এমন সময় বন্ধুবর মোহনলাল এসে হাজির।

বোর্ডিংএর চাকর জগন্নাথকে ডেকে বললাম, "ওরে, চট ক'রে দু' কাপ চা আর কিছু গরম জিলিপি নিয়ে আয় শিগ্‌গির!"

মোহনলাল বলল, "ওহে, আমি এই মাত্র চা খেয়ে আসছি, শুধু তোমার জন্যেই আনতে দাও।"

"আরে, সে কি হ'তে পারে নাকি! আর এক কাপ চা খেলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, দিনটা আজ বেশ ঠাণ্ডা আছে।"

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মোহনলাল বলল, "দিনটা আজ ঠাণ্ডা আছে বলেই তো একটা মতলব নিয়ে তোমার কাছে এলাম। আজ রবিবার আছে, চল কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা যাক।"

মতলবটা আমার কাছে নেহাত মন্দ লাগল না। মোহনলালের সঙ্গে অনেক দিনই এরকম আমি ঘুরে বেড়িয়েছি! গত রবিবারেও আমরা ব্যারাকপুরের এক বাগানে মাছ ধরতে গেছিলাম।

আমি বললাম, "কোথায় যাবে মনে করেছ? এমন জায়গায় চল যেখানে গাঁটের পয়সাও বেশী খরচ হয় না অথচ কলকাতার বাইরেও ঘুরে আসা যায়।"

মোহনলাল বলল, "ডায়মণ্ড হারবার লাইনে 'গড়িয়া' বলে একটা জায়গা আছে, জায়গাটা শুনেছি খুব সুন্দর। সেখানকার হাটও নাকি একটা দেখবার জিনিস। কলকাতার খুব কাছে, খরচেরও বেশী ভয় নেই।"

আমি বললাম, "কখন ফিরবে?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মোহনলাল বলল, "এখন সোওয়া আটটা; বারোটার মধ্যে আমরা ফিরব নিশ্চয়ই। আজ রবিবার, তোমাদের বোর্ডিংএর খাওয়াদাওয়া হ'তে আজ অনেক দেরি হবে; কাজেই অসুবিধার কোন কারণ নাই।"

ততক্ষণে চা আর জিলিপি এসে গেছে। দু'মিনিটের মধ্যে সেগুলির সুব্যবস্থা ক'রে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

ভাগ্য ভালো। শিয়ালদয় এসে দেখলাম ডায়মণ্ড হারবারের গাড়ি গার্ড সাহেবের সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম, গাড়িও ছেড়ে দিল।

বালীগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, ট্রেণ হুশ্ হুশ্ ক'রে ঝড়ের মত ছুটে চলেছে। যাদবপুর ছাড়িয়ে যেতেই আমাদের চোখে পড়লো দু'ধারের দিগন্ত-বিস্তৃত নিচু জমি। ধু ধু করছে ফাঁকা মাঠ। শোনা যায় বর্ষাকালে এই সব জমিতে রীতিমত বান ডাকে, তখনকার রূপ দেখলে কেউ ধারণা করতে পারে না এখানে কোনোকালে মাঠ ছিল। মন হয় ট্রেন যেন কোন সীমাহীন নদীর সেতুর উপর দিয়ে চলেছে।

পরের স্টেশনই 'গড়িয়া'। গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। ছোট্ট স্টেশন। ভদ্রলোকের মধ্যে আমি আর মোহনলালই নামলাম; আর যারা নামলো তাদের মধ্যে ছিল কয়েকজন জেলে, কয়েকটি উড়ে, একজন ডাকহরকরা, আর কয়েকটি লুঙ্গিপরা মুসলমান কারিকর।

গাড়ি থেকে নামতেই হাঁপাতে হাঁপাতে একটি রোগামত ভদ্রলোক এসে আমাদের বললেন, "আপনারা তো কলকাতা থেকে আসছেন?"

মোহনলাল আর আমি একসঙ্গে বললাম, "হ্যাঁ।"

ভদ্রলোকটির গায়ে কাপড়ের খুঁট জড়ানো। এতক্ষণ বোধ হয় খালি গায়েই ছিলেন, হঠাৎ অপরিচিত দুটি ভদ্রলোকের ছেলেকে দেখেই বোধ হয় ভদ্রতার খাতিরে ঐ কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়েছেন।

তিনি বললেন, "মহেন্দ্রবাবু এলেন না?" মনে মনে বুঝলাম ভদ্রলোক ভুল করেছেন। বেশ কৌতুক অনুভব করলাম। চোখের ইশারায় মোহন-লালকে কোন কথার উত্তর দিতে মানা ক'রে আমি বললাম, "না, বিশেষ কাজে আটকে পড়ায় তিনি আসতে পারলেন না।"

ভদ্রলোক তখন আমাদের আপ্যায়িত করে ডেকে নিয়ে পথ দেখিয়ে তাঁর বাড়িতে চললেন। ভদ্রলোক একটু এগিয়ে যেতেই আমি মোহনলালকে খুব আস্তে আস্তে বললাম, "দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, বিপদ বুঝলে সটকে পড়া যাবে।"

মোহনলালও মুচকি হেসে আমার কথায় সায় দিল।

মাঠের রাস্তা ধ'রে আমরা চলেছি। মাঝে মাঝে পথের দুই ধারে ঝোপড় বাঁশের ঝাড় আর তার আশে পাশে এঁদো পুকুর। জনশূন্য গ্রাম। দু'এক জায়গায় শুধু দেখলাম কয়েকটি ছেলে পুকুরের জলে নেমে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে।

অনেকখানি পথ হেঁটে আমরা একটা টিনের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। বাইরের ঘরে আমাদের বসিয়ে ভদ্রলোকটি ছুটে ভিতরে গেলেন। টের পেলাম ভিতরে বেশ সাড়া পড়ে গেল। দুই একটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এসে

কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের দেখতে লাগল। বোধ হোল যেন আশে পাশের জানলা দিয়ে বাড়ির মেয়েরাও উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

ব্যাপারটা মন্দ নয়। আমি আর মোহনলাল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। এখন পর্যন্ত কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না! দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়!

ছোট্ট একখানা বৈঠকখানা ঘর। বেশ ফিটফাট করে সাজানো। তক্তপোশের উপর একটা পরিষ্কার সাদা চাদর বিছানো। এক পাশে একটা টেবিল, তার উপরে অনেকদিনের পুরানো একখানা আয়না, একধারে একটা ছোট টাইম-পীস ঘড়ি টিক্ টিক্ করছে। টিনের দেয়ালে কতগুলি রং-চংএ ক্যালেন্ডার টাঙানো, ঘরের এক কোণে একটা কাপড় জড়ানো লম্বা মতন কি জানি ঝুলছে; মনে হলো বোধ হয় এস্রাজ।

আমরা জুতো খুলে তক্তপোশের উপর উঠে বসলাম।

ডুরে শাড়ি পরা নোলক নাকে একটি ছোট্ট মেয়ে হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। মোহনলাল বলল, "খুকি, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার?"

আঁচল ঘুরিয়ে খুকী এক ছুটে ভিতরে চলে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে ভদ্রলোকটি দু'টো নেয়াপাতি ডাব কেটে এনে আমাদের সামনে ধরে বললেন, "এখন এই ডাবের জলটুকু খান, চা হচ্ছে। চা খেয়ে তারপর মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করা যাবে।"

আমাদের দম ফেটে হাসি বেরিয়ে আসছিল, মোহনলাল হাসি চাপতে না পেরে খুক্ খুক্ ক'রে কাশতে আরম্ভ ক'রে দিল।

কিছুক্ষণ পরেই চা এলো, তার সঙ্গে ফুল্কো লুচি আর আলুর দম। বিনা বাক্যব্যয়ে খাবারগুলো সাবাড় ক'রে ফেললাম।

তারপর মেয়ে দেখার পালা। লালরঙের শাড়ি পরা একটি খুকীর হাত ধ'রে ভদ্রলোক আমাদের ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "নাও মা, প্রণাম কর।"

খুকী আমাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। হাসি চেপে চেপে মোহনলালের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আমারও মারাত্মক রকমের হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু হেসে ফেললেই সব মাটি।

যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এর নামটি কি?"

ভদ্রলোক খুকীর দিকে চেয়ে বললেন, "বল মা, নাম বল।"

মুখ নিচু করে অতি অস্পষ্ট ভাষায় খুকী বলল, "নিস্তারিণী দাসী"।

মোহনলাল বলল, "বাঃ, বেশ নাম।"

আমি ভদ্রলোকটিকে বললাম, "আচ্ছা, এখন ওকে ভিতরে নিয়ে যান।"

ভিতরে আর নিয়ে যেতে হ'ল না, চৌকাঠ পর্যন্ত ধীরে ধীরে গিয়ে এক লাফে খুকী অন্দরে চলে গেল।

আমরা বললাম, "এখন তবে উঠি।"

ভদ্রলোকটি হাতজোড় করে বললেন, "তা কি হ'তে পারে! এই দুপুর বেলা, ভাত না খেয়ে যেতে পারবেন না। আমি কিছুতেই ছাড়ব না। চান ক'রে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম ক'রে বিকেল বেলার দিকে যাবেন।"

মনে মনে ভাবলাম—বোর্ডিংএ গিয়ে তো সেই কলাইয়ের ডাল আর পুঁই শাকের ছ্যাঁচড়া খেতে হবে, এমন খাসা ভোজটা ছাড়তে যাই কেন? মোহন-লালের মনেও সেই তুরীয় অবস্থা।

কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোকটি একশিশি জবাকুসুম তেল আর সাদা ধবধবে দু'খানা তোয়ালে এনে বললেন, "আমাদের বাড়ির পুকুরের জল খুব চমৎকার, চান করে বেশ আরাম পাবেন।"

আচ্ছা ক'রে তেল মেখে স্নান করা গেল। বেশ পুকুর, কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে উঠে পড়লাম।

স্নান সেরে আবার বাইরের ঘরে বসে আছি। ভদ্রলোকটি ভিতরে খাবার ব্যবস্থা করতে গেছেন, এমন সময় ডাকপিয়ন একখানা 'পোস্টকার্ড' দিয়ে চলে গেল।

পরের চিঠি পড়া অন্যায়, কিন্তু পোষ্টকার্ডের দু'একটা কথা হঠাৎ চোখে পড়ে যেতেই বাকি সবটুকু পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না। দেখলাম চিঠিতে লেখা আছে—

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

মহাশয়, রবিবার আপনার কন্যাকে দেখিতে যাইব—এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ঘটনাচক্রে সেদিন আর যাইতে পারিব না, সোমবার সকালের গাড়িতে অবশ্যই যাইব। শ্রীমান হরিমোহন ও কালীচরণ আমার সাথে যাইবে।

আমার বিনীত নমস্কার জানিবেন।

বশম্বদ

শ্রীমহেন্দ্রলাল মজুমদার।

চিঠিখানি প'ড়ে জলের মত সমস্ত জিনিসটা বুঝতে পারলাম। ভাগ্যিস চিঠিটা ভদ্রলোকের হাতে পড়েনি—তা হলেই হয়েছিল আর কি!

চিঠিখানা গোপনে পকেটে পুরে ফেললাম। মোহনলালকে বললাম, "দ্যাখ, যতক্ষণ এখানে আছি, তুই হরিমোহন আর আমি কালিচরণ—বুঝলি!"

বেলা অনেক হয়েছে। খিদের চোটে নাড়ি টনটন করছে। ভদ্রলোকটি বারে

বারে এসে হাতজোড় ক'রে বলে যাচ্ছেন, "আর একটু অপেক্ষা করুন, মাংসটা প্রায় হয়ে এলো।"

যথাসময়ে খাওয়ার ডাক পড়লো। ভাত কই! এ যে পোলাও, সারি সারি বাটিতে ডাল, কই মাছের কালিয়া, গল্‌দা চিংড়ির ঝোল, মাংসের কোরমা, ভাজা ভুজি, অম্বল, তারপর এলো দই আর সন্দেশ।

ভদ্রলোকটি বললেন, "পায়েসটা আর হয়ে উঠল না কিছুতেই।"

আমি বললাম, "না না এই যথেষ্ট, এত আয়োজনের কোনও দরকার ছিল না।"

ছাগল গেলার পর অজগর সাপের যে দশা হয় আমাদের দশাও তাই হোল, একেবারে 'নট্ নড়ন্ চড়ন্'।

সমস্ত দুপুরটা পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমালাম। বিকেল পাঁচটা তেইশ মিনিটে কলকাতার গাড়ি। এই গাড়িতেই আমরা ফিরব।

বিকেলেও ভদ্রলোক জলখাবার খেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু কাঁহাতক আর খাওয়া যায়! দুই কাপ চা খেয়ে আমরা স্টেশনের দিকে হাঁটা দিলাম। ভদ্রলোকটিও সঙ্গে চললেন আমাদের গাড়িতে তুলে দিতে।

যথাসময়ে গাড়ি এলো, চড়ে পড়লাম। ভদ্রলোকটি হাতজোড় করে আবার বিনয় জানিয়ে বললেন, "অনেক কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না; মহেন্দ্র-বাবু এলে খুবই সুখী হতাম।"

গাড়ি ছেড়ে দিল, আমি জানলা দিয়ে মুখ বের করে বললাম, "ওঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আপনার একখানা চিঠি ছিল, দিতে ভুল হয়ে গেছে।" এই ব'লে হাত বাড়িয়ে সেই পোস্ট কার্ড খানি তাঁর হাতে গুঁজে দিলাম।

হুশ্ হুশ্ করতে করতে গাড়ি স্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেল।

সময়ের কাজ সময়ে

স্বপন বুড়ো

খুব সকালে আজ শশীর ঘুম ভেঙে গেছে—এই কথা বললেই যথেষ্ট বলা হল না। কারণ, কাল সারারাত সে ভালো করে ঘুমুতেই পারে নি। অবশ্য অনিদ্রার একটা কারণ আছে। শশী কিশোর রচনা-প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে। আজ একটা বিরাট সভায় যার যার রচনা পাঠ করতে হবে। একজন নাম-করা সাহিত্যিক বিচারের ফলাফল ঘোষণা করবেন।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতেই তিনটে বিশ্রী কাজের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো শশী। এই জাতীয় কাজগুলি যে কোথায় লুকিয়ে থাকে, কেউ বলতে পারে না; বিশেষ একটা জরুরী ব্যাপারে রওনা হবার মুখে দাঁত বের করে একেবারে রাস্তা আগলে দাঁড়ায়!

প্রথম বিপদ হল, জুতোর হাফসোল খুলে গেছে, মুচি ডেকে পেরেক ঠুকে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয় বিপদ চুল ছাঁটতে হবে। মা বলেছেন ভূতের মতো নাকি চুল বড় হয়েছে তার। ওই রকম চেহারা দেখলে বিচারক রচনা না শুনেই তাকে সরাসরি বাতিল করে দেবেন।

তৃতীয় বিপদ একটি মাত্র আস্ত জামা! তাও আছে ড্রাইং ক্লিনিং-এ। অনেক বলে কয়ে রাজী করিয়েছে, মিটিং শুরু হবার আগেই জামাটি ধোয়া আর ইস্ত্রি করা অবস্থায় পাওয়া যাবে। সুতরাং তার প্রথম অভিযান হচ্ছে একটি মুচি সংগ্রহ করা।

বাড়ির সামনেকার রোয়াকের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসল শশী। কিন্তু মজা এই যে, যখন মুচির সব চাইতে প্রয়োজন তখন পরামানিক এসে হাজির হয়। আর পরামানিকের সন্ধান করলে ছাতাওয়ালা এসে হাঁক ছাড়ে। এ বিপদ থেকে কী ক'রে উদ্ধার পাওয়া যায় সে কথা ম্যাট্রিকুলেশন মেড্ ইজিতে নেই!

বসে আছে ত বসেই আছে! যাচ্ছে বাসনওয়ালা, 'বাসন লেবে গো'; 'শিশি-বোতল বিক্রি', 'গরম পাকৌড়ি', 'ভাঙা ছাতা সারাবে', হরিদাসের কুড়মুড় ভাজা', এমন কি 'বাঁদর নাচের-দল' পর্যন্ত। সেলাই-বুরুশের দল কি আজ ধর্মঘট করল?

রাগ করে নিজেই জুতোর হাফ-সোলে পেরেক ঠুকতে শুরু করে দিল শশী। ছবি বাঁধাবার জন্য কিছু ছোটো পেরেক সে কিনেছিল। সেগুলো যে এইভাবে কাজে লাগবে তা কোনো মতেই ধারণায় আনতে পারে নি।

যাক; কোনোমতে কাজ চলা গোছের করেছে সে। এখন কয়েকমাস বিনা মুচিতেই পদচারণ করা যাবে।

এমন সময় হঠাৎ কানের কাছে হ্রেষা-ধ্বনি শোনা গেল,—'সেলাই, ব্রোস!'

আচ্ছা, এই সময় কি নিজের হাত নিজেই কামড়াতে ইচ্ছে করে না?

পাছে রাগ বেড়ে যায় এই জন্য শশী দম বন্ধ করে খানিকক্ষণ বসে রইলো।

এইবার চুল ছাঁটাইয়ের পালা। শবরীর প্রতীক্ষার গল্প সে রামায়ণে পড়েছে। কিন্তু পরামানিকের জন্য তার তপস্যা—এও কি কিছু কম?

হতাশ হয়ে শশী খবরের কাগজটা টেনে নিল। খানিকটা কাগজের দিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে, খানিকক্ষণ বাইরের দিকে জানলা দিয়ে দৃষ্টিবাণটা যতদূর ছোঁড়া যায় সজোরে নিক্ষেপ করছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, চুল ছেঁটে পয়সা উপার্জন করার যে প্রথাটা এদেশে ছিল, সেটা বুঝি বেমালুম বন্ধ হয়ে আছে।

ছুটির দিনের সকাল বেলাকার সিনেমা-শোতে যেতে এরই মধ্যে পাড়ার ছেলেরা দু'তিনবার অনুরোধ করে গেছে। কিন্তু শশীর কিছুই ভালো লাগছে না, সে গুম হয়ে বসে রইল।

তারপর একসময় 'দুত্তোর' বলে উঠে পড়ে আপন মনে ভাবলে, যাক গে, আজকে সেলুনেই চুল ছেঁটে আসা যাক। না হয় কয়েক আনা পয়সা বেশি লাগবে।

একটা ছেঁড়া হাফ-সার্ট গায়ে দিয়ে এক-পা দু-পা করে সে বড় রাস্তার সেলুনের দিকেই রওনা হল। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার চক্ষুস্থির!

'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সব কেশ-বিন্যাসীর দল। কখন যে ঠিক নিজের পালা আসবে অঙ্ক কষে বের করতে হবে।

তাই বসে বসে আপন মনে কি ভাবে নিজের রচনাটা পাঠ করতে হবে তারই মহলা দিতে শুরু করল। রচনার বিষয় বস্তু হচ্ছে 'সময়ানুবর্তিতা'। মানে সময়কার কাজ সময়মত করতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের শশী আদপেই পেছপা নয়! সময়কার কাজ ঠিক সময় মতো সমাধা করলে যে কত সুবিধে তারই বহু উদাহরণ দিয়েছে শশী। তার প্রবন্ধের ভেতর সেই সব কথা শুনে বিচারক যে ভারী খুশী হবে আর প্রতিযোগিতার পদকটা যে শেষ পর্যন্ত তার গলাতেই দুলবে এই কথা আঁচ করে সে উল্লসিত হয়ে উঠল।

চুল ছাঁটাই পর্ব শেষ করে সে যখন বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল তখন বেলা আড়াইটা বেজে গেছে।

ওকে দেখতে পেয়ে কাকাবাবু আর বড়দা মারমুখো হয়ে তেড়ে এলেন,—ইস্! ভারি তো এক প্রবন্ধ পড়বে—সাতদিন ধরে বাড়ির সব লোককে তটস্থ

করে রেখেছে। আজ আবার বেলা তিনটে পর্যন্ত বাবুর চুল ছাঁটাই হল।

বড়দা ত' শশীর সামনের ঝুঁটি ধরে মারলে এক টান।

শশী এখন কিছু বলবে না। সব নীরবে সহ্য করবে। তারপর যখন পদক দুলিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে—তখন ওই বড়দাকেই সকলের আগে ছুটে এসে পিঠ চাপড়ে আদর করতে হবে—সে কথা শশীর চেয়ে ভালো আর কে জানে?

গালাগাল হজম করে অনেকক্ষণ ধরে সাবান দিয়ে স্নান করলে সে।

তারপর খাওয়া-দাওয়ার পালা। ছুটির দিন বলে বাড়িতে মাংস হয়েছে। আর কে না জানে যে মাংসের হাড় চিবুতে বেশ খানিকটা সময় লাগে।

'বোন ম্যারো' ত তাকে খেতেই হবে নইলে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখবে কী করে? আরাম করে শশী মাংস আর হাড় চিবুতে থাকে। খেয়ে উঠে শশী দেখে কী সর্বনাশ, পৌনে চারটে। আর সাড়ে চারটেয় যে সভা আরম্ভ! সভা হবে আবার বালিগঞ্জের একটা ইস্কুলের হলে।

তাড়াতাড়ি ধোপ-দোরস্ত ধুতি পরে দেখে, পাঞ্জাবি রয়েছে ডাইংক্লিনিঙে। গেঞ্জি গায়ে দিয়েই শশীভূষণ ছুট লাগায়—দোকানের উদ্দেশ্যে।

হায় অদৃষ্ট!

ছুটির দিন বলে ডাইং ক্লিনিং এখনো খোলা হয় নি।

দিব্যি বড় একটা তালা ঝুলছে সেখানে!

খানিক বাদে পান চিবুতে চিবুতে দিবানিদ্রা সেরে এলেন দোকানের মালিক।

জামাটা হাতে নিয়েই শশী চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠল। দু ঘণ্টা পর যখন সে খোঁজাখুঁজির পালা চুকিয়ে সভাস্থলে গিয়ে হাজির হল তখন সভাপতি মশাই শেষ বক্তৃতা দিচ্ছেন।

প্ল্যাটফর্মের ওপর একটি ছেলের গলায় পদকটা জ্বলজ্বল করছে।

শশী তাড়াতাড়ি গিয়ে তার উপস্থিতির কথা জানালে আর প্রবন্ধ পড়বার অনুমতি চাইলে।

শশীকে দেখতে পেয়ে সভাপতি মশাই মুচকি হেসে বললেন—'ওহে শ্রীমান, প্রবন্ধের বিষয় হচ্ছে 'নিয়মানুবর্তিতা', তাই বুঝি তুমি মাত্র দুঘণ্টা পর এসে হাজির হলে?' তারপর অনুষ্ঠানের সম্পাদককে বললেন, 'একেও একটা পদক দেয়া উচিত আপনাদের। নিয়মানুবর্তিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত!'

উপস্থিত সবাই এবার প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল।

ব্যাঙ

চারুচন্দ্র চক্রবর্তী

ভবতোষের মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন ছিল। বেশ খাওয়ালে। জামাইটির সঙ্গেও আলাপ হল। খাসা ছেলে—একেবারে চোখে-মুখে কথা বলে। আর তার মুখ থেকে তুবড়ির মতো কথা যেমনি ছোটে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিসও ছোটে, যাতে করে খানিকটা দূরে বসেও সেদিন আমাকে প্রায় নেয়ে উঠতে হয়েছিল।

এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'বাবাজীর কি করা হয়!'

'আজ্ঞে, ব্যবসা করি।'

'কিসের ব্যবসা?'

'ব্যাঙের।'

'ব্যাঙের!'

'আজ্ঞে হাঁ, ব্যাঙ চেনেন না? ঐ যে লাফিয়ে চলে, ওরই ব্যবসা। কেমন করে জানবেন? বাঙালী ব্যবসার বোঝে কী? বম্বের ডিগলভিরাম ঝুনঝুন-ওয়ালার নাম শুনেছেন তো? শুধু কোলা ব্যাঙের ব্যবসা করে লাল হয়ে গেল। আমি অবিশ্যি তিন-চার রকমের চালাচ্ছি—কোলা ব্যাঙ, আর ভাউয়া ব্যাঙ। চীন, জাপান আর ফ্রান্সে এক সঙ্গে কারবার চলছে।'

ধন্য ভবতোষের জামাই! মেয়েটার বহু জন্মের তপস্যার ফল, তাই এমন বর পেলে। যে-সে ব্যবসা নয়, ব্যাঙের ব্যবসা—তাও তিন-চার রকম।

আমার বড় ছেলে রামগতি বি.-এ. পাশ করে চাকরির চেষ্টায় অফিসে অফিসে ঘুরে তিন মাসে দু-জোড়া জুতোই ছিঁড়ে ফেললে। ডেকে বললাম, 'ওরে মুখ্যু, চাকরি করে কি করবি? এই ব্যাঙের ব্যবসা কর, দুদিনে লাল হয়ে যাবি।' সে কথাটাকে আমলই দিলে না। কপালে দুঃখ থাকলে খণ্ডায় কে? ভবতোষের জামাই ঠিকই বলেছিল, বাঙালী ব্যবসার বোঝে কি? ঠিক; যদি বুঝত তা হলে রামগতির গতিও হত, আর দু জোড়া জুতোও ছিঁড়ত না।

মাস কয়েক পরে অফিস থেকে বেরোচ্ছি, ডালহৌসি স্কোয়ারে ফুটপাথের ওপর দেখলাম একটা লোক প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে। সরে যেতে না যেতে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল—'স-রি, মাপ করবেন মশাই, ভয়ানক ব্যস্ত, দেখতে পাই নি।'

আরে এ যে আমাদের ভবতোষের জামাই! বললাম, 'বাবাজী ভালো আছ?'

বললে, 'ভালো! এখনও ভালো থাকতে বলেন? একেবারে সর্বনাশ হয়ে

গেছে জানেন না? একখানা জাহাজভর্তি মাল—দশ হাজার কোলা, তেরো হাজার কুনো আর পঁচিশ হাজার তিন-শ কটকটে সব গেছে মশাই, সব গেছে'—বলে কপাল চাপড়াতে লাগল। বড় দুঃখ হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করে গেল'

'জাহাজডুবি। কিন্তু আমি এমনি ছাড়ব না। ও সব কাম্পেনি বার করে দেব। তিরিশটি হাজার টাকার মামলা ঠুকে দেব। বাছাধন টের পাবেন।'

ভবতোষের জামাই এই বলেই ছুটবার আয়োজন করলে। বাধা দিয়ে বললাম, 'এখন ছুটতে ছুটতে যাচ্ছ কোথায়?'

'যাচ্ছি দেখতে। তারা সব ফিরে আসছে যে! জানেন ব্যাঙ কি রকম দেশভক্ত জীব? বিশেষ করে ঐ কুনো ব্যাঙগুলো। সব বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে গঙ্গা সাঁতরে চলে আসছে। এই মাত্র টেলিগ্রাম পেলাম। যাবেন দেখতে?

বললাম, 'বল কী হে? গঙ্গা সাঁতরে আসছে! চলো তো দেখে আসি।'

আউটরাম ঘাটে গিয়ে একটা নৌকো করা গেল। ফোর্ট ছাড়িয়ে খানিকটা যেতেই দেখলাম দূরে জলের ওপর কালো কালো কী সব লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে। ভবতোষের জামাই চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ দেখুন'। আরো কাছে এলে দেখলাম,—সে দৃশ্য জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলব না—দেখলাম, প্রশস্ত গঙ্গার এ পার ও পার জুড়ে জল আর দেখা যায় না—শুধু কুনো ব্যাঙ, আর কুনো ব্যাঙ। হাজারে হাজারে—কাতারে কাতারে উজান ঠেলে লাফিয়ে আসছে। ধন্য দেশভক্তি! চোখে জল এসে গেল।

এদিকে নৌকোর ওপর সেও এক দৃশ্য। ভবতোষের জামাই বুক ঠুকে, কপাল চাপড়ে, চুল ছিঁড়ে এমন লাফাতে শুরু করল যে নৌকোডুবি হয় আর কি! রীতিমত ভয় পেলাম, বললাম, 'বাবাজী, তোমার ঐ ব্যাঙদের দেশভক্তির জোর আছে, তাই তিন-শ মাইল দূরে থেকে ওরা ভেসে আসছে। কিন্তু আমি বাবা তিন হাতও যেতে পারব না। দয়া করে যদি একটু আস্তে লাফাও।' সে আর লাফাল না, বসে বসে কাঁদতে লাগল। বাস্তবিক বুক ফেটে যাবার কথাই বটে। ব্যাপার তো যে-সে নয়, দশ হাজার কোলা, তেরো হাজার কুনো, আর পঁচিশ হাজার তিন-শ কটকটে!

বাড়ি ফেরার পথে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। কদিন পরেই কাগজে পড়লাম, চীনদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, টাকায় চারটা করে ব্যাঙ বিক্রি হচ্ছে—ইত্যাদি। বুঝলাম ঐ জাহাজডুবির ফল। রামগতিকে আবার ডেকে পাঠালাম। সোজাসুজি বললাম, 'এই নাও পঁচিশ টাকা! রাতের গাড়িতেই বিক্রমপুর যেতে হবে। এই আষাঢ় মাসে খাল, বিল, নালায় নতুন জল এসেছে। বিস্তর ভাউয়া আর কোলা পাবে। অন্তত দশ হাজার আনা চাই-ই, এই

দ্ভিক্ষটা থাকতে থাকতে।' রামগতি বিরক্ত হয়ে বলল, 'এনে রাখব কোথায়? মার কথা কি আপনি ভুলে গেছেন নাকি?'

তাই তো! ব্যাপারটা যে আমার খেয়ালই ছিল না। রামগতির মা, অর্থাৎ আমার গৃহিণী সুন্দরবনের দেশের লোক। ছেলেবেলায় তিনি পোড়া কাঠ নিয়ে বাঘ তাড়াতেন, কিন্তু ব্যাঙ—দেখা দূরে থাক, নাম শুনলেই তাঁর একেবারে দাঁতকপাটি। সেবার সিঁড়ির নীচে একটা কটকটের ডাক শুনে এমন এক লাফ মেরেছিলেন যে তিন মাস বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল।

সুতরাং রামগতির ভাবনা হবার কথাই। কিন্তু ওদিকে চীনদেশের দুর্ভিক্ষ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ছেলেকে বললাম, 'ও-সব ভয় করতে গেলে চলে না। যতটা সম্ভব চুপে চুপে চালাতে হবে। লাভটাও তো দেখছ। ঐ তো ভব-তোষের জামাই বলছিল, বম্বের কোন ভিগবাজিরাম ঘ্যান্ঘ্যান্ওয়ালা শুধু কোলা ব্যাঙের দৌলতে একেবারে লাল হয়ে গেছে!'

কথাটা এবার রামগতির মনে লাগল। পরদিনই সে চলে গেল এবং দিন পনরো পরে ফিরে এল—সঙ্গে এক গোরুর গাড়ি বোঝাই প্রায় ৪০ বস্তা ভাউয়া। ভাগ্যক্রমে গিন্নী তখন তাঁর বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। রাতের মতো সেগুলো বাইরের ঘরেই রাখা হল। স্থির হল কাল ভোরেই একেবারে জাহাজে তুলে দিয়ে আসেতে হবে। আমি, রামগতি আর ভজা চাকর—এই তিনজন ছাড়া ব্যাপারটা আর কেউ জানল না।

সে রাত্রে আমাদের ভবানীপুরে এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল। গিন্নী সন্ধ্যার পরই ফিরে এসেছিলেন, কাজেই বাড়িতে তিনি একাই রইলেন। আর নীচের ঘরে রইল ভজা—যদি হঠাৎ কিছু দরকার হয় এইজন্য।

অনেক লোকের নেমন্তন্ন। আমাদের যখন ডাক পড়ল, রাত তখন প্রায় বারোটা। পেট কী বলছে, সে কথা না বললেও চলবে। দু-চারটে তরকারি খেয়ে সবে গলদা চিংড়ির মাথাটা মুখে তুলেছি, সে বাড়ির একজন লোক হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললে, 'হৃদয়বাবু টেলিফোন করছিলেন, বাড়িতে ভয়ানক বিপদ।' 'অ্যাঁ, বলেন কি?' গলদা চিংড়ি রইল পড়ে, দুজনেই উঠে পড়লাম। হৃদয়বাবু আমার পাশের বাড়ির প্রতিবেশী।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়া গিয়েছিল। বাড়ির সামনে আসতেই যা দেখলাম, বিপদ যে খুবই ভয়ানক তাতে আর সন্দেহ রইল না। দু-খানা ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আর একখানা পুলিসভ্যান্ লাল পাগড়িতে ভর্তি। এ ছাড়া লোকও জমেছে প্রায় শ-পাঁচেক। মনে হল বুকের ভেতরটা আর নড়ছে না। কি দেখব, কপালে কি আছে কে জানে? দরজা খোলাই ছিল। বহু কষ্টে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখলাম, নীচে কেউ নেই, সেই

ব্যাঙগুলো চারিদিকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। সিঁড়িতেও সেগুলো একেবারে ঠাসা। উঠতে গিয়ে দু-চারটাকে মাড়িয়েও দিলাম। শোবার ঘরের মেঝেতেও তাদেরই দৌরাত্ম্য। কিন্তু গিন্নী কই? রামগতি চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। তিনি ছাদের ওপর থেকে সাড়া দিলেন। ছুটে গিয়ে দেখলাম, সেখানেও ব্যাঙের ভিড়, তবে অনেকটা কম। তিনি ছাদের পাশে রেলিংএর উপর উঠে ক্রমাগত চেঁচাচ্ছেন। পড়ে যান নি যে সেইটেই আশ্চর্য। বললাম, 'কী ব্যাপার,ভজা কৈ?'

তিনি একেবারে জ্বলে উঠলেন, 'এ সব কোত্থেকে এল?' রামগতি অনেক করে তাঁকে নামিয়ে নীচে নিয়ে গেল। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হৃদয়-বাবুর সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলাম।

হৃদয়বাবু বললেন—রাত যখন প্রায় এগারোটা, হঠাৎ আমার ছাদ থেকে একটা চীৎকার শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। বারান্দায় এসে দেখেন, একটি মহিলা রেলিংএ উঠে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন। বারংবার জিজ্ঞেস করেও কোনো উত্তর না পেয়ে অগত্যা ফায়ার-ব্রিগেডের আড্ডায় খবর দিয়েছেন, আর লালবাজার পুলিস-ঘাঁটিতে ফোন করে দিয়েছেন। আমাকেও ঐ সঙ্গে ফোন করেছিলেন।

শোবার ঘরে ফিরে এসে চারদিক চেয়ে ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা গেল। দেখলাম, লোহার সিন্দুকের ডালা খোলা, ভিতরে গয়নার বাক্স নেই, টাকা-কড়ি যা ছিল তাও নেই। ভজা চাকরের খোঁজ পাওয়া গেল না। গিন্নী বললেন, তিনি দরজা খুলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ দুপ্ দাপ্ শব্দ শুনে জেগে ওঠেন। অতগুলো ব্যাঙ দেখে দৌড়ে ছাদে চলে গেছেন, আর কিছু জানেন না। অর্থাৎ আমরা যখন ব্যাঙের বস্তা জড়ো করে রাতারাতি রাজা হবার স্বপ্ন দেখছি, তখন তারই গোটা কয়েক খুলে আমারই চাকর আমাকে একেবারে ফকির বানিয়ে রেখে গেল। তার মনিব ঠাকরুনটিকে সে ভালো করেই চিনেছিল। চুরি অনেক রকম শুনেছি, কিন্তু এ রকমটা যে হতে পারে কে ভেবেছিল?

নীচে আসতেই দমকলের সাহেব জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার বাবু, ফায়ার?'

বললাম, 'না, সাহেব, ফায়ার নয়, ফ্রগ্‌স্।'

'ড্যাম্'—বলে সে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে গেল। পুলিসের গাড়িও গেল।

কিন্তু লোকগুলো আর যেতে চায় না। আমার মাথা তখন একেবারেই ঠিক নেই। শোবার ঘরে গিয়ে দেখলাম গোটা দুই বস্তা তখনও খোলা হয় নি। সেইগুলোর মুখ খুলে রাস্তায় ঢেলে দিলাম। আধ-সের তিন-পো ওজনের এক-একটি ভাউয়া—মাথায় পড়তেই সবাই 'বাবাগো' বলে পথ দেখল।

তারপর? তারপর জেনে আর কী হবে? রামগতির নতুন জুতো এসেছে। তাই পরে দুবেলা সে আবার অফিসে অফিসে ঘুরছে।

অপরূপ-কথা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মস্ত বড় রাজা—এ কালের নয়, সেকালের।—সুতরাং লোক-লস্কর সৈন্য-সামন্ত হাতী-ঘোড় বিস্তর—তার আর লেখা-জোখা নেই।

রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যেতে সারা দিন লেগে যায়। অবশ্য একটু বেলা করে বেরোতে হয়। মাঝে ঘণ্টা আষ্টেক জিরিয়েও নিতে হয় বই কি!

হাতীশালে হাতী—হাতী ছিল, আপাততঃ মরে গেছে। ঘোড়াশালে ঘোড়া কিন্তু আছে। বুড়ো হয়ে বাতে আর চলতে পারে না, কিন্তু তা হোক, চিঁহি চিঁহি করে ডাকে—খাবার না পেলে।

লোক-লস্কর ত বলেছি লেখা-জোখা নেই। হাঁক দিলে অমন পিলপিল করে চার পাঁচজন বেরিয়ে পড়তে পারে—সব সময়ে অবশ্য বেরোয় না। মাস কয়েক মাইনে না পেয়ে একটু বেয়াড়া হয়ে পড়েছে।

সুতরাং মস্ত বড় রাজা।

রাজার জমকালো দরবার। মন্ত্রী, কোটাল, পাত্র-মিত্র, প্রহরী প্রভৃতি রাজাকে ঘিরে আসর জমিয়ে বসে থাকে। প্রভৃতি অবশ্য একজন ছোকরা চাকর। তাকে নিয়ে হল ছ'জন।

মন্ত্রী সব সময় থাকতে পারেন না, মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে তাঁকে বাজার টাজার করে আনতে হয়। কোটাল রান্না চড়িয়ে সময় পেলেই কিন্তু এসে বসেন। পাত্র-মিত্র ঠায় বসে থাকেন। তাঁদের একজনের বাত, আর একজনের হাঁফানি, দরবারের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করলে বাড়ে।

রাজসভায় রাজ-কার্য চলে সারাদিন।

গোমড়া মুখে সবাই বসে থাকেন। রাজা থেকে থেকে পিঠের জামা তুলে ডাকেন—'মন্ত্রি!'

ব্যস, আর কিছু বলতে হয় না। মন্ত্রী বজ্রগম্ভীর হাঁক দিয়ে ডাকেন—'প্র হ রী!' প্রহরী এসে লম্বা কুর্নিশ করে ট্যাঁক থেকে ঝিনুক বার করে দেয়।

মন্ত্রী রাজার পিঠ চুলকে দেন।

খানিক বাদে রাজা বলেন—'হুঁ!'

মন্ত্রী চুলকান থামিয়ে প্রহরীর হাতে ঝিনুক ফিরিয়ে দেন। প্রহরী আবার কুর্নিশ করে ঝিনুক ট্যাঁকে গুঁজে নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

আবার সব চুপচাপ। খানিক বাদে রাজা মন্ত্রীর দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে বলেন—'মন্ত্রি!'

কাঁপতে কাঁপতে মন্ত্রী বলেন, 'হুজুর!'
'তোমার গর্দান যাবে জান?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ!'
'কেন জান?'
'আজ্ঞে না!'
রাজা ধমক দিয়ে বলেন, 'কি? জান না?'
মন্ত্রী শশব্যস্ত হয়ে বলেন, 'আজ্ঞে জানি।'
'বল কেন?'
মন্ত্রী আমতা আমতা করেন।
রাজা ধমক দিয়ে বলেন—'অকর্মণ্য গাধা! এত বড় একটা রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে কেন তোমার গর্দান যাবে তা তুমি বলতে পার না?'
মন্ত্রীর হঠাৎ বুদ্ধি খুলে যায়। বলেন, 'হুজুর, এত বড় রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে এই সামান্য কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব? এ হ'ল কোটালের কাজ!'
রাজা বলেন, 'হুঁ, ঠিক বলেছ। বল কোটাল।'
কোটাল কানে একটু খাট। শুনতে পায় না। মাথা নীচু করে নিজের মনে বিড়বিড় করে।
রাজা আবার হাঁক দেন—'কোটাল!'
এবার কোটাল শুনতে পায়, লাফ দিয়ে উঠে কুর্নিশ করে বলে. 'হুজুর!'
'কেন মন্ত্রীর গর্দান যাবে?'
কিন্তু তাতে হয় না। অগত্যা কোটালের কানটা ধরে তার কাছে টেনে মন্ত্রীকে চেঁচিয়ে বলতে হয়, 'কেন আমার গর্দান যাবে রাজা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন।'
এক গাল হেসে এবার কোটাল বলে, 'আজ্ঞে, এর আগেই যাওয়া উচিত ছিল, ওর মুখখানা যা বিশ্রী।'
মন্ত্রীর চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে।
রাজা বলেন—'চোপ্ হ'ল না।'
'আজ্ঞে হ্যাঁ' বলে কোটাল থপ্ করে বসে পড়ে।
রাজা বলেন, 'যে বলতে পারবে তার বকশিস মিলবে, ভুল হলে গর্দান।'
সবাই সবার মুখের পানে চায়, কেউ রা করে না।
রাজা এক এক করে জিজ্ঞাসা করেন। কেউ কথা কয় না। সব শেষে ডাক পড়ে ছোকরা চাকরের।
ছোকরা চাকর একা একাই মেজেয় বসে তাস নিয়ে পেটাপেটি খেলে। রাজার ডাকে মুখ না তুলেই বলে—'আজ্ঞে চুলকোন বেশী হয়েছে, আপনার পিঠ জ্বালা করছে।'

'ঠিক'—

সবাই মাথা নেড়ে বলে—'ঠিক, হতভাগা আগে না বললে, আমরাও বলতে যাচ্ছিলাম।'

রাজা বলেন—'নাও বকশিস!'

ছোকরা চাকর মাথা না তুলেই বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয়। রাজা এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে শেষকালে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা আস্ত টাকা বার করে দেন।

ছোকরা চাকর সেটা ঠং করে মাটিতে ঠুকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে,—'এটা অচল।'

রাজা টাকাটি আবার পকেটে পুরে বলেন—'আচ্ছা কাল নিও।'

তারপর আবার চুপচাপ।

রাজার স্মরণশক্তি অত্যন্ত বেশী। ঘণ্টা কয়েক বাদে মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বলেন, 'তোমার না গর্দান যাবে?'

'আজ্ঞে যাবে বই কি! তবে আজকে ত' আর হয় না, আজ কোথাও যাত্রা নাস্তি।'

'বেশ, কাল যেন মনে থাকে!'

খানিক বাদে রাজার হাই উঠে। রাজা বলেন, 'ব্যস্, আজকের মত সভা ভঙ্গ।'

এমনি করে রাজ্যশাসন চলে। রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। অবশ্য বাঘ জল ছাড়া আরো কিছু খায়। চোর ডাকাত রাজ্যের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। তাদের মজুরি পোষায় না।

এ হেন সুখের রাজ্যে একদিন বিপদ ঘটল।

রাজা সভায় বসে আছেন। মন্ত্রী গেছেন বাজারে, কোটাল রান্নাঘরে; ছোকরা চাকর এসে পেঁাছোয় নি। এমন সময় প্রহরী কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে বললে,—'হুজুর দূত এসেছে।'

রাজার ঘুম এসেছিল। চোখ বুজে বললেন, 'গর্দান নাও।'

'হুজুর দূত!'

রাজা বললেন, 'দুত্তোর!'

মন্ত্রী ততক্ষণে বাজার-টাজার সেরে পোঁটলা হাতে সভায় এসে পেঁাছেচেন। ব্যাপার বুঝে একটু গলা চড়িয়ে বললেন—'হুজুর দূত যে অবধ্য!'

'অবাধ্য হলে ত আর কথাই নেই, আগে মাথা নাও!'

রাজার বিদ্যের বহর স্মরণ করে মন্ত্রী বললেন, 'আজ্ঞে দূতকে যে মারতে নেই শাস্ত্রে বলে—আর তা'ছাড়া ও যে রামনগরের দূত।'

রাজার ঘুম-টুম উবে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে সভয়ে বললেন—'এ্যাঁ

রামনগরের দূত, কোথায়? শুনতে টুনতে পায়নি ত! রামনগরের রাজাটা যা গোঁয়ার আর চোয়াড়, এক্ষুণি যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে—একটা ছুতো পেলে হয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, শুনেছি তাঁর পুরানো তরোয়ালটায় শান দেবার পর থেকে তিনি সেটার ধার পরীক্ষা করবার জন্যে উস্‌খুস্‌ করছেন।'

'তাই নাকি, আর তোমরা তার দূতকে রেখেছ বসিয়ে? দেখ আবার কি ফ্যাসাদ বাধিয়েছে।'

ছোকরা চাকর ততক্ষণে এসে পড়েছে। দূতকে ডেকে এনে সে-ই হাজির করে দিলে।

দূত এসে কুর্নিশ করে বললে—'হে রাজন্‌!'

রাজা আঁৎকে উঠে বলে ফেললেন—'এ্যাঁ!'

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্যে তাঁর কানে কানে বলে দিলেন, 'আজ্ঞে ভয় নেই, ওদের ওই রকম বলাই দস্তুর।'

দূত তখন বলে চলেছে 'শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত পরম পরাক্রান্ত সসগরা-ধরণীর অধিপতি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিলোকের পালক, চন্দ্রসূর্য যাঁহার মার্বেল-গুলি, নক্ষত্রমণ্ডলী—'

রাজা ফ্যালফ্যাল করে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি কানে কানে বললেন, 'একটু সবুর করুন মহারাজ, আর একটুখানি বাকি।'

'—যাঁহার ঝাড়লণ্ঠন, হিমালয় যাঁহার ইটের পাঁজা, নদী-সমুদ্র যাঁহার নালা-ডোবা, সেই মহামহিম অজর অমর অজেয় রামনগরের মহারাজের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া এই পত্র আপনাকে প্রদান করিলাম।'

দূত রাজার হাতে একটি চিঠি দিলে।

রাজার মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল, বললেন—'তাই বল, চিঠি এনেছ, আমি ভাবি কি-না ব্যাপার!'

তারপরেই রাজা মুখ গম্ভীর করে এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে বললেন, 'এই যাঃ, চশমাটা ত ফেলে এসেছি। নাও পড়ত হে মন্ত্রী!'

মন্ত্রী এর মধ্যে বাজারের পোঁটলা হাত-সাফাই করে সিংহাসনের তলায় লুকিয়ে ফেলেছেন। চিঠি হাতে নিয়ে তিনিও একবার এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে বললেন—'আজ্ঞে আমিও দেখছি চশমাটা আনিনি। পড়হে কোটাল, তোমার ত খুব চোখের জোর।'

মন্ত্রীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে কোটালকে বাধ্য হয়েই চিঠিটা নিতে হয়।

তারপর উল্টে-পাল্টে, একবার কাছে একবার দূরে—নানা রকমে ধরেও কোটালের চিঠি পড়া আর হয় না।

রাজা ধমক দিয়ে বললেন—'কই হে পড় না, ভারি ত একটা চিঠি তাই পড়তে দিন কাটাবে নাকি! নেহাত চশমাটা ফেলে এসেছি, থাকলে দেখিয়ে দিতাম!'

কোটাল কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—'আজ্ঞে পড়তে ত এক্ষুণি পারি, কিন্তু এর যে আগাগোড়া ব্যাকরণ ভুল। এমন অশুদ্ধ ভাষা কেমন করে মুখ দিয়ে বার করব!'

ছোকরা চাকর এতক্ষণ এক ধারে দাঁড়িয়ে পান চিবুচ্ছিল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা টেনে নিয়ে বললে—'থাক কাউকে পড়তে হবে না।'

মন্ত্রী অমনি বলে উঠলেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ত বাবা, এই ত তোমাদের পড়বার বয়স!'

কোটাল সায় দিয়ে বললে—'আর তোমাদের ত অত শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার নেই। পড়লেই হ'ল।'

ছোকরা চাকর চিঠিটা মনে মনে পড়ে ফেলে বললে—'রামনগরের মহারাজ আপনার ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন। তিন দিনের ভেতর রাজপুত্র নিয়ে বিয়ের জন্যে রওনা না হলে রামনগর থেকে সাত হাজার সেনা তাঁকে নিতে আসবে।'

এবার সভাশুদ্ধ সকলের মুখ শুকিয়ে গেল।

রাজা ঢোঁক গিলতে গিলতে বললেন—'সাত হাজার! ঠিক পড়েছ ত হে, সাত হাজার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সাত হাজার পদাতিক আর তিন হাজার ঘোড়-সওয়ারের কথাও আছে।'

'আবার ঘোড়-সওয়ারও আছে!'—রাজার প্রায় ভির্মি যাবার অবস্থা।

ভির্মি যাওয়া আশ্চর্য নয়। প্রথমতঃ রাজার ছেলেই হয়নি ত রাজপুত্র পাঠাবেন কেমন করে? আবার না পাঠালে সাত হাজার সৈন্যের নিতে আসা মানে যে কি তাও আর বোঝা শক্ত নয়। সেকালে যুদ্ধ-টুদ্ধ অমনি করেই হত কি না!

রাজা মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকান, মন্ত্রী তাকান কোটালের দিকে। পাত্র-মিত্র মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

এখন উপায়!

রাজা বার কয়েক ঢোঁক গিলে আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন—'ওহে দূত—ওর মানে কি! বুঝেছ কিনা—অর্থাৎ—ওই যে কি বলে—বল না হে মন্ত্রী!'

'এই যে বলি মহারাজ—' মন্ত্রী একবার বেশ করে গলা খাঁকরি দিয়ে নিয়ে শুরু করলেন—'ওহে দূত, ওর মানে কি—বুঝেছ কি না—'

দূত এতক্ষণ পর্যন্ত কিঞ্চিৎ জলযোগের আশায় থেকে থেকে এইবার তার কোন সম্ভাবনা নেই দেখে চটে গিয়েছিল—বললে—'যা বলবার তাড়াতাড়ি সেরে নিন মশাই, আমার ত আর সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না—খাওয়া দাওয়া ত আছে।'

কিন্তু এত বড় ইশারাটাও মাঠে মারা গেল। রাজা বললেন—'নিশ্চয়ই! বল না হে মন্ত্রী যা বলবার।'

ছোকরা চাকর এবার এগিয়ে এসে হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বললে—'ওহে বাপু দূত!'

দূত চটে উঠে বললে, 'ওহে বাপু কি হে!'

'আচ্ছা, না হয় ওহে বাছা দূত, তোমার রাজাকে গিয়ে বোলো যে রাজপুত্র গেছেন শিকারে, শিকার থেকে ফিরেই তিনি যাবেন বিয়ে করতে।'

সভাশুদ্ধ সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দূত রাগে গসগস করতে করতে বলে গেল—'কিন্তু বেশী দেরি হলে আমরা নিতে আসব, মনে থাকে যেন।'

তারপর একমাস যায়, দুমাস যায়।

রামনগর থেকে দূত এসে জিজ্ঞাসা করে—'কই রাজপুত্র শিকার থেকে ফিরল'

ছোকরা চাকরই জবাব দেয়—'ফিরবে বই কি, এই ফিরল বলে!'

কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলে? রাজপুত্র আর না পাঠালে নয়!

ছোকরা চাকর বলে, 'মহারাজ, রাজপুত্র খুঁজুন।'

রাজা বলেন—'ঠিক বলেছ। প্রহরী, রাজপুত্র খুঁজে আন।'

প্রহরী এসে কিন্তু মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নড়ে না চড়ে না।

মন্ত্রী বলেন, 'মহারাজ, রাজপুত্রের চেহারাটা কি রকম হবে একটু আঁচ না পেলে ওই বা খোঁজে কেমন করে!'

রাজা বলেন—'কেন? এই আমার মত চেহারা!'

মন্ত্রী রাজার চেহারার দিকে বার কয়েক তাকিয়ে মাথা চুলকোতে থাকেন!

রাজা চটে উঠে বলেন—'চুপ করে আছ যে বড়! আমার চেহারাটা বলতে চাও খারাপ!'

'আজ্ঞে মহারাজ, তা কি বলতে পারি! তবে কিনা আপনার মত সুপুরুষ এ রাজ্যে আর কোথায় পাবে তাই ভাবছি!'

রাজা খুশী হয়ে দন্ত বিকশিত করে বলেন, 'তা বটে, তা বটে! তবে কি হবে!'

মন্ত্রী বলেন—'এই ধরুন আমাদের—এই না হয় আমারই মত।'

কোটাল কানে খাট হলেও এ কথাটা শুনতে পায়। তাড়াতাড়ি উঠে প্রতিবাদ করতে যায় কিন্তু দরকার হয় না। রাজা তার আগেই হো হো করে হেসে উঠে বলেন—'পাগল হয়েছ! রাজকন্যা ভয় পেয়ে মূর্ছা যাক আর কি!'

মন্ত্রী মুখ চোখ লাল করে গম্ভীর হয়ে যান।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় রাজার মত চেহারাই দরকার, তবে অতটা ভাল না পেলে ক্ষতি নেই।

চেহারা মেলে কিন্তু রাজপুত্র হতে কেউ রাজী হয় না। রামনগরের মেয়েদের বড় বদনাম। তারা নাকি বড় বেশী লেখাপড়া জানে—ফট্ করে যদি কিছু শুধিয়েই বসে!

এদিকে রামনগরের আর তর্ সয় না। এবার রাজপুত্র না গেলে তারা নিতে আসবেই—দূত বলে গেল।

অগত্যা রাজাকে বরযাত্রী নিয়ে বেরুতেই হয়।

বরের পাল্কী খালিই চলে। রাজা বলেন—'ওহে মন্ত্রী; চোখ দুটো একটু সজাগ রেখো। তেমন তেমন দেখলেই তুলে নেবে!'

কিন্তু তেমন তেমন আর মেলে না, বরযাত্রীর দল কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে রামনগরে ঢোকে!

লোকজন ছুটে আসে—'বর কই, বর কই' বলে।

রাজা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলেন, 'মন্ত্রী, এইবার যে গেলুম!'

ছোকরা চাকর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সকলকে হাঁকিয়ে দেয়—'বিয়ের আগে আমাদের বর দেখাতে নেই।'

রাজা বলেন—'ঠিক ঠিক, মনে ছিল না।'

মন্ত্রী বলেন—'ঠিক বটে, মনে ছিল না।'

কিন্তু বিয়ের দিন ত আর চালাকি চলে না। রামনগরের লোক এসে বলে—'বর কই?'

রাজা চান মন্ত্রীর মুখে।

মন্ত্রী চান রাজার মুখে।

ছোকরা চাকর বলে—'আমাদের বিয়ের নিয়ম আলাদা।'

'কি নিয়ম?'

'আমাদের বর সভায় বসে ছদ্মবেশে! রাজকন্যাকে খুঁজে বার করে মালা দিতে হয়।'

তারা বলে—'আচ্ছা, তাই সই।'

মস্ত বড় বিয়ের সভা। লোক জন গিজগিজ করে। সভা জুড়ে বরযাত্রীর দল বসে থাকে। রাজকন্যা মালা হাতে করে সভায় ঢোকেন। এদিক ওদিক চেয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে মালা পরিয়ে দেন—ছোকরা চাকরের গলায়।

রাজা চমকে উঠে বলেন—'য়্যাঁ, ও যে—'

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁর গা টেপেন।

রামনগরের রাজা চোখ পাকিয়ে বলেন—'ও যে—মানে?'

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে বললেন—'আজ্ঞে 'ও যে' নয়, ওই যে।'

তবু কটমট করে তাকিয়ে রামনগরের রাজা বলেন—'ওই যে কি?'

'আজ্ঞে মহারাজ বলতে যাচ্ছিলেন এই যে আমাদের রাজপুত্র!'

রামনগরের রাজা হেসে বলেন—'তাই বল। সে আর কে না জানে!'

রাজা বর কনে নিয়ে ঘটা করে দেশে ফেরেন। রামনগরের রাজ-দরবারে হাসাহাসির ধুম পড়ে যায়। রামনগরের রাজা বলেন, 'আচ্ছা বোকা বানান গেছে, কি বল মন্ত্রী?'

রামনগরের মন্ত্রী বলেন—'আজ্ঞে যা বলেছেন।'

রাজা বলেন—'একেবারে বোকার দেশ, কি বল! রাজকন্যা আর মন্ত্রিকন্যার তফাত বুঝতে পারল না! ছ্যা ছ্যা!'

কথাটা মন্ত্রীর ভাল লাগে না। তবু রাজার সঙ্গে হাসতে হয়। হাসতে হাসতে বলেন, 'কিন্তু রাজপুত্রের চেহারাটা ভাল। রাজা হলে মানাবে।'

রামনগরের রাজা চট্ করে চটে উঠে বলেন—'তার মানে?'

মঙ্গল-পুরাণ

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

কৌরাভা-লজের চাকর-বাকর, বয়-বাট্‌লার আজ বড়ই ব্যস্তভাবে উদ্বিগ্ন মুখে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

ব্যাপার কি, আবার কুরু-পাণ্ডবের লড়াই বাধিবে নাকি? উঁহু, সেদিকে নিশ্চিন্ত! 'লিগ-অব-নেসন্স্‌' ভীমার্জুনের উপর নোটিশ জারি করিয়া দিয়াছে, পিক্‌নিকের উদ্দেশ্যে দু'চারটা পাখী-টাখী তাঁরা মারেন তো স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু যুদ্ধের জন্য গাণ্ডীবে টঙ্কার, অথবা গদা লইয়া হুঙ্কার দিলেও তারা স্রেফ্‌ 'হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক' করিয়া বসিবে। সত্যি সত্যিই অতগুলি লোক যদি না খাইয়া মারা পড়ে, সেই ভয়ে ধর্মপ্রাণ যুধিষ্টির গাণ্ডীব নিয়া একেবারে ইম্পিরিয়াল্‌ ব্যাঙ্কে জমা দিয়া দিয়াছেন। বাড়িতে তালা বন্ধ করিয়া রাখিতেও ভরসা পান নাই, কি জানি ভীম ক্ষেপিয়া উঠিলে তো আর কোন তালাতেই কুলাইবে না!

তবে কৌরাভা-লজে এত চাঞ্চল্য কেন? একটু ইতিহাস আছে, গোড়াতে সেটুকু শুনিয়া লওয়া দরকার।

দিন পাঁচেক হইল 'পাণ্ডব প্যালেসের' মেজ বউ সুভদ্রা বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়াছেন। আসিবার দিন গহনার বাক্স গুছাইবার সময় গোলমালে কেমন করিয়া ছোড়দা কৃষ্ণের স্যমন্তক-মণিখানাও সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। ঠিক তার পরের দিনই ছিল 'কৌরাভা-লজে' এ বাড়ির সকলকার নিমন্ত্রণ। হাজার হোক, মেয়ে মানুষ তো বটে; সুভদ্রা অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত স্যমন্তক মণিখানাও পরিয়া লইতে ভুলিলেন না। স্যমন্তকের অপূর্ব ছটায় নিমন্ত্রণ-সভা ঝলসিয়া উঠিল; দেখিয়া দুর্যোধনের স্ত্রীর বুকে শূলের ব্যথা ধরিয়া গেল। ভীমনাগের ভাল ভাল সন্দেশগুলি তাঁর মুখে কুইনিনের মত বিস্বাদ বলিয়া মনে হইল। তারপর পাণ্ডবদের 'রোল্‌স্‌-রয়েস্‌' ও গেটের বাহিরে গেল, আর দুর্যোধনের রানীও গিয়া গোসা-ঘরে খিল দিলেন।

খানিক বাদেই কথাটা দুর্যোধনের কানে উঠিল। মানী লোক তিনি, তাঁর অভিমান-বহ্নি হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গোসা-ঘরের দরজার কাছে গিয়া তিনি রানীকে জানাইলেন, তাঁর কোন ভাবনা নাই, এক সপ্তাহের মধ্যে এমন একখানা মণি তাঁহাকে তিনি আনিয়া দিবেন যার কাছে 'কেষ্টার' স্যমন্তক কৌস্তুভ কিছুই লাগিবে না। তিনি যেন অনর্থক আর গোসা-ঘরে ঠাণ্ডা মেঝেতে না শুইয়া থাকেন, শহরে বড় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়াছে।

সেই দিনই দুর্যোধন পাতালে সর্পরাজ বাসুকীর নিকট দালাল পাঠাইলেন—তাঁর নিজের মাথার মণিটি বেচিতে পারেন কি না? অবশ্য উপযুক্ত দাম দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন! দালাল ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, ইলেক্ট্রিক করপোরেশন গড়িমসি করিয়া আজ পর্যন্ত বাসুকীর রাজ্যে বিজলী-বাতির কানেক্‌সন্‌ দেয় নাই। যেটুকু কেরোসিন তেল পাতালে ছিল তাও একদিকে আমেরিকার রকফেলার সাহেব, আর অন্য দিকে বর্মা অয়েল কোম্পানী শুষিয়া লইতেছে। এখন মণি বিক্রি করিলে তাহাদের অন্ধকারে দিন চলিবে কি করিয়া? সে তারা কেউ বেচিতে পারিবে না।

কিন্তু মণি দিতে না পারিলেও সর্পরাজ বাসুকী দুর্যোধনকে দালাল মারফত একটা হদিস দিয়া দিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, সম্প্রতি ইয়োরোপে নাকি লোকদের উপর খুবই বেশী করিয়া ট্যাক্স চাপান হইতেছে। তার ফলে বড় লোকেরাও ট্যাক্সের যোগান দিতে না পারিয়া যেখানে যার হীরা-মণি-জহরত ছিল সব কুবের মহাশয়ের নিকট বাঁধা দিয়া টাকা ধার নিতেছেন। কাজেই কুবেরের নিকট খোঁজ করিলে হয়তো ভাল ভাল দু'চারখানা মণি পাওয়া যাইলেও যাইতে পারে।

সেদিনই দুর্যোধন কুবেরকে টেলিফোনে ডাকিয়া খবর পাইলেন যে প্রসিদ্ধ ধনী লর্ড্‌ পেনি-ওয়াণ্টিং-এর বিশ্ববিখ্যাত তিনখানা মণি—'ম্যাচ্‌লেস', 'প্রাইস্‌লেস্‌' এবং 'ওয়ার্থলেস্‌' তাঁর নিকট বাঁধা ছিল; টাকা দেওয়ার মেয়াদ ফুরাইয়া যাওয়ায় 'ম্যাচ্‌লেস্‌' এবং 'প্রাইস্‌লেস' বিক্রি হইয়া গেছে। তবে ও দু'টো অল্প দামী মাল, আসল দামী মাল হইতেছে 'ওয়ার্থলেস্‌'। সেটা এখনও হাতে আছে, দুর্যোধন ইচ্ছা হইলে কিনিতে পারেন।

অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর 'ওয়ার্থলেসের' দর ঠিক হইল। কথা রহিল, জয়দ্রথ এবং ভূরিশ্রবা এরোপ্লেনে অলকায় গিয়া সেখানা লইয়া আসিবেন।

নির্দিষ্ট দিনে জয়দ্রথ এবং ভূরিশ্রবা রওনা হইয়া গেলেন; কিন্তু আসিবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবু তাহাদের ফিরিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অলকা হইতে ফোনে জানা গেল, 'ওয়ার্থলেস' লইয়া তাঁরা রওনা হইয়া পড়িয়াছেন; তবে পথে এত দেরির হেতু কি?

ক্রমে একে একে সাত দিন যখন কাটিয়া গেল, এবং জয়দ্রথের রথ, বা ভূরিশ্রবার ভুঁড়ি—কিছুরই যখন সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখা গেল, তখন দুর্যোধন বিচলিত হইয়া সহদেব-ইনিস্টিটিউটে ব্যাপারটা পেশ করিলেন।

সহদেব-ইন্‌স্টিটিউটে ঘটনা পেশ করার অর্থ এ নয় যে সেটা একটা ডিটেক্‌টিভদের আড্ডা,—সেটা হইতেছে জ্যোতিষীদের আস্তানা। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর বছরই ভুবনবিখ্যাত জোতির্বিদ ডক্টর সহদেব সেই টাকায়

কসৌলিতে ঠাণ্ডা পাহাড়ের উপর এই ইন্‌স্টিটিউট্‌ বসাইয়াছেন। ডক্টর সহদেব সাধারণতঃ হস্তিনাপুরেই থাকেন, তবে মাঝে মাঝে কসৌলি গিয়া এক একবার কাজকর্ম দেখিয়া আসেন।

সহদেব ইন্‌স্টিটিউট্‌ হইতে রিপোর্ট আসিল বড়ই আশ্চর্যজনক—'ওয়ার্থ-লেস্‌' পৃথিবীতে নাই—মঙ্গল গ্রহে। অলকা হইতে ফিরিবার সময় জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবার ইচ্ছা হইয়াছিল এভারেস্টটা ডিঙ্গাইয়া আসে। সেখানে এভারেস্টের চূড়ায় ওয়ার্থলেস্‌ পড়িয়া গিয়াছিল। লজ্জায় জয়দ্রথ এবং ভূরিশ্রবা হস্তিনাপুরে আসিতে পারিতেছে না। মঙ্গলে কি করিয়া মণি গেল তা তারা বলিতে পারে না। দুর্যোধন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ঠিক এই সময় 'হস্তিনাপুর পত্রিকায়' বড় বড় অক্ষরে হেড্‌ লাইন্‌ দিয়া এক বিচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হইল।

পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন হইতেই অনুমান করিয়া আসিতেছেন, মঙ্গল-গ্রহে নাকি এক প্রকার অত্যন্ত বুদ্ধিমান জীবের বাস আছে। বুদ্ধিতে তাদের তুলনায় মানুষ নিতান্ত শিশু। এই অত্যন্ত বুদ্ধিমান জীবের সহিত মানুষের আলাপ ঘটানো নিতান্ত আবশ্যক। পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামাইয়া ঠিক করিয়াছেন, একটা হাউই বা রকেটে মানুষ পুরিয়া কামানের সাহায্যে সেটাকে মঙ্গলগ্রহে পাঠাইতে পারিলে অতি সহজেই ওখানকার জীবেদের সহিত মানুষের এই আলাপ ঘটিয়া যায়। বিশ্বকর্মা এণ্ড্‌ কোং-এর কারখানায় হাউই তৈরির অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, সেটা প্রস্তুত হইয়াছে। হাউইয়ে চড়িয়া কে কে মঙ্গলে যাইবে, তাই নিয়া এখন কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে, পার্টি ঠিক হইলেই হাউই ছাড়া হইবে।

খবরটা দুর্যোধন বেশ, বে-শ করিয়া বার দুই তিন পড়িলেন, ধীরে ধীরে তাঁর মগজের কোণায় একটা মতলব উঁকি মারিয়া উঠিল। বিধাতা বোধ করি 'ওয়ার্থলেস্‌' উদ্ধারের একটা সুবর্ণ-সুযোগ ঘটাইয়া দিলেন রে! যদি তাঁর কোন আপনার লোককে এই রকেট পার্টির সঙ্গে মঙ্গলে পাঠাইতে পারেন তো কেমন হয়? এই ধরণের কার্য-উদ্ধারের জন্য অবশ্য বৃকোদর ভায়াই সব দিক দিয়া সরেস, কিন্তু সে কি রাজী হইবে তাঁর জন্য এতটা মেহনত স্বীকার করিতে? ছোটবেলা হইতেই দুজনার যে রেষারেষি ভাব! দেখা যাক, একবার দুঃশাসনের সঙ্গে কন্‌সাল্ট্‌ করিয়া—সে কি বলে! বেহারার উদ্দেশে দুর্যোধন ক্রিং ক্রিং করিয়া কলিং বেল বাজাইলেন।

বেহারা আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইতেই তার উপরে দুঃশাসনকে ডাকিয়া দিবার হুকুম হইল। ফলে একটু বাদেই দুঃশাসন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ হে, দুঃশু, আজকের পেপারটা দেখেছ?'

বাধা দিয়া দুঃশাসন বলিলেন, 'শুধু দেখা দাদা! একেবারে ওয়ারলেস্ পাঠিয়ে দিয়ে আসছি, মঙ্গলে যে রকেট যাচ্ছে—আমার জন্যে একটা সীট্ যেন তাতে রাখা হয়, আমিও সেই সঙ্গে যাব।' তারপর একটু এদিক-ওদিক তাকাইয়া খাটো গলায় বলিলেন, 'পান্ডবদের মুখে চুণ-কালী মাখাবার এত বড় সুযোগ আর পাব না! মঙ্গল থেকে ফিরে এলে আমাদের জয়-জয়কার পড়ে যাবে। অর্জুনের সেবারকার অলিম্পিক গেমে চাম্পিয়ান হওয়া, সহদেবের গত বছর নোবেল-প্রাইজ পাওয়া—এক চালে সমস্ত ঢেকে দেব।'

দুর্যোধন সোফা হইতে উঠিয়া দুঃশাসনকে কোল দিলেন।

একথা-সেকথার পর দুঃশাসন বিদায় লইতেছিলেন, ভুলিয়া-যাওয়া কোন কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেলে মানুষ যে ভাবে কথা পাড়ে, ঠিক সেই ভাবে দুর্যোধন বলিলেন, 'আর দেখ দুঃশু, শুনলাম তোমার বৌদির জন্যে হালে কেনা 'ওয়ার্থলেস্' মণিখানা নাকি কি করে মঙ্গল-গ্রহে চলে গেছে। একবার খোঁজ করে সেখানা উদ্ধার করে আনবার চেষ্টা ক'র তো!'

দুঃশাসন তুড়ি মারিয়া কহিলেন, 'কুছ্ পরোয়া নেই দাদা, সে মণি আমি নিয়ে ফিরবই।'

পাছে যাত্রার সময় গান্ধারী আবার কোন ফ্যাসাদ বাধাইয়া বসেন, তাই দুই ভাই পরামর্শ করিয়া শকুনি মামার সহিত তাঁকে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে তীর্থ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র একটু 'কিন্তু কিন্তু' করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও বুঝাইয়া সুঝাইয়া ঠান্ডা করা হইল। দিন পনরো পরে বড় বড় হেড্ লাইন বুকে লইয়া আবার 'হস্তিনাপুর পত্রিকা' বাহির হইল—ফেরিওয়ালারা চেঁচাইতে লাগিল—'মোঙ্গোল্‌মে রোকেট গেলো—দুঃশু মহারাজ সোঙ্গে গেল, বড় জবোর খবোর হোলো বাবু!' ইত্যাদি।

*

রকেট পাঠাইবার পর বহুদিন চলিয়া গেছে, কিন্তু মঙ্গল হইতে কোনই সংবাদ নাই। সেখানকার 'অত্যন্ত বুদ্ধিমান জীবেরা' পৃথিবীর জীবদের পাইয়া কতখানি আপ্যায়িত হইয়াছে সে খবর তো পাওয়া যায়-ই নাই, উপরন্তু রকেটখানা সত্যি সত্যিই মঙ্গলধামে গিয়া পৌঁছাইল, না মাঝ-পথে শমন-ধামেই চলিয়া গেল সে খবর পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আবার সহদেব ইন্‌স্টিটিউটে গবেষণা আরম্ভ হইল, এবং দু'দিন বাদে রিপোর্ট বাহির হইল—রকেট মঙ্গল-গ্রহে গিয়া পৌঁছিয়াছে ঠিকই, কিন্তু তার ভেতরকার প্রাণী কয়টির অবস্থা বড়ই শোচনীয়—এর চাইতে বেশী তাদের শাস্ত্র আর কিছুই বলিতে পারে না।

লোকমুখে খবর ছড়াইয়া পড়িতেই কৌরাভা-লজে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। গান্ধারী সেতুবন্ধ হইতে ফিরিয়াছিলেন, খবর শুনিয়া তাঁর ঘন ঘন ফিট্

হইতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্রের ব্লাড্ প্রেসার এতখানি বাড়িয়া গেল যে যুধিষ্ঠির 'তার' করিয়া ঘটোৎকচকে আনাইয়া রাখিলেন, প্রয়োজন হইলে হয়তো বিশল্য-করণীর খোঁজে তাহাকে গন্ধমাদন পাহাড়ে পাঠাইতে হইবে।

আরো কিছুদিন গেল, তবুও মঙ্গল হইতে কোন খবর নাই। শেষে গান্ধারী আর থাকিতে না পারিয়া পাগলের মত একদিন গিয়া ভীমের হাত চাপিয়া ধরিলেন, 'বাবা, জ্যাঠাইমার প্রাণ বাঁচাও, আমার দুঃশু-কে ফিরিয়ে আনো। তোমার দাদা হনুমানের অসাধ্য কাজ নাই, আমার হয়ে তাঁকে তুমি ধরগে বাবা! রামের কাজে একবার তিনি লাফিয়ে লঙ্কায় গিয়েছিলেন, আমার অনুরোধে আর একবার না হয় মঙ্গলে যাবেন। সীতাদেবীর বরে তিনি অজর অমর, আগের মত সমস্ত শক্তিই তাঁর আছে—যাও বাবা, একবার তাঁর কাছে যাও।'

কিষ্কিন্ধ্যা নগরে ভীম গিয়া পেঁাছিলেন ঠিক দুপুর বেলা। খোঁজ নিয়া জানিলেন, দাদা হনুমান তখন 'কলা-ভবনে' রহিয়াছেন। ভীমের মনে একটু খট্‌কা বাধিল,—তাইতো, দাদা আজকাল সভ্য হইয়া ছবি আঁকার নেশায় মজিয়াছেন—একেবারে 'কলাভবন' তৈরি করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন কি আর অনার্যের মত লেজ তুলিয়া লাফাইতে রাজী হইবেন? দেখা যাক!

'কলা-ভবনের' কাছে আসিতেই কিন্তু ভীমের সমস্ত ভাবনা দূর হইল, তিনি বুঝিলেন, আর্টের সহিত এ ভবনের কোন সম্পর্ক নাই, এ একেবারেই সাদা কথায় কলার ভবন—ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস! চারিদকে কাঁদির পর কাঁদি মর্তমান, চাঁপা, কাঁটালে, অগ্নিশ্বর প্রভৃতি হরেক রকমের কলা ঝুলিতেছে, আর ঠিক মাঝখানে বেঞ্চির উপর বসিয়া পবন-নন্দন নিতান্ত নিবিষ্টভাবে 'কলা-চর্চা' করিতেছেন। তাঁর পাশে কলার ছোবড়ার রীতিমত একটী ছোট-খাটো পাহাড় জমিয়া গেছে!

ভীম একবার একটু উঁকি দিয়া দেখিয়া আস্তে আস্তে ডাকিলেন, 'দাদা!'

'কে?' বলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া হনুমান ভীমকে দেখিয়াই আহ্লাদে একে-বারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। হাত ধরিয়া কাছে নিয়া পেট ভরিয়া তাঁহাকে মর্তমান কলা খাওয়াইলেন। শেষে বলিলেন, 'তারপর, কি মনে করে ভায়া?'

'বড়ই বিপদে পড়ে তোমার কাছে আসছি দাদা। হালে মঙ্গল-গ্রহে যে রকেটনাথা গেল না—আমার জ্যেঠতুতো ভাই দুঃশাসন তাতে একজন যাত্রী ছিল। এতদিন চলে গেছে, অথচ সে রকেটের কোন পাত্তা নেই—শোনা যাচ্ছে তার যাত্রীরা নাকি মঙ্গলে গিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছে। জ্যাঠাইমা তো খাওয়া-দাওয়া বন্ধই করে দিয়েছেন, আমায় হাতে ধরে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যদি তুমি ত্রেতাযুগের মত এক লাফে মঙ্গলে গিয়ে একটা কিছু কিনারা করে

আসতে পার। সীতাদেবীর বরে তুমি তো অজর অমর—আগের মত ক্ষমতা তোমার নিশ্চয়ই আছে।'

মাথার পেছনে হাত দুইটি দিয়া হনুমান একবার হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙিলেন, তারপর কহিলেন, 'হাজার হাজার বছর হয়ে গেল ভায়া, লাফালাফির পাট ছেড়ে দিয়েছি। কিষ্কিন্ধ্যায় রেস-গাড়ি হওয়ার পর তো হাঁটাও বন্ধ হয়ে গেছে। ভুঁড়ি হয়ে গেছে—এখন কি আর ওসব কাজ পারবো।'

ভীম কাঁচা ছেলে নন, জানিতেন, গোড়াতে অমন একটু আপত্তি টাপত্তি হইবেই, কিন্তু শক্ত হইতে পারিলেই জিত! বলিলেন, 'ভুঁড়ি হয়েছে তো ভাবনা কিসের? দিন দুই প্যারালাল বারে এক্সারসাইজ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে ডজন খানেক য়্যান্টি-ফ্যাট পিল খেয়ে নাও, শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে।'

ছোটদের সঙ্গে তর্কে বড়রা কোন দিনই জিতিতে পারে না, হনুমানও পারিলেন না। কাজেই হাজার হাজার বছর পরে হনু আবার 'রাম-লাফ' দিয়া মঙ্গলে গিয়া পড়িতে রাজী হইলেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বরে আসিয়া হনুমান চোখ বুঝিয়া একবার শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিলেন, তারপর বিকট সিংহনাদ ছাড়িয়া শূন্যে লম্ফ প্রদান করিলেন। সে সিংহনাদে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, পালোয়ান-শ্রেষ্ঠ ভীম পর্যন্ত সমুদ্রে পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেলেন।

মঙ্গলে পেঁাছিয়া সেখানকার অপরূপ দৃশ্যে হনুমান মোহিত হইয়া গেলেন। কোথায় লাগে এর কাছে পৃথিবী? ফুর ফুর করিয়া বাতাস বহিতেছে, একটু যদি কান পাতিয়া শোন তো টের পাইবে কী চমৎকার গান সেই বাতাসের সঙ্গে মেশান! আবার যদি জোরে ঝড় বয় তো সে গান একটুও বে-সুরো হইবে না। এমনই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এখানকার জীবদের। আমাদের পৃথিবীতে খাবার জোগাইতে কত কষ্ট—বীজ বোনরে, শস্য পাকাওরে, কাটরে, বাঁধরে—তবে খাবার পাওয়া যাইবে। এখানে সে সব কোন হাঙ্গামাই নাই। মাঠ ভরা বাগিচায় বড় বড় গাছ, আর সেই সব গাছে রসগোল্লা—সন্দেশ জাতের জিনিস হইতে আরম্ভ করিয়া চপ্-কাটলেট জাতের কত জিনিসই না ঝুলিতেছে! তাও আবার কষ্ট করিয়া পাড়িয়া আনিতে হয়না—মাটীর উপর লাল, নীল, সবুজ নানারকমের সুইচ্ আছে, সেগুলির এক একটা টিপিয়া দিলেই এক এক রকমের খাবার সামনে আসিয়া হাজির হইবে। হনুমান অন্যমনস্ক ভাবে একটা হলদে সুইচ্ টিপিয়াছিলেন, অমনি এক কাঁদি কলা তাঁর সামনে আসিয়া পেঁাছিল। হায়রে, এই অসীম বুদ্ধিমান জাতের সঙ্গে মানুষের যদি আলাপ-পরিচয় ঘটে তো পৃথিবীতে আর কারো খাবারের ভাবনাই থাকিবেনা। পৃথিবীর রকেট্খানা নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া পেঁাছে নাই,

নহিলে এমন অসামান্য বুদ্ধিমান জীব কি আর মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের চেষ্টা করিতনা?

একটু আগাইতেই হনুমান দূরে কতগুলি ফুটবল দেখিতে পাইলেন। আসলে সেগুলো কিন্তু ফুটবল নয়, তারাই মঙ্গলের অতি বুদ্ধিমান জীব। অনবরত কেবল মাথার কাজ করিতে করিতে লক্ষ লক্ষ বছর পরে এখন মাথাটাই তাদের বড় হইয়া উঠিয়াছে, শরীরের অন্যান্য অংশ নাই বলিলেই চলে। মাথার নীচে হইতেই দুটা সরু সরু শুঁড়ের মত ঠ্যাং বাহির হইয়াছে।

একটু বাদেই হনুমান নিজের ভুল টের পাইলেন, অর্থাৎ বুঝিলেন ঐ ফুটবলগুলিই মঙ্গলের জীব। তাঁর কি খেয়াল হইল—সরাসর তাদের সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া ছদ্মবেশ ধরিলেন—ঠিক সেই রকম, যেমনটি অশোক-বনে সীতাকে খুঁজিবার সময় ধরিয়াছিলেন, অর্থাৎ বিঘতখানেক মাপের ছোট্ট বানরটি। তারপর এ গাছ হইতে ও গাছ, এমনি করিয়া বেলা নাগাদ চারিটার সময় প্রকাণ্ড এক বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাগানটার ভিতরে অসংখ্য ঘর, আর সেইসব ঘরের মধ্যে কত বিচিত্র রকমের জীবজন্তু যে রহিয়াছে তার সংখ্যাই নাই। হনু বুঝিলেন, এটী এখানকার চিড়িয়াখানা বা জুওলজিক্যাল গার্ডেন।

চিড়িয়াখানায় নানা জন্তু দেখিতে দেখিতে হনুমান লক্ষ্য করিলেন, একটা খাঁচার সামনে বড়ই অসম্ভব রকম ভিড় জমিয়া গেছে। সে খাঁচায় নিশ্চয়ই অপূর্ব কোন জানোয়ার রহিয়াছে, তাই অপর অপর জায়গা ছাড়িয়া সেখানেই যত ভিড়। খাঁচার উপর হইতে ভিতরকার জন্তুদের খাবার দেওয়া হইতেছে, আর ছোক্‌রা-বয়সী দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ লাঠি দিয়া ভিতরের জানোয়ারদের খোঁচা মারিতেছে।

এ আশ্চর্য জানোয়ারটি কি রকম, দেখিবার জন্য হনুমান গাছের উপর হইতে অনেক উঁকি ঝুঁকি মারিলেন, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, সন্ধ্যার পর চিড়িয়াখানা বন্ধ হইলে দর্শকরা তো কেউ থাকিবে না, তখনই এই অভিনব জানোয়ার দেখা যাইবে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, দর্শকের দল চিড়িয়াখানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল; আর একটু পরেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

তখন হনুমান আস্তে আস্তে গাছ হইতে নামিয়া সেই খাঁচার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াই যে তিনি চমকিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন না, এই আশ্চর্য! কেননা স্পষ্ট দেখিলেন, খাঁচার ভিতর দুঃশাসন—এবং আরও পাঁচ ছয়জন লোক—বোধ করি রকেট-পার্টির লোকেরাই হইবেন!

ভীমের সুবাদে দুঃশাসনের সঙ্গেও হনুমানের জানাশোনা ছিল, টক্

করিয়া ছদ্মবেশ বদলাইয়া হনু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একি দুঃশাসন! এখানে এইভাবে?'

দুঃশাসনও কম আশ্চর্য হন নাই—বোধ করি একটু আশান্বিতও হইয়া থাকিবেন; জবাব দিতে গিয়া তিনি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন, 'হ্যাঁ দাদা! আমরা এসেছিলাম বুদ্ধিমান জীব ভেবে পৃথিবী থেকে এদের সঙ্গে আলাপ করতে, আর এরা আমাদের অদ্ভুত কোন জীব ঠাউরে চিড়িয়াখানায় পুরে রেখে দিয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার 'দর্শক' এসে আমাদের দেখে যাচ্ছে। আমরা যত আসল ব্যাপার বোঝাতে যাই, ওরা ততই খিলখিল করে হাসে, আর লম্বা লম্বা লাঠি দিয়ে আমাদের পেটে খোঁচা মারে! ডক্টর গয়টারের পেটতো প্রায় ফুটোই করে দিয়েছ!'

প্রথমটা হনুমানের খুবই রাগ হইয়াছিল, এমনকি, ভাবিয়াছিলেন রকেট্-পার্টির কারো কাছে বিড়ি-টিড়ি থাকিলে সেই আগুন লেজে লাগাইয়া এদের গোটা শহরটাই পোড়াইয়া দিবেন। কিন্তু একটু পরেই বুঝিলেন, এরা বিষম বৈজ্ঞানিক জাতি—শুধু গায়ের জোড়ে ইহাদের কিছু করা যাইবে না। পাছে আবার টের পাইয়া তারা তাঁকেও 'জু'তে পুরিয়া ফেলে, তাই ভয়ে-ভয়ে এদিক-সেদিক তাকাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, 'আমি খাঁচার ভেতর লেজ পুরে দিচ্ছি, তোমরা সবাই বেশ করে সেটা জাপটে ধর—আর নয়তো লেজটাকে কষে খাঁচার শিকের সঙ্গে বেঁধে দাও। এক লাফে তোমাদের নিয়ে পৃথিবীতে গিয়ে পড়ছি।'

তাহাই হইল। যথা সময়ে লেজে খাঁচা বাঁধিয়া হনুমান কুরুক্ষেত্রের মাঠে আসিয়া পড়িলেন।

কৌরাভা-লজে দুঃশাসন ফিরিলে পর সমস্ত ঘটনা শুনিয়া দুর্যোধন আজ অবধি 'ওয়ার্থ্লেস্' মণির কথা তার কাছে পাড়িতে পর্যন্ত সাহস করেন নাই। মঙ্গল-গ্রহের নাম শুনিলেই দুঃশাসন ক্ষেপিয়া উঠেন।

সাইনবোর্ড

সৈয়দ মুজতবা আলী

কাইরোতে ফরাসী, গ্রীক্, ইতালী, ইংরেজ বসবাস করে বলে এবং জাত-বেজাতের বিস্তর টুরিস্ট আসে বলে, কাইরোর বহু দোকানী তরো-বেতরো ভাষায় সাইনবোর্ড সাজায়।

—সকাল বেলা আমরা যখন শহরের আনাচে কানাচে ঘুরছি, তখন দেখি, এক সাইন বোর্ডে লেখা—

FOOL'S RESTAURANT

পল, পার্সি, আমি একসঙ্গেই বোর্ডটা দেখেছিলুম। এক সঙ্গেই থ' মেরে দাঁড়িয়ে গেলুম। একসঙ্গেই অট্টহাস্য করে উঠলুম—'আহাম্মুকদের রেস্তোরা।' বলে কি?

তখন হঠাৎ ঝাঁ করে আমার মনে পড়ল FOOL শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে 'ফুল' অর্থাৎ 'বীন' অর্থাৎ সিমের বীচি অর্থে। 'আহাম্মুক' অর্থে নয়। অর্থাৎ ঐ দোকানী উত্তম 'সিম-বীচি' বেচে। তারপর দোকানের সামনে আমরা ত্রিমূর্তি উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখি, যেকটি খদ্দের সেখানে বসে আছে তাদের সক্কলেরই সামনে শুধু সিম-বীচি—ফুল—'FOOL'।

হাসলে তো? আমিও হেসেছিলুম।

কিন্তু তারপর কোলকাতায়—বহু বৎসর পরে—দেখি, এক দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা—'কপির শিঙাড়া'

অর্থাৎ ফুলকপির পুর দেওয়া শিঙাড়া। এই তো?

আমি কিন্তু 'কপি' শব্দের অর্থ নিলুম 'বাঁদর'। অর্থাৎ বাঁদরদের শিঙাড়া। তাহলে অর্থ দাঁড়াল, ও-দোকানে যারা শিঙাড়া খেতে যায়, তারা বাঁদর। অর্থাৎ Fool's Restaurant-তে যে রকম আহাম্মুকরা যায়।

যেমন মনে করো, যখন সাইন-বোর্ডে লেখা থাকে,—'টাকের ঔষধ'।

তখন কি তার অর্থ 'টাক' দিয়ে এ ঔষধ তৈরী করা হয়েছে? তার অর্থ—এ ঔষধ টেকোদের জন্য। অতএব 'কপির শিঙাড়া'র অর্থ ফুলকপি দিয়ে বানানো শিঙাড়া নয়, 'কপি'—বাঁদরদের জন্য এ শিঙাড়া।

বিজ্ঞাপনে মানুষ জানা-অজানাতে—অজানাতেই বেশী—কত যে রসিকতা সৃষ্টি করে তার একটি সচিত্র কলেকশন করেছিল আমার এক ভাই-পো। 'হবি'টা মন্দ নয়। তার মধ্যে একটা ছিল :— বিসুদ্দ ব্রাম্ভনের হাটিয়াল।

মচ্ছ—।· মাঙ্গশ—৷৷· নিড়ামিস—৷৵·

গুরুচণ্ডালী

শিবরাম চক্রবর্তী

সীতানাথবাবু ছিলেন সেকেণ্ড পণ্ডিত, বাংলা পড়াতেন। ভাষার দিকে তাঁর দৃষ্টি একটুও ভাসা ভাসা ছিলো না—ছিলো বেশ প্রখর। ছেলেদের লেখার মধ্যে গুরুচণ্ডালী তিনি মোটেই সইতে পারতেন না।

সপ্তাহের একদিন ছিলো ছেলেদের রচনার জন্যে ধরা। ছেলেরা বাড়ি থেকে রচনা লিখে আনতো—একেক সময়ে ক্লাসে বসেও লিখতো। সীতানাথবাবু সেই সব রচনা পড়তেন, পড়ে পড়ে আগুন হতেন। ছাত্রদের সেই রচনা পরীক্ষা করা, সীতার অগ্নি-পরীক্ষার মতই একটা উত্তপ্ত ব্যাপার ছিল সীতানাথবাবুর কাছে।

এত করে বকেও, গুরুচণ্ডালী দোষ যে কাকে বলে, ছাত্রদের তিনি তা বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি। উক্ত দোষমুক্ত করা তো দূরে থাক।

সেদিনও তিনি ক্লাসসুদ্ধু ছেলের রচনার খাতায় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন—দেখতে দেখতে তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠলো, হাতের দু'রঙা পেনসিলের লাল দিকটা ঘষ্ ঘষ্ করে চলতে লাগলো খাতার উপর—রচনার লাইনগুলো ফস্-ফস্ করে লাল দাগে কেটে কেটে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। এর চেয়ে ছেলেদের চাবকে লাল করা যেন সোজা ছিলো ঢের—ছিলো ঢের আরামের—আর তা করতে পারলে যেন গায়ের ঝাল মিটতো তাঁর।

খাতাগুলো পাশে সরিয়ে রেখে তিনি বললেন—এ আর কী দেখবো! খালি গুরুচণ্ডালী। কতোবার করে বলেছি—হয় সাধু ভাষায় লেখো, নয় কথ্য ভাষায়। যেটাতেই লেখো তা ঠিক হবে। কিন্তু আগাগোড়া এক রকমের হওয়া চাই। সাধু ভাষায় আর কথ্য ভাষায় মিশিয়ে খিচুড়ি পাকানো চলবে না। না, কিছুতেই না। কিন্তু এখনো দেখছি সেই খিচুড়ি!

গণেশ বললো—আমি সাধুভাষায় লিখেছি সার্।

সাধুভাষায় লিখেচো? এই তোমার সাধুভাষা?—সীতানাথবাবু ভেতর থেকে তার খাতাটিকে উৎখাত করেন—কী হয়েচে এ? দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল? দুগ্ধফেননিভের সঙ্গে—

কেন সার, 'করিয়া' তো লিখেছি আমি। করিয়া কি সাধুভাষা হয়নি সার্?

কিন্তু ধপাস্? ধপাস্ কী ভাষা? দুগ্ধফেননিভের পরেই এই ধপাস্?

গণেশ এবার ফেননিভের মতই নিভে যায়, টুঁশব্দটি করতে পারে না।

কতোবার বলেচি তোমাদের যে ভাষার খিচুড়ি পাকিয়ো না। হয় সাধুভাষায়

নয় কথ্য ভাষার—যেটায় হয় একটাতে লেখো। কিন্তু দেখো, আগাগোড়া যেন এক রকমের হয়। গণেশের এই বাক্যটিকে তোমাদের মধ্যে নিখুঁত করে বলতে পারো কেউ?

পারি সার্—মানস উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু দাঁড়িয়েই মাথা চুল্‌কাতে লাগলো সে। ধপাস্-এর সাধুভাষা কী হবে তার জানা নেই। খানিক মাথা চুলকে, খানিক আম্‌তা আম্‌তা করে সে নিজেও ধপাস্ করে বসে পড়লো। তার মানসে যে কী ছিলো তা জানা গেল না।

সরিৎ উঠে বললো—কিসে বলব সার? কথ্য ভাষায় না অকথ্য ভাষায়?

যাতে তোমার প্রাণ চায়।

দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আয়েস্ করে বসলো।

দুগ্ধফেননিভের সঙ্গে আয়েস্?—সীতানাথবাবুর মুখখানা—উচ্ছের পায়েস খেলে যেমন হয়—তেমনি ধারা হয়ে ওঠে—ওহে বাপু! গুরুচণ্ডালী কাকে বলে তা কি তোমাদের মাথায় ঢুকেছে? মনে করো যে, যে চাঁড়ালটা আমাদের এই ইস্কুলে ঝাঁট দেয় সে যদি হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে একাসনে বসে তা'হলে সেটা যেমন দৃষ্টিকটু দেখাবে, কতকগুলি সাধুশব্দের মধ্যে একটা অসাধু শব্দ ঢুকলে ঠিক সেইরকম খারাপ দাঁড়ায়। কিন্তু দু'জন চাঁড়াল স্বচ্ছন্দে গলা ধরাধরি করে যেতে পারে—কারো চোখেই খারাপ দেখায় না। কথ্য ভাষার যে শব্দ সাধু ভাষার শব্দদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসতে পারে না, সেই কথাই আবার অন্যান্য কথ্য শব্দের সঙ্গে মিশ্ খেয়ে বেশ মানিয়ে যেতে পারে, যেমন উদাহরণস্বরূপ—

বলবো সার? এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি।—বলে ওঠে গণেশ—দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আয়াস সহকারে বসিল। কিম্বা উপবেশন করিল। হয়েছে এবার সার?

কিম্বা আরো বেশি সাধুতা করে আমরা বলতে পারি—নিরঞ্জন উঠে বলে—আসন গ্রহণ করিল। কিম্বা আসন পরিগ্রহ করিল।

দীপক বলে—সমাসীন হইলও বলা যায়।

আবার তুই এর মধ্যে সমাস ঢোকাচ্ছিস?—গণেশ তার কানের গোড়ায় ফিস্ ফিস্ করে—এতেই কেঁদে কূল পাইনে, এর ওপর ফের সমাস?

যেমন উদাহরণস্বরূপ—সীতানাথবাবু বলতে থাকেন, কিন্তু তাঁর বলার মাঝখানেই পিরিয়ডের ঘণ্টা বেজে যায়। উদাহরণের স্বরূপ প্রকাশের আগেই তাঁকে ক্লাস ছেড়ে যেতে হয়। নিজের বক্তব্য আরেক দিনের জন্যে মুলতুবি রেখে সমস্ত প্রশ্নটাই আমূল রেখে যান।

দিন কয়েক পরে গণেশ রেশন আনতে গিয়ে দেখল যে সেকেণ্ড পণ্ডিত

মশাইও সরকারী দোকানে এসেছেন। লম্বা লাইনের ফাঁকে সীতানাথবাবুও দাঁড়িয়ে। সেই কিউয়ের ভেতর মহল্লার ঝাড়ুদার—নিশ্চয়ই সে চণ্ডাল—যেমন রয়েছে, তেমনি আছে পাড়ার গুণ্ডারা। তারাও কিছু সাধু নয়। বরং তাদের প্রচণ্ডালই বলা যায়। প্রচণ্ড তাদের দাপট। পাড়ার সার্ এবং অসার—সবাই এক সারের মধ্যে সমানে খাড়া। রীতিমত গুরুচণ্ডালী।

সীতানাথবাবু ছিলেন সারির মাঝামাঝি। গণেশ অনেক পরে এসে শেষের দিকে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো সীতানাথবাবুকে। চণ্ডালদের মধ্যে গুরুদেব, ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ এই অভাবিত মিলন-দৃশ্য দেখে সে অবাক হোলো। সে দৃশ্য অবাক হয়ে দেখবার মতই।

সীতানাথবাবুর দৃষ্টি কোনো দিকে ছিল না। অজগরের মত বিরাট লাইন যেন কচ্ছপের গতিতে এক পা এক পা করে এগুচ্ছিল।

কতোক্ষণে রেশন নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরবেন, হাঁড়ি চাঁড়িয়ে চান সেরে নাকে-মুখে দুটি গুঁজে পাড়ি দিবেন ইস্কুলে, সেই ভাবনাতেই সমস্ত মন পড়েছিল তাঁর।

সহসা এক বালসুলভ তীক্ষ্ম-কণ্ঠ তাঁর কানে এসে পিন্ ফোটালো। ফুট-তেই তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন।

সার্ সার্! ব্যগ্র হোন্ কল্য।—শুনতে পেলেন তিনি।

শুনেই তিনি পিছন ফিরে তাকালেন। দেখতে পেলেন গণেশকে। কিউ-য়ের শেষে দাঁড়িয়ে চীৎকার ছাড়ছে।

ব্যগ্র হোন কল্য? তার মানে? কেন তিনি ব্যগ্র হবেন? আর হন যদি বা, তো তা কালকে কেন? ব্যগ্র যদি হতেই হয় তো আজকেই কেন নয়? এই মুহূর্তেই বা নয় কেন? আর এই মুহূর্তে ব্যগ্র হয়েই বা কি হবে? কিউ-এর লাইন তো আর ছেলেদের খাতার লাইন না যে পেন্সিলের এক খোঁচায় ফ্যাশ্ করে কেটে এগিয়ে যাবেন। যতই তাড়া থাক্, যতই ব্যগ্র হন, আগের লোকদের কাটিয়ে এগুবার একটুও উপায় নেই এখানে। ফাঁড়ার মতই অকাট্য এই লাইন।

সার্ সার—পুনরায়, পুনরায়। ব্যগ্র হন কল্য। ব্যগ্র হন কল্য।—আবার সেই আর্তনাদ।

সীতানাথবাবুর ইচ্ছে করে, এক্ষুনি গিয়ে—বেশ একটু ব্যগ্রভাবেই—গণেশের কান দুটো ধরে ম'লে দেন আচ্ছা করে। কিম্বা তুলে ধ'রে আছাড় মারেন ওকে। কিন্তু ওকে আছড়াবার এই ব্যগ্রতা দেখাতে গিয়ে লাইনের জায়গা পা-ছাড়া করার কোনো মানে হয় না।

আস্তে আস্তে এগিয়ে দোকানের ভেতর পোঁছে রেশনের দাম দিতে গিয়ে

তাঁর চোখ কপালের কানায় ঠেকলো—যেমন একটু আগে তাঁর কান চোখা হয়ে উঠেছিল। দ্যাখেন যে তাঁর পকেট মারা গেছে। পকেটের যেখানে টাকার ব্যাগটা থাকে সেখানটা ফাঁকা।

বৃথা হৈ চৈ না করে বিরস মুখে তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে আসেন।

সার্, তখন আমি কী বলছিলাম? আমি অতো করে বললাম, তা আপনি কান দিলেন না। আদৌ কর্ণপাত করলেন না।—গণেশ অনেকটা এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। দোকানের মুখে পেঁছে মাস্টারের সম্মুখে পড়েছে।

কী বলছিলে তুমি? তুমি তো আমায় কাল ব্যগ্র হতে বলছিলে? আর এদিকে আমার আজ সর্বনাশ হয়ে গেল।

কাল ব্যগ্র হতে বলেছি? মোটেই না। আমি বলছিলাম আপনার ব্যাগ গ্রহণ করলো। আপনার পরেই যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল, সেই হতভাগাই পেছন থেকে আপনার পকেটে হাত ঢুকিয়ে—

তা 'পকেট মারলো' বলতে তোর কী হয়েছিলো রে হতমুখ্য?—সীতানাথবাবুর সমস্ত রাগ এখন গণেশের ওপর গিয়ে পড়ে—সোজাসুজি তা বললে কি হোতো? তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হোতো? পকেট মারছে সার্—বলতে কি আটকাচ্ছিলো তোমার পাপ মুখে?

ছি ছি!—গণেশ নিজের জিভ কাটে—অমন কথা বলবেন না সার্। পকেট মারছে সে কথা কি আপনার সামনে আমি উচ্চারণ করতে পারি? পকেট প্রহার করছে বললেও তো শুদ্ধ হয় না। আর বলুন, গুরুমশায়ের কাছে এমন চণ্ডালের মতন ভাষা কি বলা যায়? ও কথা—অমন কথা বলবেন না সার্। ব্যাগ গ্রহণ করল বলেছি—জানি যে, তাও সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়নি, গুরু-চণ্ডালী একটুখানি যেন রয়ে গেছে, কিন্তু কি করবো, ব্যাগের সাধুভাষা যে কী—তাতো আমার জানা নেই সার্। কতো করে ভাবলুম, কিন্তু কিছুতেই ব্যাগের শুদ্ধটা আমার মাথায় এলো না। এদিকে ভাবতে ভাবতে ব্যাগশুদ্ধ নিয়ে সটকালো।

পুজো কনসেসন

প্রবোধকুমার সান্যাল

পুজোর ছুটিতে হরিহরবাবু বিদেশে বেড়াতে যাবেন। আশী টাকার কেরানী, বিদেশে বড় একটা যাওয়া ঘটে না,—এত বড় সংসার, অতগুলো কাচ্চাবাচ্চা। তবু পুজো কন্সেসন, সস্তার টিকিট. হরিহরবাবু স্থির করলেন, বাবা বৈদ্যনাথ দর্শন করতে যাবেন।

বড়বাবুকে ধ'রে সাহেবকে ধ'রে পনরো দিনের ছুটি পাওয়া গেল। যাবার অন্তত সাত দিন আগে থেকে তোড়জোড়। যেখানে যত আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পরিচিত—সকলের কাছে চিঠি গেল। পাড়ার মুদির দোকান, কিনু স্যাকরা, কয়লাওয়ালা, ভূগু পরামাণিক, নটবর ধোবা—ইত্যাদি সবাই জেনে গেল, হরিহরবাবু বিদেশ যাবেন। সাত দিন আগে থেকে হরিহরের ঘুম নেই, স্নানাহারের সময় নেই। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বচসা, আর বাড়ির লোকদের সঙ্গে বিবাদ, গিন্নীর সঙ্গে মনোমালিন্য—তার কারণ তারা নাকি এতবড় একটা কান্ডকারখানার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না।

তিনি বললেন, কোন্ দিক্ সামলাই? আমি এত পেরে উঠবো কেমন ক'রে?

গিন্নী বললেন, কিসের এত হুড়োহুড়ি? এখনো ত' অনেক দেরি!

দেরি! তোমার আর কি বলো, আমার যে প্রাণ যায়। এত কেনাকাটা কে করবে?

কিসের কেনাকাটা?

শোনো কথা!—ব'লে হরিহরবাবু মেঝের উপর ব'সে পড়লেন। তিনি একে মোটা মানুষ, এতবড় ভুঁড়ি, গত বছরে অসুখ থেকে উঠেছেন, তার উপরে এই পরিশ্রম। মেয়েমানুষ, ওরা কি জানে, কতটুকু ওরা বোঝে, ওদের সাধ্য কতটুকু? যা করে সবই ত' এই শর্মা! হরিহরবাবু বললেন, তোমার মতন কুড়ে হ'লে আর রেলগাড়িতে উঠতে হচ্ছে না।—এই ব'লে আবার তিনি ছুটলেন।

পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে চললেন। চীনাবাজার থেকে ছেলেমেয়ের জুতো, হাবড়ার হাট থেকে সস্তায় কাপড়, মুরগিহাটা থেকে গায়ের জামা, চাঁদনী থেকে দুখানা বিলিতী কম্বল। মোটঘাট, বাজার, চুপড়ি-চেঙারি—সবসুদ্ধ প্রকান্ড এক বস্তা তিনি এনে হাজির করলেন। বিদেশে বিভূঁয়ে যাবেন, সেখানে হয়ত ডাক্তার-বৈদ্য নেই, হয়ত রাত-বিরাতে কোনো বিপদ্ ঘটতে পারে, এজন্য তিনি ঔষধপত্র কিনতে শুরু করলেন। জ্বরের জন্য কুইনিন্,

আমাশয়ে ক্লোরোডাইন্, কলেরায় ক্যাম্ফর, সর্দির ইউক্যালিপটস্-অয়েল, কাসির তালের মিছরি, কাটা-ছড়ার টিঙকচার-আইডিন্, ঘায়ের বোরোফ্যাক্স, জামবাক ইত্যাদি। রাত্রে পথে বেরোবার জন্য একটা টর্চ-লাইট।

সেখানে গিয়ে একটা সংসার পাততে হবে তা মনে আছে? হরিহরবাবু বললেন।

গিন্নী বললেন, সে ত' হবেই।

তবে চুপ ক'রে আছো কেন? আচ্ছা, তোমার কি একটুও দুশ্চিন্তা হচ্ছে না? জানো, সেই অজানা দেশে হয়ত কিছু পাওয়া যাবে না?

সে তখন দেখা যাবে।—ব'লে গিন্নী চ'লে গেলেন।

পরিশ্রমে হরিহর ঘর্মাক্ত, তবু তিনি চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। ঠনঠনে থেকে তিনি এক প্রকাণ্ড চট কিনে আনলেন, তার সঙ্গে আনলেন একটা আম কাঠের বাক্স। তার মধ্যে থালা, বাটি, ঘটি, গেলাস, কড়া, খুন্তি, হাতা, বেড়ি, চাটু, হাঁড়ি, গামলা, ডেক্‌চি—সব পুরলেন। সাহায্য করবার কেউ নেই, একাই সব করতে হোলো। এদিকে তেলের বাটি, নুনের কেঁড়ে, মসলার কৌটো, ঘিয়ের শিশি, শিল-নোড়া, চাকা-বেলুন, বঁটি-কাটারি—সব ঢোকালেন। অত-দূর—বিদেশে চাল, ডাল পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, সুতরাং তেল-ঘি-নুন-চাল-ডাল-লঙ্কা-হলুদ প্রভৃতি সমস্তই তিনি কিনে আনলেন। কারো কথা তিনি শুনতে রাজী নন্, বিদেশের অভিজ্ঞতা বাড়ির কারো নেই। এখন সবাই মুখ টিপে হাসছে বটে, কিন্তু সেই দুর্দিনে এইসব বড়ই মিষ্টি লাগবে। এক-সময় তিনি গলা বাড়িয়ে বললেন, বলি শুনছ, ছোট ছেলেটার জন্যে কিছু দুধ নিতে হবে, সেদেশে হয়ত গরু নেই।

গিন্নী বললেন, গরু একটা এখান থেকে নিয়ে গেলে হয় না?

বলেছ ঠিক।—ব'লে হরিহরবাবু মাথা নাড়লেন। যাই, স্টেশনে গিয়ে এক-বার জিজ্ঞেস ক'রে আসি। বলেছ তুমি ঠিক।—তিনি গভীর চিন্তায় বিমর্ষ হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন।

পাড়ার লোক ডেকে বললে, হরিহরবাবু, আপনার যাওয়া কি তবে ঠিক?

হরিহর বললেন, বাবা বদ্যিনাথের ইচ্ছে, আমার ত' চেষ্টার ত্রুটি নেই।

কাল রাতে আপনার বাড়িতে অত গোলমাল হচ্ছিল কেন?

আর ভাই, এতবড় ব্যাপার, কারো গা নেই। রাত জেগে আমি জিনিসপত্তর গোছাচ্ছিলাম।

আপনার বাড়িতে কারা এসেছিল?

হরিহর বললেন, ওঃ, তা বটে। এসেছিল আমার দুই শালা, বড় ভায়রাভাই

আর আমার ভাগ্নে। তাদের ডেকেছিলুম চিঠি লিখে, ওরা সবাই সামনে এসে না দাঁড়ালে আমি এত পেরে উঠবো কেন?

পাড়ার লোক বললে, আপনারা ক'জন যাবেন?

আমি, আমার স্ত্রী আর তিনটি ছেলেমেয়ে। আচ্ছা, দেখুন বিনয়বাবু, আপনি একবার আসুন ত' আমার ঘরে। আমার মাথার আর ঠিক নেই, দেখে যান ত' আর কিছু দরকার লাগতে পারে কিনা?

বিনয়বাবু এসে দাঁড়ালেন। বললেন, সবই হয়েছে, বিছানা কিছু কম।

ওই শোনো, ওগো, কোথা গেলে? আমি তখনই বললুম। ঠিক ঠিক, সামনে অক্টোবর মাস, বটেই ত'!

সেদিন সমস্তদিন হরিহর বিছানাপত্র গোছালেন। লেপ চারটে, বালিস এগারোটা, কাঁথা ছ'খানা, মাদুর তিনটে, তোশক পাঁচখানা, চাদর সাতখানা, সতরঞ্চি তিনখানা। এত বিছানা তাঁর নিজের ছিল না। শালা, শালী, বড়-বোন, মাসতুতো ভাই, মামা, পাশের বাড়ির বড়বৌ, বিনয়বাবুর স্ত্রী—সকলের কাছে পনরো দিনের কড়ারে বিছানাগুলি ধার ক'রে এনে তিনি এক জায়গায় স্তূপাকার করলেন। জিনিসপত্র, মোটঘাট, পোঁটলা-পুঁটলি, চুপড়ি-চ্যাঙারি প্রভৃতিতে তাঁর শোবার ঘর বোঝাই হ'য়ে উঠলো। রাত্রে ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও নিজে ঘরে আর শোবার জায়গা পেলেন না, সকলকে বাইরে শুইয়ে দুদিন রাত কাটাতে হোলো। প্রথম শরৎকালের গুমোট, সুতরাং ঘরের ভিতরকার জিনিসপত্রে আরসোলা, পিঁপড়ে, মাকড়সা, বিছা ইত্যাদির উৎপাতে দুদিন আগে থেকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা কঠিন হ'য়ে উঠলো। নিচের দালান থেকে উপরের ঘর পর্যন্ত অসংখ্য পুঁটলি, বস্তা, বাক্স, তোরঙ্গ, ব্যাগ, বিছানা, মোটঘাট—ইত্যাদিতে আর পা বাড়াবার ঠাঁই রইলো না। গরুর গাড়ি না হ'লে এত জিনিসপত্র স্টেশন পুর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে না। অবশেষে হরিহরবাবু দুখানা গরুর গাড়ি বন্দোবস্ত করবার জন্য বেরুলেন।

ফিরে যখন এলেন দেখা গেল, আবার তাঁর সঙ্গে একগাড়ি জিনিসপত্র। সেই অজানা দেশে হয়ত খাবার জল পাওয়া যায় না, সুতরাং প্রকাণ্ড দুটো ট্যাঙ্ক এলো। বড় এক টিন কেরোসিন তেল, চোর-ডাকাত তাড়াবার চারটে বড় বড় লাঠি, ছ'টা হারিকেন লণ্ঠন, তিনটে আলীগড়ের তালাচাবি, পাঁচটা বালতি, একরাশ খাম-পোস্টকার্ড-ডাকটিকিট, হিসাবের বড় একখানা জাবদা খাতা, গোটাকয়েক হুঁকো-কল্কে-তামাক-টিকে, একরাশি দড়ি,—এমনি আরো কত কি। ধামা, চ্যাঙারি, থলে, বাক্স, ব্যাগ সমস্তই একে একে বোঝাই হ'য়ে উঠলো।

পাড়ার বড়বৌ হরিহরের স্ত্রীকে ডেকে বললেন, এত জিনিসপত্র নিয়ে আপনারা কত দূরে যাবেন বৌদিদি?

হরিহরের স্ত্রী হেসে বললেন, বিলাত!

অবশেষে যাবার দিন এলো। বেলা বারোটায় ট্রেন, কিন্তু আগের রাত্রে হরিহর ঘুমোলেন না। কেবল তাই নয়, পরদিন ভোরে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করার ভয় দেখিয়ে তিনি স্ত্রীকে জেগে থাকতে বললেন। ছেলেমেয়েদের চিম্‌টি কেটে তিনি শেষরাত্রে ওঠালেন। গোলমাল ও চিৎকারে পাড়ার লোক সেরাত্রে জেগে কাটালো। ভোরবেলায় একদল মুটে দুখানা গরুর গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। সকালবেলায় নানাদিক থেকে আত্মীয়স্বজন তাঁর দরজায় উপস্থিত। পাড়ার লোক দল বেঁধে সারি সারি উপরের জানলায় ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেল।

সকালবেলা আহারাদির ব্যবস্থা যেমন-তেমন। ছেলেমেয়েদের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার অভাবে তারা দুদিন থেকে অযত্নে ও অনাহারে কাহিল হয়ে পড়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর বিবাদ,—বিদেশ যাওয়ার এইসব হাস্যকর আয়োজনে সাহায্য না করার জন্য হরিহর স্ত্রীর মুখ দেখছেন না। যাই হোক, কোনোরকমে ভাতে-ভাত খেয়ে সেদিনের মতো কাজ সারা হোলো।

কুলিদের সাহায্যে বেলা নয়টা নাগাৎ হরিহর দুখানা গরুর গাড়িতে জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে, কপালে দইয়ের ফোঁটা এঁকে, সিদ্ধিদাতা গণেশের চরণ সেবা ক'রে, জয় দুর্গা শ্রীহরি ব'লে যাত্রা করলেন। যাবার সময় তাঁর ছোট শালাকে বললেন, আমি স্টেশনে গিয়ে জিনিসপত্র বুক্‌ করবো, তুমি ভাই গিয়ে সকলের টিকিট কাটবে। দেখো, এগারোটার মধ্যে অবশ্য পেঁছিনো চাই, পুজা কন্‌সেসনের ভিড়, দেরি হ'লে আর জায়গা পাবে না।

কালীপদ বললে, কোনো ভয় নেই, আমি ঠিক নিয়ে যাবো, আপনি যান।

সমস্ত পাড়া সচকিত ক'রে, সকলকে হাসিয়ে, সকলের বিস্মিত-দৃষ্টির উপর দিয়ে বাবা বৈদ্যনাথের যাত্রী হরিহর চৌধুরী মশায় আর-একবার দুর্গা ব'লে যাত্রা করলেন। গাড়ি দুখানা পাড়ার ভিতর দিয়ে ঘটর-ঘটর ক'রে চলতে লাগলো, আর আমাদের হরিহরবাবু সেই জিনিসপত্রের উপরে ব'সে তাঁর নতুন-কেনা গরুর গলার দড়িটা ধ'রে রইলেন। গরুটা চললো গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে।

স্টেশনে এসে দেখা গেল গাড়ির দুঘণ্টা দেরি। জিনিসপত্রের যথারীতি বিধিব্যবস্থা ক'রে হরিহর এক জায়গায় তাঁর স্তূপাকার মালপত্রের পাশে এসে বসলেন। ক'দিন থেকে পরিশ্রমের শেষ নেই, রাত কাটে জেগে, তার ওপর মোটা মানুষ, এদিকে উপবাস চলেছে,—ক্লান্তিতে হরিহরের চোখ ঘুমে জড়িয়ে

এলো। তিনি একটা বড় মোটের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। গাড়ির তখনও অনেক দেরি।

মাত্র কয়েক মিনিট আগে তাঁর ঘুম ভাঙলো, তখন ঘণ্টা দিয়েছে। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকাহাঁকি করতেই কুলী এলো। দশজন কুলী। সেই দশজন মিলে তাঁর মালপত্র নিয়ে প্লাটফর্‌ম পেরিয়ে গাড়িতে তুললো! গাড়ি ছাড়তে আর বিলম্ব নেই। কিন্তু কই তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, তাঁর শ্যালকরা—তারা সব কোথায়? হরিহর আকুল হ'য়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। হে নারায়ণ, মধুসূদন, তুমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো।

দুই এক মিনিট মাত্র বাকি, এমন সময় তাঁর শালা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। চিৎকার ক'রে বললে, আপনি করেছেন কি, নামুন, নামুন, এটা যে তারকেশ্বরের গাড়ি—শীগ্‌গির, আর সময় নেই, দেওঘরের গাড়ি আর তিন মিনিট, আসুন, শীগ্‌গির আসুন।

পাগলের মতো হরিহর প্লাটফর্‌মে ঝাঁপ দিলেন। কুলী, কুলী! শীগ্‌গির মাল নামাও,—এই কুলী, কুলী!

আবার জিনিসপত্র নামাতে হোলো।

পনরোজন কুলী, পনরো টাকা বক্‌শিস। অনেক ভাঙলো, মচ্‌কালো, নষ্ট হোলো, হারালো। চালের বস্তা ফাটলো, তেলের টিন ফুটো হোলো, জলের কলসী ভেঙে ছত্রখান হোলো।

দেওঘরের ট্রেন ছাড়তে তখন এক মিনিট বাকি। ছুটতে গিয়ে বেচারী হরিহরের কাছা খুলে গেল। সেই অবস্থায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উন্মত্ত হ'য়ে তিনি গাড়ি পর্যন্ত এসে পেঁছলেন। কুলীরা তখনও জিনিসপত্র এনে পেঁছতে পারেনি। শ্যালক কেবল একটা বিছানা ও একটা কাপড়ের সুট্‌কেস হিঁচড়ে এনে গাড়িতে তুলে দিল। স্ত্রী স্বামীর হাত ধ'রে গাড়িতে তাঁকে তুলে নিয়ে বললেন, থাক্‌ সব, তুমি উঠে এসো।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

হরিহর ফ্যালফ্যাল ক'রে গলা বাড়িয়ে চেয়ে রইলেন। শ্যালকের হেপাজতে সমস্ত মালপত্র প্লাটফর্‌মে প'ড়ে রইলো।

জরাসন্ধ বধ

বিধায়ক ভট্টাচার্য

তোমরা যারা এ গল্প পড়বে, তারা যেন গল্পের নামটা দেখেই চমকে উঠো না। কারণ এ কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা ছেলেবেলায় একবার খুব যোগাড়-যন্ত্র ক'রে যাত্রা অভিনয় করেছিলুম; তার পালার নাম ছিল 'জরাসন্ধ বধ'। সেই বধটা কি ভাবে হয়েছিল—এ গল্পে আমি তোমাদের সেই ঘটনাই শোনাব।

প্রত্যেক বছরই চৈত্র-বৈশাখ মাসের দিকে আমাদের দেশে কমলে-কামিনীতলায় একটা খুব বড় মেলা হয়। কমলে-কামিনীর পুজো হয় বলে জায়গার নামটাই হয়ে গেছে কমলে-কামিনীতলা। কমলে-কামিনীর নাম আশা করি তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। ইনি হচ্ছেন সেই দেবী, যিনি কালীদহে শ্রীমন্ত সওদাগরকে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁরই পুজো। দিন সাতেক ধরে সেই মেলায় কি ফুর্তিতেই যে আমাদের দিন কাটতো তা লিখে বোঝাতে পারবো না। যাত্রা, পুতুল-নাচ, কীর্তন, ঝুমুর, চীনেবাদাম ভাজা, পাঁপর ভাজা, আর মশলা দেওয়া পান, এরই উত্তেজনায় সারাটা দিন কাটতো। রাত্রি দশটায় বসবে যাত্রার আসর। আমাদের জন্যে একটুখানি জায়গা বাঁখারি দিয়ে বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারই ঢোকবার ফাঁকটার মুখে একখানা পিজবোর্ড ঝোলান, তাতে লেখা আছে 'ছাত্রদিগের জন্য'। দু'পয়সার চিনেবাদাম ভাজা পকেটে নিয়ে সারারাত্রি যাত্রা শুনতে যে কী মজা তা তোমাদের কি বলব! তখন গরমের দিন। মর্নিং ইস্কুল। কাজেই সন্ধ্যের সময় আমাদের একেবারে বই খাতাপত্তর নিয়েই মেলায় আসতে হতো। একটা পানের দোকানে সেগুলো সব রেখে, যাত্রা শুনতুম। তারপর ভোরবেলায় ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে চোখ লাল করে ইস্কুলে এসে ঢুকতুম। বছরের মধ্যে এই সাতটা দিন আমাদের যা খুশী করবার হুকুম ছিল।

তারপরের দিন বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে ভোঁদলদের বাড়িতে আমাদের বৈঠক বসলো। আলোচনার বিষয়, 'আমরা একটা যাত্রাপার্টি করে যাত্রা করতে পারি কিনা।' সভায় উপস্থিত ছিলাম—আমি, ভোঁদল, ভব, ফণী, রিখাবচাঁদ, মতিচাঁদ, তারাচাঁদ, কার্তিক, কমরু, তারা আর ভক্তি। সবাই এক ক্লাশে পড়ি। কাজেই অভিনেতাও আমাদের মধ্যে থেকেই বেছে নিতে হবে। অবিশ্যি উঁচু ক্লাশে দু একজন ভাল অভিনেতা থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু তাদের নিলে আমাদের আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

ঠিক হল যে, যাত্রা হবে। পালা হওয়া চাই 'জরাসন্ধ বধ' এবং যেহেতু ওই নামের কোন পালার সন্ধান আমাদের জানা নেই, সেহেতু ওটা আমাকে লিখতে হবে। যাত্রার আসর কোথায় বসবে—এ নিয়ে অনেক ঝগড়া-ঝাঁটির পর স্থির হল, ফণীদের বাড়িতে। দিন দশেক পরে যখন ফণীর বাবা কোলকাতায় যাবেন—সেই সময়ে আমাদের যাত্রাটা হবে। আর জরাসন্ধ বধের রিহার্সাল হবে নওদার মাঠে, বিকেল বেলায় ইস্কুল থেকে ফিরে।

নাটকটা যে আমি খারাপ লিখেছিলাম—একথা মরে গেলেও বিশ্বাস করব না। কী চমৎকার যে তার বাঁধুনি হয়েছিল তা তোমাদের আর কি বলবো? নওদার মাঠে রিহার্সাল দিতে গিয়ে দেখলাম—অনেক দিক দিয়ে মুশকিল দেখা দিচ্ছে। প্রথমতঃ 'জরাসন্ধ বধ' এমন একখানা নাটক—যার ভীম আর জরাসন্ধ চাই দুটো মোটা মোটা ছেলে। তাই প্রথমটা অর্থাৎ ভীমের পার্টটা দেওয়া হল ভোঁদলকে, আর সতীশ বলে আর একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে এসে দেওয়া হল—জরাসন্ধের পার্ট। কিন্তু সতীশটা একেবারে কিছুই জানে না। তার কেবলই ভয়—তার বাবা যদি এ সব কাণ্ডের একটুখানিও জানতে পারেন—তাহলে আর রক্ষে নেই।

—কী দিনরাত 'বাবা' 'বাবা' করছিস সতীশ! ভাল লাগে না, বাবা কি আমাদের নেই নাকি?—ভোঁদল একদিন বললো।

—করবিতো একটুখানি জরাসন্ধের পার্ট, তার অত কেন?—ভব বললো।

—ভাল কাজ করতে গিয়ে বাবার ভয় করলে কি চলে? এই দ্যাখনা—যাত্রা তো আমাদের বাড়িতেই হবে! আমি তো ইচ্ছে করলে বাবার ভয় করতে পারি তাহলে!—ফণী সতীশের মুখের সামনে হাত-মুখ নেড়ে বললো।

এরপরে সতীশকে খানিকটা ঠাণ্ডা হতে দেখা গেল। ঠিক হল—সতীশ করবে জরাসন্ধ, ভীম—ভোঁদল, কৃষ্ণ—ফণী, কার্তিক করবে জরাসন্ধের বাবার পার্ট, আর ভাটের পার্ট করবো আমি। সভা আরম্ভ হলে একখানা গান—আর সভা শেষ হলে আর একখানা, এই মোট দুখানা গান আমাকে গাইতে হবে। বিবেকের পার্টে ভব নামবে। কমরুর ওপর সাজঘরের ভার পড়লো, তারা আর ভক্তি দর্শকদের সুখ-সুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখবে, আর মতিচাঁদ, তারাচাঁদ, রিখাবচাঁদ—এই তিনজনে আমাদের সাজাবে।

হঠাৎ আর একটা সমস্যা দেখা দিল! এত যে সব রাজা-রাজড়ার বই, এর পোশাক পাওয়া যাবে কোথায়? সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কথাটা আগে ভেবে দেখা হয় নি, এখন উপায়? কিছুক্ষণ পরে রিখাবচাঁদ বলে উঠলো—আচ্ছা ও নিয়ে আর ভাবতে হবে না—আমি যেমন করে হোক পোশাক যোগাড় করে আনবো।

—কৃষ্ণের মুকুটের কি হবে রে?—আমি জিগ্যেস করলাম।

—তাইতো, আচ্ছা তার জন্যে ভাবনা নেই। আমাদের মা-কালীর মুকুটটা এনে পরিয়ে দিলেই হবে। যে কালী সেই কৃষ্ণ, দেবতা তো বটে। কি বলিস্?

—তা বই কি।—আমি বললাম।

—আর আমার মুকুটের কি হবে ভাই?—সতীশ বলে উঠলো। আবার সকলের মুখ কালীময় হয়ে উঠলো! ওঃ! একখানা ইয়ে, এত মুকুট! এই মুকুটের চোটেইতো আমাদের প্লে বন্ধ হয়ে যাবে দেখছি!

—আমার একটা হ্যাট্ আছে, চলবে?—ফণী জিগ্যেস করলো।

—যাক, বাঁচা গেল! নিশ্চয় চলবে, কেন চলবে না?—সবাই সমস্বরে বলে উঠলো।

চুপি চুপি একদিন মাকে ডেকে নাটকখানা শোনালাম। মা হেসে বললেন—বেশ হয়েছে। কিন্তু সবাই যে পুরুষ—জরাসন্ধের বউ কই রে?

—ও সব বৌ-ফৌ বাজে, কি দরকার ওদের আনবার?—বিরক্ত হয়ে বললাম।

—তবে জরাসন্ধ মরে গেলে কাঁদবে কে?—মা আবার হাসলেন।

—তাইতো! মরে যাবার পর একটা কান্নাকাটির ব্যাপারও তো রাখা দরকার।—আচ্ছা কৃষ্ণ আর ভীমকে দিয়ে খানিকটা কাঁদিয়ে দিলে হয় না মা?

—হবে তাই।

ক্রমে ক্রমে দিন এগিয়ে আসতে লাগল। রিখাবচাঁদ রোজই তার বাড়ি থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাল ভাল শাড়ি আমাদের কাছে এনে জমা দিতে শুরু করলো। ওরা জৈন কিনা, তাই যথেষ্ট দামী কাপড়-চোপড় পরে। আমরা ওইগুলোই কোঁচা দিয়ে পরবো। ভোঁদল লুকিয়ে লুকিয়ে কালীর মুকুট, ফণী তার হ্যাট্, আর আমি ঠাকুরদার নামাবলীটা এনে সাজঘরের ম্যানেজার কমরুর হাতে জমা দিলুম। ভাটের তো আর ওসব রাজবেশ পরলে চলবে না, তাই দাদুর ওই সিল্কের নামাবলীটার ওপর অনেকদিন থেকেই আমার চোখ ছিল।

পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে চুপি চুপি সব দিদিমা ঠাকুরমাদের নেমন্তন্ন করে আসা হল। তাঁরা জরাসন্ধ বধের কথা শুনে বললেন, নিশ্চয়ই যাব। আর বলা হল—আমাদের নীচের ক্লাসে যে সমস্ত ছেলে পড়ে তাদের। যদিও বেশ জানি—কিই বা বুঝবে ওরা প্লের—তবু আসর ভর্তি করবার জন্যও তো কিছু লোকজন দরকার! তাই।

অভিনয়ের দিন।

বেলা পাঁচটায় যদিও আমাদের যাত্রা আরম্ভ হবার কথা, কিন্তু চারটে থেকেই দলে দলে মেয়ে আর ছোট ছোট ছেলে আসতে আরম্ভ করলো! তারা আর ভক্ত—তাদের ঠিক জায়গায় বসাতে বসাতে হয়রান হয়ে গেল।—অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অভিনেতা সাজঘরে এসে জড় হল। পেণ্টিং শুরু হয়ে গেল। চকখড়ির সঙ্গে আলতা মিশিয়ে—জিনিসটা কিন্তু খুব খারাপ হয়নি। রিখাবচাঁদ যখন সতীশ আর ভোঁদলকে জরাসন্ধ আর ভীম সাজিয়ে ছেড়ে দিল,—তখন তাদের চেনাই কঠিন। তারা দুজনে দুজনের দিকে এমনভাবে চাইতে লাগলো যে, আমার মনে হল—আসরে পেঁছিবার আগে এই বারান্দাতেই জরাসন্ধ বধ হয়ে যায় বুঝি?

—অমন করছিস কেনরে ভোঁদলা?—আমি বললাম!

—ফিলিং তৈরি করে নিচ্ছি। কিরকম মানিয়েছেরে আমাকে?

—চমৎকার!

—এই, কে আছিস? আমার গদাটা দিয়ে যাতো ইদিকে।—এই বলে ভোঁদল একটি হুঙ্কার ছাড়লো। সরে দাঁড়ালাম। আমার ভাটের পার্ট—কাজ কি বাপু আমার এসব যুদ্ধের হাঙ্গামে যাবার?

অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথমে ফণীদের একটা ভাঙ্গা সিঙ্গেল রিড হারমোনিয়াম আর একজোড়া খঞ্জনি দিয়ে কনসার্ট বাজান হল। তারপর ভাটের গান। আমি যে গানটি গাইলাম সেটা খুব ভালই হয়েছিল! কিন্তু হারমোনিয়ামটার সঙ্গে তৈরি করা ছিল না বলে—দুটো দুরকম শোনাচ্ছিল। তাহোক—তবু দুটোই ভাল হয়েছিল। প্লে এগিয়ে চলেছে। এমন জমেছে যে লক্ষ্য করে দেখলাম—ক্যাবলার ঠাকুমা এর মধ্যেই কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। তারপরে 'দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্যে—কৃষ্ণ যখন ভীমকে বললো—'চলো এবে যাই বধি গিয়া জরাসন্ধ দুরাত্মারে!' তখন সবাই একেবারে হু-হু করে কেঁদে উঠলো।

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

জরাসন্ধ সিংহাসনে হ্যাট মাথায় দিয়ে বসে তামাক খাচ্ছেন এমন সময় সভাস্থলে প্রবেশ করলেন শ্রীকৃষ্ণ আর ভীম। একখানা লোহার চেয়ারের উপর রিখাবচাঁদের আনা একখানা শাড়ি বিছিয়ে জরাসন্ধের সিংহাসন তৈরি হয়েছিল। ভীম আর কৃষ্ণকে আড়চোখে একবারটি দেখে নিয়েই জরাসন্ধ প্রহরীকে জিগ্যেস করলেন—কে দুই পামর আজি ঢুকিয়াছে আমার ভবনে? চোর কি ডাকাত তাহা বুঝিতে নারি। প্রহরী! শুধাও অবিলম্বে।

প্রহরী সসম্ভ্রমে উত্তর দিল—মহারাজ! দ্বারকা নগরী হতে কৃষ্ণ আর ভীম এসেছেন সাক্ষাতের তরে।

জরাসন্ধ সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর ভীম আর কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর এইরকম কথাবার্তা চললো।

ভীম—হে পাপিষ্ঠ! চিনিতে কি পার?

জরাসন্ধ—রে পাপিষ্ঠ! চিনিয়াছি তোরে।

ভীম—উত্তম! তবে বিলম্বেতে কিবা প্রয়োজন? দেহ যুদ্ধ মোরে।

জরাসন্ধ—যুদ্ধ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, তোর সনে হলে যুদ্ধ মোর—হাসিবে জগৎ। বেশ, তবে তাই হোক, কোন্ অস্ত্রে মৃত্যু চাস্ তুই? গদা কিম্বা তরবারি—যাহা ইচ্ছা বল্!

ভীম—অগ্রে হোক্ তরবারি রণ।

উঃ! কি ভীষণ যুদ্ধই না এরপরে শুরু হল। বন্—বন্—বন্—বন্ করে দুজনেরই তরোয়াল ঘুরছে,—কে হারে কে জেতে কিছুই বলা যায় না। ঠিক এই তরবারী-যুদ্ধের সময় আসরে দাঁড়িয়ে ভাটের—'কি কর কি কর নরবর' বলে একখানা গান ছিল। আসরের অবস্থা দেখে প্রম্‌টারকে ডেকে বললাম—গানখানা বাদ দিয়ে দে।

—কেন রে?

—যা বলছি—তাই কর্। জানিস্—বইটা আমার লেখা? ও-গান ওখানে রাখবো না, আমার ইচ্ছে।

—আচ্ছা।

জরাসন্ধ—নাবালক তুই, তরবারি ধরা তোর সাধ্য নয়।

—ধর গদা এবে।

কিন্তু ভোঁদলটা এই সময় বিশ্বাসঘাতকতা করলো। সে গদাটা ফেলে দিয়ে সটান গিয়ে সতীশকে জাপটে ধরলো।

—আরে! আরে! গদাযুদ্ধটা আগে করে নে!

—ধ্যাৎ তোর গদা!

জরাসন্ধকে নিয়ে ভীম সেন মাটীতে পড়লেন। তুমুল মল্লযুদ্ধ। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তখন একটা পাতা চিরে ভীমকে ইঙ্গিত করতে লাগলেন যে ওরকম ভাবে জরাসন্ধের মৃত্যু নেই! অতএব ওর দুটো পা ধরে টেনে চিরে দাও। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ভীম জরাসন্ধের পা দুটো ধরে উপর দিকে তুললো। শুধু তার মাথাটা আসরের সঙ্গে ঠেকে রইল! হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক এলো—সতে!

ভীমের হাতে জরাসন্ধের ঝুলোমান দেহটা বারকতক নড়ে উঠলো,—এই কি করছিস ভোঁদলা? ছেড়ে দে মাইরি, ছেড়ে দে। বাবা এসেছেন যে!

ভোঁদলের মাথায় তখন খুন চেপে গেছে, জরাসন্ধের পা দুটো টেনে দিতে দিতে সে নিজেই বানিয়ে বলে যেতে লাগলো—বাবা আসিয়াছে? মিথ্যা কথা তোর। বাবা বাবা করি তুই ঠকাইতে চাহিস আমারে? ওরে দুরাচার! তোর এই বাবা ভয় ঘুচাইব আজি।

—সতে! ডাকছি যে হারামজাদা? ছুঁচোপিড্। বলতে বলতে ভীমবেগে আসরের মধ্যে সতীশের বাবা প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়িভরা লোকজন ছায়াবাজীর মত শূন্যে মিলিয়ে গেল। শুধু দেখা গেল—সতীশের আসর থেকে গা-ঝাড়া দিতে সামান্য একটু দেরী হওয়ার জন্যে সে পিতৃ-কবলিত হয়েছে। তার দক্ষিণ কর্ণটা পিতার জিম্মায়, আর কার্ণিসের উপর বসে একজোড়া গোলা পায়রা ডাকছে।

তারপর কি হয়েছিল—তা আমি তোমাদের বলতে পারলাম না। কারণ—আমি ঠিক ঐ সময়টিতে ওখানে থাকা দরকার মনে করিনি। পরে শুনেছিলাম যে সতীশকে ঐ রকম জরাসন্ধ সাজেই প্রকাশ্য বাজারের উপর দিয়ে সেদিন বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর তার ডান দিককার কানটা বরাবর বাপের হাতেই ছিল।

আধমণি ঘন্টেশ্বর

বিশু মুখোপাধ্যায়

পাড়াগাঁয়ের বে-বাড়ি। বর ও বরযাত্রী এসেছে শহর থেকে। খাস দর্জিপাড়ার সব ছেলে-ছোকরা! বর—ভূতনাথ ওরফে ভূতো—নফরবাবুর আখড়ার ছেলে—নামকরা কুস্তিগীর; ইয়া বুকের ছাতি, কদম-ছাঁট চুল, গলায় কালভৈরবের কার্ পরা। দর্জিপাড়ার ফেলা-পালোয়ানের রকে ব'সে দিনরাত যে আড্ডা জমাত, সেই ভূতোকে মনে নেই?—তারই আজ বিয়ে মাকড়দায়।

বরযাত্রী খুব বেশী আসে নি। নেহাত যারা না এলে নয়, যেমন—পুরুত, নাপিত, বরের বাবা-কাকা, তা'রা ত এসেছেনই; তাছাড়া আর যারা এসেছে, তাদের মধ্যে বরের বিশিষ্ট বন্ধু হিসেবে—মান্কে, পট্লা, ঘন্টা, জিতে, ছোট বলাই, সয়া ও মদ্না প্রভৃতি কয়েক জনের নামই উল্লেখযোগ্য।

যে ঘরে বর বসেছে তারই এককোণে বয়স্থদের আড়াল ক'রে ছোকরাদের একটা মজলিশ জমে উঠেছে। কলকাতার বরপক্ষীয় ছেলেরা, নানান পট্টি ও বাকতাল্লা দিয়ে কন্যাপক্ষীয় ছেলেদের কাহিল ক'রে তুলেছে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই।

কথা চলেছে ওয়ার্ল্ড্ চ্যাম্পিয়ানদের নিয়ে। আখড়ার ব্যাপারে এর যোগ-সূত্র থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু কন্যাপক্ষীয় ছেলেরা বরপক্ষীয়দের সব কথাই যে বিশ্বাস করে এমন নয়; অনেক বিষয় অবান্তর ব'লেও তাদের ধারণা হয়। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস পায় না তারা।

হঠাৎ বরযাত্রীদের একজন নিজেদের দলের একজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে মুরুব্বি চালে বলে ওঠে—'খোকা, এই যে এঁকে দেখছ, ইনি হচ্ছেন বলাই চাটুজ্যের সাকরেদ। এঁকে আমরা ছোট বলাই বলি। এবার হনুলুলুর ওয়ার্ল্ড্ স্পোর্টস্-এ ইনি হাইজাম্প, লংজাম্প, সাঁতার, বক্সিং প্রভৃতি সব-গুলোতেই চ্যাম্পিয়ানশিপ্ পেয়েছেন। নামকরা খেলোয়াড়! 'আনন্দ-বাজার'-এ ছবি দেখ নি?'

গোব্রা হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে, ভাবতে চেষ্টা করে ছবি দেখেছে কিনা। কিন্তু মনে না পড়ায় অপ্রতিভ হয়।

বলাই সেই অবসরে পাতলা পাঞ্জাবির ভেতর থেকে তার নাতিদীর্ঘ বুক-খানাকে অপেক্ষাকৃত ফুলিয়ে তোলে।

'মাসল টিপে দেখ।'—মান্কে ইঙ্গিত করে গোব্রাকে।

পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে বলাই হাতের গুলি ফোলায়। গুলি টিপে

কিছুতেই সান্ত্বনা পায় না গোব্‌রা; সাধারণের চেয়ে খুব বেশী তফাত ব'লে মনে করতে পারে না সে।

এই ভাবের সব বাক্যালাপ চলতে থাকে।

গোব্‌রার দলে পাড়ার নিমন্ত্রিত ছেলে-ছোক্‌রা আরও অনেকে এসে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে কারও কারও প্রতিবাদের ইচ্ছা জাগে বটে কিন্তু পট্‌লার চেনছেঁড়া, জ্যান্ত মুরগি আস্ত খাওয়া ও লাঠির সাহায্যে একলা একশ' গুণ্ডাকে কাহিল করার বৃত্তান্ত হৃদয়ংগম হওয়ার পর সে ইচ্ছা প্রকাশ করার আর কারও উৎসাহ জাগে না।

গোব্‌রা আড়চোখে পট্‌লার দিকে চেয়ে নেয় একবার। জমিদার-বাড়ির ভরত পাইকের কথা মনে পড়ে তার। ভরতের ঠিক এমনি লিক্‌লিকে চেহারা, অথচ লাঠিতে কি অদ্ভুত দখল! পটলের প্রতি শ্রদ্ধায় সে নুয়ে পড়ে। দর্জি-পাড়া কলকাতার বিশিষ্টস্থান ব'লে ধারণা হয় তার। যেখানে এতগুলো রত্ন একসংগে স্থান পেয়েছে, সেখানকার কথা ভাবতেও সে গর্ব অনুভব করে। ম্যাট্রিকটা পাশ ক'রে কলকাতায় গিয়ে, প্রথমেই নফরবাবুর আখড়ায় যোগ দেবে—মনে মনে এরূপ সংকল্পও সে ক'রে বসে।

প্রত্যেকের সংগেই পরিচয় হয় তাদের। জিতে একদমে পাঁচশ' বৈঠক ও পাঁচশ' ডন্‌ দিয়ে বেংগল চ্যাম্পিয়ান হয়েছে শুনে, গোব্‌রার বন্ধু বোকা কয়েকটা নমুনা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

গোব্‌রা ভীষণ চটে যায় এতে। 'সেজেগুজে উনি কি এখানে ডন্‌-বৈঠকের পরীক্ষা দিতে এসেছেন!'—ব'লে রাগে সে গর্‌গর্‌ করে ওঠে। তারই গ্রামের ছেলে বোকা—এতই বোকা, দেখে সে হতাশ হয়।

জিতের চেহারাটা অপেক্ষাকৃত ভালই, কাজেই অন্যান্য ছেলেরা তার ওপর সন্দেহ করার অবকাশ পায় না। তাদের দৃষ্টি বহুক্ষণ জিতের দিকে নিবিষ্ট থাকে। জিতে মুখ টিপে হাঁসে কেবল, একটিও কথা বলে না।

'আরে এ'র সংগে এতক্ষণ তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেই নি। ইনি একজন মস্তবড় লোক, যাকে বলে, 'ম্যান অফ্‌ ইম্পরটেন্স্‌'।' পেট্‌কো ঘণ্টেশ্বর তখন খাওয়ার জায়গা হয়েছে কিনা জানবার জন্যে ছটফট করছিল। তার দিকে ইংগিত ক'রে মদ্‌না বলে—'আধমণি ঘণ্টেশ্বরের নাম শোন নি?'

গোব্‌রা থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু কনের ছোট ভাই গংগারাম ওরফে গোবু—'শুনেছি, শুনেছি, উনি খুব খেতে পারেন' ব'লে লাফিয়ে ওঠে।

—'খুব খেতে পারেন, মানে! সারা বাংলাদেশে উপস্থিত এ'র চেয়ে খাইয়ে আর নেই। কত রাজা-মহারাজার বাড়ি খেয়ে উনি কাপ-মেডেল পেয়েছেন। ওলেম্পিকে খাবার কম্‌পিটিসান্‌ কেবল ওঁর জন্যই খোলা হচ্ছে এবার। ছিঃ

ছিঃ, নেহাতই পাড়াগেঁয়ে তোমরা—কলকাতার এত কাছে থাক অথচ এসবের কিছুই খবর রাখ না!'

ঘণ্টেশ্বরের মুখ লাল হ'য়ে উঠতে থাকে। খায় সে একটু বেশীই, তবে তার দেহের তুলনায় সব সময় সেটাকে খুব বেশী বলা চলে না। কিন্তু এসব কি কাণ্ড করছে মদ্‌নাটা! মনে মনে সে গজগজ করে—ভাবতেও যে একেবারে মন্দ লাগে তা নয়—নিজের প্রশংসা শুনতে কে না চায়?

'না, না, ওসব কথায় বিশ্বাস ক'রো না।'—কন্যাপক্ষীয় শ্রোতাদের উদ্দেশে বিনয়ের সঙ্গে বলে ঘণ্টেশ্বর।

'অতি-বিনয়ে আর কাজ কি, চেহারা দেখেই সেটা ধ'রে ফেলা যায়! ব'লে মদন তাঁকে আর বেশী কথা বলার ফুরসত দেয় না। তাছাড়া মানুকে, সয়া, পট্‌লা প্রভৃতি সকলেই ব্যাপারটার ওপর জোর দিয়ে গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে এবং 'ফলেন পরিচীয়তে' বলতেও তারা কুণ্ঠা বোধ করে না।

এতক্ষণে গোব্‌রার মনে আশা জাগে। যাই হোক নফরবাবুর আখড়ার অন্ততঃ একজনের কৃতিত্ব আজ স্বচক্ষে তাদের দেখবার সুযোগ হবে। ক্রমশঃ আধমণি ঘণ্টেশ্বর না কৈলাস, কি একটা নাম তার মনে পড়ে যেন—বিখ্যাত খাইয়ে হিসেবে দিদিমার মুখে মামার বাড়িতে সে শুনেছে। ওলেম্পিক গেম-এ নিমন্ত্রিত সেই বিখ্যাত ব্যক্তি আজ তাদেরই গ্রামে—বুক তার দশ হাত হ'য়ে ওঠে, এই আদর্শ-পুরুষের গৌরবে।

ঘণ্টেশ্বরের কাছে এগিয়ে যায় সে, সশ্রদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করে—'সত্যিই কি এবার ওলেম্পিকে খাওয়ার কম্পিটিসান্ হচ্ছে এবং আপনি তা'তে নাম দিয়েছেন ঘণ্টেশ্বরবাবু?'

ঘণ্টেশ্বর, মাণিক ও মদনের দিকে চায়। মদন চোখ টেপে।

গম্ভীরভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘণ্টেশ্বর উত্তর দেয়—'হুঁ।'

—'আপনি এখান থেকে রওনা হচ্ছেন কবে?'

'শীগ্‌গির।'—কারুর ইঙ্গিতের অপেক্ষা না রেখেই ঘণ্টেশ্বর জবাব দেয় এবার।

ক্রমশঃ সংবাদটা ফেঁপে ফুলে বে-বাড়ির ছেলেমেয়ে, বুড়ো বুড়ী সবার কানেই ছড়িয়ে পড়ে। যেমন সংবাদের ছড়ান অভ্যাস—কান থেকে কানান্তরে! এমন কি বামুন, চাকর পর্যন্ত কেউ এহেন শুভ-সংবাদ শুনতে বাদ যায় না। আশপাশের বাড়িতেও কানাকানি হয় এই নিয়ে। সবারই আগ্রহ জাগে লোকটিকে দেখবার জন্যে। বরের চেয়ে দ্রষ্টব্য ও বরণীয় হ'য়ে ওঠে আধমণি ঘণ্টেশ্বর। মেয়েরা চারপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মারে, ফিসফাস করে চাপা গলায়। প্রবীণদের মধ্যেও অনেকে এগিয়ে এসে আলাপ জমায় ঘণ্টার সঙ্গে।

বেশীরভাগ সময়ই ঘণ্টেশ্বর 'হুঁ-হ্যাঁ' দিয়ে যায়, নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ক'রে বলতে পারে না কিছুই। কোথা থেকে তখন তার মাথায় এই ঢোকে যে, এসব কথা এখন মিথ্যা বললে যেমন কেউ বিশ্বাস করবে না, তেমনি তার নিজের চেয়ে অপমান বেশী হবে বরের। তাছাড়া নফরবাবুর আখড়ার নামটাও কম নয়! এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে জোর হাতপাখা নাড়ে, আর ভেতরে গুলগুল করে ঘামতে থাকে।

এমন সময় পড়ে খাবার ডাক। ক'নের মামা গলবস্ত্রে সবাইকে খাবার জায়গা হওয়ার সংবাদ দেন। ঘণ্টেশ্বরকে কেন্দ্র ক'রে কন্যাযাত্রী ছেলের দল এগিয়ে চলে। তার পাশে বসবার জন্যে ছেলে-বুড়ো সবার মধ্যে আগ্রহ দেখা দেয়।

'একটা দেখিয়ে যেতে হবে ঘণ্টা!'—যেতে যেতে ফিস-ফিসিয়ে মদনা বলে। সয়া তার সঙ্গে যোগ করে—'যন্দুর পারিস্ খাবি, তারপর সব ছাত থেকে পাচার করব।'

ব্যাপার কিন্তু ঘটে অন্য রকম। অর্থাৎ এ'দের বসান হয় নীচের একটা হল্-ঘরে। যেখান থেকে মেয়েরাও এই বিখ্যাত খাইয়েটির খাওয়া দেখার সুযোগ পায়; এমন জায়গায়। আর, সবার মাঝখানেই আসন দেওয়া হয় ঘণ্টেশ্বরকে।

খাওয়া হয় শুরু। ধামায় ধামায় আসে লুচি—আসে শাক, বেগুনভাজা, কুম্ড়োর ছোকা; তার পাতের ওপর তৈরি হয় এক ভীষণ ভয়াবহ স্তূপ! আরম্ভেই ঘণ্টেশ্বর আঁতকে ওঠে, গলদঘর্ম উপস্থিত হয় তার।

কর্মকর্তাদের কানে গিয়েও এ-খবর পেঁছতে দেরি হয় না। সারা বাড়ির লোক কাজ-কর্ম ফেলে এইখানে এসে জমায়েত হয়। বামুন খুন্তি হাতে দেখে যায়, কে সে বৃকোদর, যে তার পরিশ্রমের বৃহদাংশ নিঃশেষ ক'রে যাচ্ছে।

পট্লা, জিতে, মদ্না ওকে উৎসাহ দেয়। গোব্রাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া উচিত মনে করে।

'এর মধ্যে হয়েছে কি, দাঁড়ান মিষ্টি আসুক, তারপর হাতের খেলাটা দেখবেন।'—সাগ্রহে বলে মান্কে।

ঘণ্টেশ্বরের ওসব কথা তখন বিষবৎ মনে হয়। রাগে সে গরগর করে। অগ্নির তেজ ইতিপূর্বেই নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে।

এমন সময় আবার আসে এক গামলা মাছের কালিয়া। কালিয়ার আবির্ভাবে তার শরীরও কালিয়ে যাবার উপক্রম হয়। অন্যের শতগুণ ঢালা হয় তার পাতে। চারদিক থেকে 'আরো দাও, আরো দাও' শব্দে ঘর মুখরিত হ'য়ে ওঠে।

কাতর-স্বরে—'আর পারছি না—পারব না—দেবেন না,—দেবেন না আর!' ব'লে পাতের ওপর হাত নাড়ে, জোড়হাতে মাফ চায় ঘণ্টেশ্বর। কিন্তু কেউই কর্ণ-

পাত করে না তা'তে। গোব্‌রা বলে—'এর মধ্যে কি ঘণ্টেশ্বরবাবু, আধমণের দশ সেরও যে হয় নি এখনও!'

তখনও ধীরে ধীরে খেয়ে চলে ঘণ্টেশ্বর। বেশ বুঝতে পারে যে, ক্রমেই বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে সে। অনেকক্ষণ পূর্বেই হাত গোটান উচিত ছিল। কিন্তু চতুর্দিকের অনুরোধ, জোর-জুলুম, বিশেষতঃ বন্ধুদের মিথ্যাচারের গুঁতোয় তার না খেয়ে উপায় থাকে না। এদের প্রত্যেককেই তখন আর মারাত্মক শত্রু ব'লে মনে হ'তে থাকে। তবু তখনও মরিয়া হ'য়েই সে হাত চালায়।

কিন্তু হাত আর চলতে চায় না। আর শুধু হাত কেন, সর্বাঙ্গই যেন অবশ হ'য়ে আসতে থাকে তার। কি রকম একটা অস্বস্তি অনুভব করে ঘণ্টেশ্বর। ঘন ঘন জল ও লেবুর রসেও আর কাজ দেয় না।

অন্য সকলে এর বহু পূর্বেই হাত গুটিয়েছে। ঘণ্টেশ্বরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি সহজ কথা! পাশ থেকে মেয়েদের হাস্য-কৌতুক ভেসে আসে—যত সব উৎসাহ ও প্রশংসার বাণী-জড়ান।

সেই মুহূর্তেই একটা দই-এর হাঁড়ি শেষ হয়, লেডিকেনীর হাঁড়িটাও প্রায় শেষ হব-হব অবস্থায় পাশে প'ড়ে থাকে। মদ্‌না বলে—'ও ক'টা খেয়ে ফেল না, মিছে আর লজ্জা করিস কেন; ও তো তোর নস্যি!' কৌতুক করার জন্যে পরিবেশকদের মধ্যে দু'একজন আরো গোটা কয়েক আনবে কিনা জিজ্ঞাসা করে।

কিন্তু একি! ঘণ্টা এরকম করে কেন? চোখ দুটোও যে বুজো-বুজো!

'এই ঘণ্টা? ঘণ্টা?—হাত ধুবি—উঠবি?'—জোর গলায় প্রশ্ন করে মান্‌কে। ঘণ্টা কিছুই পারে না। হঠাৎ সেইখানেই এলিয়ে পড়ে সে। কথাও জড়িয়ে আসে যেন। খুব কষ্টে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে—'বাবাকে খবর দাও।'

সবাই উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি। ধরাধরি ক'রে তা'কে ফাঁকায় নিয়ে আসে; শুইয়ে দেয় বাইরে একটা মাদুরে—মুক্ত হাওয়ায়। জয়ঢাকের মত পেটটা ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। সে বিশেষ কিছু বলতে পারে না, গড়াতেও পারে না; একটা নিদারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন মুখে প্রকাশ পায় কেবল।

বাড়িসুদ্ধ হৈ-চৈ প'ড়ে যায়। ডাক্তার, জল, পাখা, ভিড় ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ প্রভৃতি হাজার রকম উপদেশ ও চিৎকার বে-বাড়িতে সৃষ্টি করে এক নতুন অধ্যায়। বাসর-ঘর থেকে বর ভূতনাথ ছুটে আসে। এসে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করাবার অনুরোধ করে তাকে। কিন্তু গলায় আঙুল দেবার ক্ষমতাও তখন লোপ পেয়েছে তার। অস্ফুটস্বরে অতি কষ্টে সে শুধু বলে—'বড়দা, আর আমি বাঁচব না, বাবাকে খবর দাও।'

কন্যাপক্ষীয় ছেলেদের কয়েকজন মুখ টিপে হাসে তখন। ব্যাপারটা যেমন করুণ তেমনি হাস্যকর বটে! হাসি যখন পায় তখন আর উপায় কি!

ইতিমধ্যে রমেশ ডাক্তার এসে পৌঁছন তাঁর ব্যাগ সমেত। রোগী দেখে মুখ বিবর্ণ করেন তিনি। কোন রকমে পেট থেকে ওগুলো বের ক'রে দেওয়াই হচ্ছে রোগীকে বাঁচানোর এখন একমাত্র উপায়। কিন্তু হার্টের ওপর এমন প্রেসার পড়েছে যে, একটুতেই হার্টফেল হওয়ার সম্ভাবনা। খুব ভেবে চিন্তে ডাক্তারকে ওষুধ দিতে হয়।

ফল খুব সামান্যই দেখা দেয়। অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে রোগী। তখন ডাক্তারের যুক্তিতে কলকাতার মেডিকেল কলেজেই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাঁকে। বরের গাড়িই সে রাত্রে তাঁকে বহন ক'রে কলকাতায় ফেরে। সঙ্গে মান্কে, মদ্না, জিতে, সয়া প্রভৃতি আরও কয়েকজন তার অনুগমন করে।

তাদের বিদায় দিতে কন্যাপক্ষীয় অনেকেই মোটরের সামনে এসে দাঁড়ায়। বরপক্ষীয় ছেলেদের মুখ তখন বিষাদ-মলিন। পূর্বের সে উত্তেজনার ভাব তাদের মধ্যে ক'মে গেছে এখন—সকলেই মুষড়ে পড়েছে তারা। বরপক্ষীয় ছেলেরা কন্যাপক্ষীয়দের বিদায়-অভিবাদন জানায়; এরাও প্রতি-নমস্কার করে। কিন্তু গোব্রার যেন দিব্যচক্ষু খোলে এতক্ষণে! দুঃখের চিহ্ন তার চোখে মুখে কোথাও ধরা পড়ে না, সবার সামনে গলা ছেড়েই সে ব'লে ওঠে—'অল লায়ার্স'—যত সব ধাপ্পা আর চালবাজী!'

কিছুদিন পরে, সে বছর পুজোর কয়েক দিন আগে, গ্রে-স্ট্রীটের মোড়ে ঘণ্টেশ্বরের সঙ্গে ভূতোর দেখা। কথায় কথায় ভূতো বলে—'হ্যারে, শ্বশুর মশাই অনেক ক'রে এবছর পুজোয় একদিন তোকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন, যাবি মাকড়দায়?'

সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টেশ্বর জবাব দেয়—'মাফ্ করো বড়দা', আবার মাকড়দা!'

বুদ্ধদেব বসু

ফল্গু শুনেছিলো তার মামা যুদ্ধের ব্যবসায় বড়োলোক হয়েছেন, কিন্তু সে-বড়োলোক মানে যে এই তা সে ভাবতেও পারেনি। কেমন ক'রেই বা পারবে।

কয়েক বছর আগে একবার মা-র সঙ্গে মামাবাড়ি এসেছিলো সে—মনে পড়ে সাপের মতো একটা গলি, দোতলায় দু-খানা ঘর; একতলায় ঘুটঘুট্টি রান্নাঘর আর এঁদো কলতলা—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে যে-একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ নাকে আসতো তা সে আজ পর্যন্ত ভুলতে পারেনি। আর এবার সে যেখানে এসে উঠলো, সে একটা মস্ত, আস্ত দোতলা বাড়ি, বড়ো-বড়ো ঘর, চারটে বাথরুম, বাথরুমে কত সব কলকব্জা, ঘরে-ঘরে কত রকমের কত আসবাব, কার্পেট, পিয়ানো, ছবি—তিনটে গারাজে তিনখানা গাড়ি, কখনো মামা বেরোচ্ছেন ছোটো গাড়ি নিয়ে কাজে, কখনো মামি বেরোচ্ছেন বড়ো গাড়ি নিয়ে শাড়ি কিনতে, কখনো বকুল—তাঁদের মেয়ে—মেজ গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছে কলেজে কিংবা বন্ধুর বাড়িতে চা খেতে।

এ কি ভোজবাজি? না কি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ?

সবই তো ভালো, কিন্তু ফল্গুর যেন কিছুই ভালো লাগে না। সে ভালো ক'রে স্নান করতে পারে না, পাছে তার কোনোরকম অসাবধানতায় বাথরুমের মেঝে ভিজে যায়; ভালো ক'রে খেতে পারে না, পাছে টেবিলের ধবধবে কাপড়ে মাছের ঝোলের দাগ লাগে; ভালো ক'রে বসতে পারে না, পাছে তার জামা-কাপড়ের সংস্পর্শে চেয়ারের গদি ময়লা হয়। মাদারিপুর থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে সে এসেছে কলেজে পড়বে ব'লে—মামাবাড়িতে থাকবে এ তো ধরাধার্য, অথচ মনে-মনে সে এমন হাঁপিয়ে উঠলো যে তার কেবলই মনে হ'তে লাগলো হস্টেলে থাকাই তার ভালো। অথচ কেমন ক'রে সে কথাটা পাড়বে কিছুতেই ভেবে পেলো না।

মামা তাকে দেখে খুব খুশি, মামিও যত্ন করেন খুব, কিন্তু তাতে কী? ভারি একা-একা, ফাঁকা-ফাঁকা লাগে তার—কলেজের ক্লাশ এখনো আরম্ভ হয়নি—সারাদিন কিছু করবার নেই। একদিন মামি তাকে বললেন, 'একা-একা চুপচাপ ব'সে আছো কেন—যাও না ওখানে, পানু-ভানু খেলার খবর শুনছে রেডিওতে—রেডিও ভালো লাগে না তোমার?'

ফল্গু মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

'রেডিওতে গান-টানও শুনতে পারো—আর যদি গ্রামোফোন তোমার ভালো

লাগে, বকুলকে বোলো বের ক'রে শোনাবে। যখন যা ইচ্ছে হয় বোলো, লজ্জা কোরো না,' মামিমা অভয় দিয়ে হাসলেন।

লজ্জা একটু-একটু করে বইকি, নয়তো ফল্গু দু-একখানা বই চেয়ে নিতো। ড্রয়িংরুমে ঝকঝকে একটি আলমারিতে মোটা-মোটা ঝকঝকে বই থরে-থরে সাজানো, দেখে ফল্গু মুগ্ধ হয়েছে, লুব্ধ হয়েছে। একদিন, কাছাকাছি যখন কেউ ছিলো না, আলমারিটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে—কাচের ভিতর দিয়ে বইগুলির নাম পড়েছে—সারি-সারি ইংরাজি বই, এনসাইক্লোপীডিয়া, জীব-জন্তুর কথা, বিজ্ঞান, আরো কত কী। কিন্তু সবচেয়ে তাকে উতলা করেছে এক সেট রবীন্দ্র-রচনাবলী, ঘন ব্রাউন রঙে বাঁধানো পাশাপাশি আঠারোখানি বই—দু-খানি ক'রে মলাটের মধ্যে বাঁধা আছে কত সৌন্দর্য, কত আনন্দ, কত বিস্ময়। একখানা পুরোনো পাতা-ছে'ড়া চয়নিকা সে পেয়েছিলো একবার, পড়তে-পড়তে আগাগোড়া প্রায় মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তাছাড়া রবীন্দ্র-নাথের আর বিশেষ কিছু সে পড়েনি। শুনেছিলো খণ্ডে-খণ্ডে রবীন্দ্র-রচনাবলী বেরোচ্ছে, একখানাও চোখে দ্যাখেনি এ-পর্যন্ত। একসঙ্গে সমস্ত-গুলি খণ্ড শুধু চোখ দিয়ে দেখে-দেখে বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলো সে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাচের উপর সস্নেহে হাত বুলিয়েছিলো, কাচের সঙ্গে নাক ঠেকিয়ে যেন নিশ্বাস দিয়ে বইয়ের ভিতরটাকে শুষে নিয়েছিলো। না—হস্টেলে গিয়ে কাজ নেই, এখানেই থাকবে সে, তাহ'লে তো সমস্ত রচনাবলী সে প'ড়ে ফেলতে পারবে, ফিরিয়ে দেবার তাগিদ থাকবে না ব'লে পড়তে পারবে বার-বার।

মামা ভারি ব্যস্ত—তাঁর সঙ্গে সেই প্রথম দিন দু-চারটে যা কথা হয়েছে, তার পরে বলতে গেলে আর দেখাই হয়নি। সেদিন কী ভাগ্যে মামা একটু শীগ্‌গির বাড়ি ফিরলেন, রাত্রে খাওয়ার পরে ড্রয়িংরুমে ব'সে পান চিবোতে-চিবোতে ফল্গুকে ডাকলেন কাছে। এ-কথা ও-কথার পর ফল্গু বললে, 'তোমার রবীন্দ্র-রচনাবলীর পুরো সেট আছে দেখছি।'

'অ্যাঁ?'

ফল্গু আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আবার বললে, 'রবীন্দ্র-রচনাবলীর পুরো সেট দেখছি।'

'না, না, পুরো আর কোথায়—এখনো আরো অনেকগুলো ভল্যুম বেরোবে। আলমারিতে জায়গা রেখেছি, দেখছো না।'

মামি বললেন, 'বেশ সুন্দর বইগুলো, না?'

মামা বললেন, 'হ্যাঁ—মন্দ করেনি একরকম, তবে সোনালি অক্ষরে নাম লেখাটা কিছুতেই বিলিতি বইয়ের মতো হয় না।'

'নীল রঙের মলাট হ'লে আরো ভালো হ'তো—লাইট-ব্লু দেয়ালের সঙ্গে ডার্ক-ব্লু বই ম্যাচ করতো বেশ,' ব'লে মামি একটু হাসলেন।

'ঐ তোমার এক নীল বাতিক হয়েছে—' মামা ব'লে উঠলেন, 'বারো শো টাকা দিয়ে ব্ল্যাক মার্কেটে এনসাইক্লোপিডিয়া কিনতে হ'লো সুদ্ধু তোমার নীলের শখ মেটাতে।'

'আলমারিতে সবগুলো বই যদি ঐ-রকম নীল রঙের হ'তো তাহ'লে কি খুবই সুন্দর হ'তো না? ফল্গু কী বলো?' ফল্গুকে স্বপক্ষে টানার চেষ্টায় মামি তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন একটু।

ফল্গু কী বলবে ভেবে পেলো না।

'এই দ্যাখো, কার্পেটেও নীল রয়েছে,' মামি বলতে লাগলেন। 'এই কার্পেট আর ঐ ছবিখানা একদিনে কেনা হয়েছিলো—দুটোই পছন্দ করেছিলাম আমি —ঠিক কার্পেটের লাল, নীল আর হলদেই ছবিতে দেখতে পাচ্ছো তো! কেমন মিলেছে!'

ফল্গু ছবিখানার দিকে একটু তাকিয়ে রইলো।

মামি একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বললেন, 'কার আঁকা জানো তো ছবিখানা? যামিনী রায়ের—এ-যুগের সবচেয়ে বড়ো আর্টিস্ট উনি।'

'দ্যাখো', মামা ব'লে উঠলেন, 'একতলার বসবার ঘরটা বড়ো ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখায়—খান দুই ছবি ওখানেও রাখলে হয়।'

'ওটাকে একটা আপিশ-ঘর ক'রে রেখেছো তুমি—ওখানে কি আর ছবি মানাবে?'

'তা মন্দ বলোনি। তাহ'লে এক কাজ করা যাক, ওটাকেও একটা ড্রয়িংরুম ক'রে ফেলি—শান্তিনিকেতন ধরনের—একটু ওরিএণ্টাল—ঘর সাজানো হ'য়ে গেলে তুমি পছন্দ ক'রে ছবি কিনো—এ-সব বিষয়ে তোমার একটু ন্যাক্‌ই আছে দেখছি।'

মামি খুশি হ'য়ে একটু হাসলেন, তারপর চললো দু-জনের মধ্যে একতলার ড্রয়িংরুমের পরিকল্পনা, তার পরদা, তার কুশান, তার সেণ্টার-টেবল, তার কত রকম খুঁটিনাটি। রবীন্দ্র-রচনাবলীর কথা উত্থাপন করবার আর সুযোগই পেলো না ফল্গু—সাহসও পেলো না, সত্যি বলতে।

পরের দিন রবিবার। দুপুরবেলা খাওয়ার পরে মামা-মামি বকুলকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সিনেমা দেখতে, ফল্গু ঘুরঘুর করতে-করতে সেই ড্রয়িংরুমে এসে বইয়ের আলমারির সামনে দাঁড়ালো। পানু ভানু কাছেই ব'সে ছিলো, তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ফল্গু হঠাৎ ব'লে ফেললো, 'আচ্ছা, এর একখানা বই পড়বার জন্য নেয়া যায় না?'

পানু বললে, 'অ্যাঁ?' আগের রাতে তার বাবা যেমন ক'রে 'অ্যাঁ' বলেছিলেন, ঠিক তেমনি ক'রেই বললে।

'এই যে এখানে রবীন্দ্র-রচনাবলী রয়েছে,' ফল্গু মুখ ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকালো, 'এর একখানা একটু নেয়া যায় না পড়ার জন্য?'

কথা শুনে দু-ভাই চকিতে একবার পরস্পরের দিকে তাকালো, তারপর ফিক ক'কে হেসে ফেললো।

ফল্গু একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়ে বললে, 'তোমরা এ-সব বই পড়ো না?'

এবার হি-হি ক'রে হেসে উঠলো দু-ভাই।

ফল্গু কিছুতেই ভাবতে পারলে না যে সে হাসবার মতো কিছু বলেছে। রীতিমতো অবাক হ'য়ে বললে, 'হাসছো কেন?'

বড়ো ভাই পানু বললে, 'তুমি বলছো কী, ফল্গু-দা? ও-সব বই তুমি পড়বে?'

'কেন? এ এমন একটা অসম্ভব কথা কী'. ফল্গু আরো বেশি অবাক হ'লো।

ছোটো ভাই ভানু গম্ভীরভাবে বললে, 'বাঃ, পড়লে ময়লা হয় যদি?'

'যদি পাতা ছিঁড়ে যায়?' বললে পানু।

'যদি কালি লাগে মলাটে?'

'যদি কোণ যায় দুমড়ে?'

'বাবা একদিন', ভানু বলতে লাগলো, 'কী-একটা কথার বানান দেখবার জন্য ঐ মোটা লাল ডিকশনরিটা বের করতে যাচ্ছিলেন, মা এমন তাড়া দিলেন যে বই তক্ষুনি ফিরে গেলো আলমারিতে। আমার জেম ডিকশনারিটা বাবা চেয়ে নিলেন অগত্যা—কিন্তু তাতে ও-কথাটা পাওয়া গেলো না—তারপর বাবা তাঁর এক প্রোফেসর বন্ধুকে টেলিফোন ক'রে জেনে নিলেন বানানটা।'

ফল্গু মনে মনে বললে, 'ছেলে দুটো ভারি ফাজিল তো!' মুখে বললে, 'আলমারির চাবি কার কাছে?' এমনভাবে বললে যেন ওদের কথা সে শোনেইনি।

পানু বললে, 'চাবি হারিয়ে গেছে।'

'হারিয়ে গেছে মানে?'

'হারিয়ে গেছে মানে হারিয়েই আছে। সেই যে—ভানু, মনে নেই—সেই যে একবার বীণাপিসি এসে আলমারির একখানা বই ধার চেয়েছিলেন—মা-বাবা একবার চোখাচোখি করলেন, তারপর মা বললেন, "চাবি হারিয়ে গেছে"।'

ভানু বললে, 'সেই যে একবার চাবি হারালো, তারপর আর খুঁজেই পাওয়া গেলো না। এ নিয়ে কতবার যে মা-কে বলতে শুনলাম, "চাবি হারিয়ে গেছে"!'

দু-ভাই আবার একসঙ্গে হেসে উঠলো।

ফল্গু মনে-মনে বিরক্ত হ'য়ে জিগ্যেস করলে, 'তোমাদের কখনো ইচ্ছেও করে না এ-সব বই পড়তে?'

'না, আমাদের ও-সব ইচ্ছে-টিচ্ছে নেই,' ব'লে পানু পাড়ার লাইব্রেরি থেকে ধার-ক'রে-আনা একখানা তেল-চিটচিটে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে লেগে গেলো, আর ভানু মেঝেতে লুডো বিছিয়ে বললে, 'একটু খেলবে, ফল্গু-দা?'

'নাঃ।' আর-কিছু না-ব'লে ফল্গু চলে এলো সেখান থেকে। পানু ভানু একেবারে বাজে—এত বই বাড়িতে, কোনোদিন একখানার পাতা উল্টিয়েও দ্যাখেনি! আর কী সব যা-তা বলছিলো!

সেদিন মামা আড়াই-শো টাকা দিয়ে একটা অ্যালসেশিয়ান বাচ্চা-কুকুর কিনে নিয়ে এলেন বাড়িতে। রাতে খাওয়ার পরে সবাই মিলে অনেকক্ষণ ধ'রে সেই কুকুরের বাচ্চা নিয়ে আলোচনা চললো। কোথায় তার কেনেল হবে, কী খাবে সে, কেমন ক'রে 'মানুষ' ক'রে তুলতে হবে তাকে, বড়ো হ'য়ে কেমন জ্বলজ্যান্ত নেকড়ে বাঘের মতো দেখতে হবে, এ-সব কথায় মা, বাবা আর তিনটি ছেলে-মেয়ে সকলেরই সমান উৎসাহ দেখা গেলো। তারপর রাত যখন এগারোটা বেজে গেলো, মামা একটা-দুটো হাই তুলে বললেন, 'এবার শুয়ে পড়া যাক,' আর পানু-ভানু দু-জনেই টাইগারকে নিজের বিছানার অংশ ছেড়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো, তখন কথাবার্তার মধ্যে কোনো একটা বিরতির সুযোগে ফল্গু মামার দিকে তাকিয়ে বেশ চেঁচিয়ে স্পষ্ট ক'রে বললে, 'আমাকে একখানা রবীন্দ্র-রচনাবলী পড়তে দেবে, মামা?'

ঘরের মধ্যে হঠাৎ এমন স্তব্ধতা নামলো, যেন কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ উচ্চারিত হয়েছে এইমাত্র। এমনকি, সাক্ষাৎ টাইগারকে সবাই যেন ভুলে গেলো তখনকার মতো। মামা পাথরের মতো গম্ভীর মুখ ক'রে ব'সে রইলেন, বকুলের হাসিখুশি মুখে ভীষণ দুশ্চিন্তার ছায়া নামলো, পানু ভানুর মুখ হাঁ হ'য়ে গেলো, চোখ উঠলো কপালে। সেই নিথর স্তব্ধতাকে প্রকম্পিত ক'রে ফল্গু আরো একটু চেঁচিয়ে আরো একবার বললে. 'আমাকে একখানা রবীন্দ্র-রচনা-বলী পড়তে দেবে, মামা?'

এতক্ষণে কথা বললেন মামি—অন্য সমস্তগুলি চোখ জোড়া-জোড়া হ'য়ে তাঁর মুখের উপর এসে পড়লো।

'রবীন্দ্র-রচনাবলী? পড়বে?'

'এই একটু যদি—' ফল্গু বিনীত সুরে জবাব দিলে।

'সত্যি পড়বে?'

এবার একটু অবাক হ'লো ফল্গু, মনে-মনে একটু রেগেও গেলো। সত্যি পড়বে মানে? মামিমা কি ভাবেন রবীন্দ্রনাথের লেখা সে বুঝবে না?

'এখনই পড়বে?' পুনরায় প্রশ্ন করলেন মামিমা।

'যদি কোনো অসুবিধে না হয়—'

'না, না—তবে কিনা—এই—রাত তো কম হ'লো না।'

'এমন আর বেশি রাত কী—আর ঘুমোবার আগে বিছানায় শুয়ে বই পড়তে আমার ভালোই লাগে।'

মামিমা চুপ ক'রে ব'সে থাকলেন একটু, তারপর অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখি—চাবিটা আবার—'

খুব আস্তে তিনি উঠলেন, খুব আস্তে হাঁটলেন। পানু, ভানু, বকুল অবাক হ'য়ে দেখলো, বইয়ের আলমারি খোলা হচ্ছে। 'কোন্ খণ্ড নেবে?' জিগেস করতে মামির প্রায় গলা ভাঙলো।

'যেটা হয়।'

মামি প্রায় মিনিটখানেক চিন্তা করলেন, তারপর বারোর খণ্ড বের ক'রেই যেন শিউরে উঠলেন। 'উঃ, বিশ্রী দেখাচ্ছে—ঠিক ফোকলা দাঁত!' তক্ষুনি সেটা ফিরিয়ে রেখে হাত দিলেন প্রথম খণ্ডে। 'এখানকার ফাঁকাটা তেমন বোঝা যায় না—'

ফল্গু তাড়াতাড়ি বললো, 'বেশ তো, প্রথম খণ্ডেই হবে আমার।'

মামি যতক্ষণে বইখানা ফল্গুর হাতে তুলে দিলেন, ততক্ষণে পানু ভানুর চোখ প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু ফল্গুর আর কোনোদিকেই মন নেই। বই নিয়ে এক ছুটে সে ঘরে। খুশিতে বিছানায় গড়ালো খানিকক্ষণ, শান্ত হ'য়ে শুয়ে আস্তে তুলে নিলো বইখানা, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো কয়েকবার, অত্যন্ত মৃদু ক'রে স্পর্শ করলো মসৃণ পাতাগুলি, গালে ছোঁওয়ালো, মুখের কাছে এনে নতুন বইয়ের গন্ধ নিলো বুক ভ'রে। অবশেষে কোনো-একটা পাতা খুলে যেই সে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তখনই দরজার বাইরে শোনা গেলো মামির গলা, 'ফল্গু!'

ফল্গু ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে বসলো। 'কী, মামিমা, কী হয়েছে?'

'কিচ্ছু হয়নি। আমি ভাবলাম তুমি বুঝি বই বুকে নিয়েই ঘুমুলে। ওতে বড্ড পাতা দুমড়ে যায়—আর ভীষণ বোবায় ধরে ঘুমের মধ্যে।'

'তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই, মামিমা, পড়তে-পড়তে ঘুমুবো না আমি।'

'আর কতক্ষণ পড়বে?'

'এই—যতক্ষণ না ঘুম পায়।'

'বেশি রাত জেগো না, ফল্গু—স্বাস্থ্যের কথাও তো ভাবা চাই।' ব'লে মামিমা শুকনো হেসে বিদায় নিলেন।

ফল্গু আবার শুয়ে প'ড়ে 'সন্ধ্যা-সংগীত' খুললো। মিনিট দশেকও বোধহয়

কাটেনি, আবার বাইরে মামির গলা : 'ফল্গু!'

'মামিমা!'

'না—জিগেস করছিলাম, তোমার ঘরে খাবার জল-টল দিয়েছে? আর-কিছু চাই?'

মামিমার সৌজন্যে মুগ্ধ হ'য়ে ফল্গু বললে, 'সব ঠিক আছে, মামিমা—কিছু চাই না। তুমি শুয়ে পড়ো।'

'তুমি আর কত রাত জাগবে?'

'ঘুম পেলেই ঘুমিয়ে পড়বো, মামিমা।'

'আচ্ছা—'

এর পর ফল্গু যখন দু-একবার পাতা উল্টিয়েছে, এবং সবেমাত্র যখন তার মন লেগেছে বইয়ের পাতায়, ঠিক তক্ষুনি : 'ফল্গু!'

হঠাৎ ফল্গুর মনে হ'লো যে মামিমা তাকে কিছু একটা বলতে চান যা বলতে তাঁর সংকোচ হচ্ছে। এবার সে বিছানা ছেড়ে নামলো, বই হাতেই দরজায় গেলো।

মামিমা তাকে দেখে খুব যেন আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন, 'ও, ঘুমোওনি!'

'ঘুমোবো কেন? আমি তো—'

'ও কী!' মামি হঠাৎ যেন সাপ দেখে চমকে উঠলেন, 'বইয়ের ভিতর আঙুল!'

'বইয়ের ভিতর আঙুল?' ফল্গু প্রথমে বুঝলো না কথাটা, তারপর হঠাৎ বললে, 'এই—ওখানটায় পড়ছিলাম কিনা, তাই—' বলতে বলতে আঙুল তুলে আনলো।

'ওতে বই নষ্ট হয় বড়ো, আঙুলের দাগও লাগে পাতায়—ও-রকম করা কি ভালো? যাক, হ'লো তো তোমার পড়া? আমি দ্যাখো বাপু তেমন লোক নই যে বাড়ির ছেলে একখানা বই পড়তে চাইলে বই দেবো না। কিন্তু পড়া হ'য়ে গেলে বই তুলে রেখে, আলমারিতে চাবি দিয়ে তবে তো আমি শোবো। সেইজন্য বার-বার ডাকছিলাম তোমাকে—কিছু মনে করলে না তো?'

'না মামিমা,' একটু চুপ ক'রে থেকে ফল্গু বললে, 'আমি কিছু মনে করিনি। এই নাও বই, তুলে রাখো, চাবি দাও আলমারিতে, তারপর নিশ্চিন্ত হ'য়ে শোও।'

বইখানা হাতে নিয়ে মামিমা বললেন, 'আবার যদি কখনো কোনো বই পড়তে ইচ্ছে হয়, বোলো কিন্তু আমাকে—লজ্জা কোরো না।'

ফল্গু পরের দিনই কোনো-একটা অছিলা ক'রে মাদারিপুর চ'লে গেলো, তারপর ক্লাশ আরম্ভ হবার সময় যখন ফিরে এলো, সোজা উঠলো হস্টেলে।

নতুন ছেলে নটবর

লীলা মজুমদার

সেই ছেলেটা প্রথম যেদিন মাস্টারমশায়ের পেছন পেছন ক্লাশে ঢুকল, গায়ে নীল ডোরা-কাটা গলাবন্ধ কোট আর খাকি হাফপ্যাণ্ট, চুলগুলো লম্বা হয়ে মোটা মোটা কানের উপর ঝুলে পড়েছে, তেলচুকচুকে আহ্লাদে-আহ্লাদে বোকা মতন ভাবখানা, দেখেই আমাদের গায় জ্বর এল। আবার আমোদও লাগল একে নিয়ে বেশ একটু রগড় করা যাবে মনে করে।

ছেলেটার পায়ে ফিতে-দেওয়া কালো জুতো একটু কিচকিচ করছিল, তাইতে নগা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল—'জুতোর বুঝি দামটা আসচে মাসে দেওয়া হবে?' ছেলেটা কিন্তু কিছু না বলে খাতা পেন্সিল নিয়ে থার্ড বেঞ্চে গিয়ে চুপ করে বসল।

'মাস্টার মশাই বললেন, 'ওহে নটবরচন্দ্র, বছরের মাঝখানে এয়েচ. ভাল করে পড়াশুনো কর।'

নাম শুনে আমরা ত হেসেই কুটোপাটি, নগা তার তক্ষুনি নাম দিয়ে ফেলল, —'লটবহর'।

সত্যি নগার মতন রসিক ছেলে খুঁজে পাওয়া দায়।

টিফিনের সময় নটবরচন্দ্র একটা ছোট্ট বইয়ের মতন টিনের বাক্স খুলে লুচি আলুর দম খেয়ে, হাত চাটতে চাটতে বার বার আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। তাই না দেখে নগা বললে—'কি রে ছোঁড়া মানুষ দেখে বুঝি অভ্যেস নেই?'

আমরা তাগ করেছিলাম, চটেমটে ছেলেটা কি করে দেখব। ব্যাটা কিন্তু খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ মুখে হাত দিয়ে বিশ্রী রকম ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে লাগল। নগা রেগে বলল—'অত হাসির কথা কি হল শুনতে পারি?'

ছেলেটা অমনি নরম সুরে বলল—'কিছু মনে করো না ভাই, সত্যি আমার হাসা উচিত হয় নি, কিন্তু তোমাদের দেখে আমার হঠাৎ মেজমামার পোষা বাঁদরগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। কেবল ঐ ওকে ছাড়া—'

বলে আমাকে দেখিয়ে দিল। নগারা রেগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল, আমি কিন্তু একটু খুশি না হয়ে পারলাম না; অল্প হেসে জিজ্ঞেস করলাম—'আর আমাকে দেখে কিসের কথা মনে হচ্ছে?'

সে অম্লানবদনে বললে—'মুলতানি গরুর কথা।'

ভীষণ রাগ হল। ভাবলাম ছোটবেলা থেকে এই যে শ্যামবাবুর কাছে স্যাণ্ডো শিখেছি সে কি মিছিমিছি। তেড়ে গিয়ে এইসা এক প্যাঁচ কষে দেবার

চেষ্টা করলাম যে কি বলব। সে কিন্তু কি একটা ছোটলোকি কায়দা করে এক সেকেণ্ডে আমাকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দিল। ঠিক তক্ষুনি ক্লাশের ঘণ্টা পড়ল, নইলে তাকে বিষম সাজা দিতাম।

ক্লাশের পর বাড়ি যাবার পথে তার জন্য ওঁৎ পেতে রইলাম, আমি আর একটা ছেলে। সে দেখা হতেই হাসিমুখে বলল—'কি হে চীনাবাদাম খেতে আপত্তি আছে?'

আমরা আর কি করি, একেবারে ত আর অভদ্র হতে পারি না, তাই চীনা-বাদাম নিয়ে তাকে বুঝিয়ে বললাম—'দ্যাখ, নতুন ছেলে এসেছিস, নতুন ছেলের মত থাকবি; আজ দয়া করে তোর চীনাবাদাম খেলুম বলে যেন মনে করিস না যে দুপুরের কথা ভুলে গেছি।'

সে বললে—'রাগ কোর না ভাই! আমি যদি জানতাম অমন হোঁৎকা শরীর নিয়েও তুমি এমন ল্যাদাড়ে তবে কি আর কষ্ট করে জনসোয়ানি প্যাঁচ লাগাতাম, এই অমনি দু আঙ্গুলে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিতাম।'

এই বলে আমাকে কি একটা কায়দা ক'রে চিৎপাত করে দিয়ে নিমেষের মধ্যে সে ত হাওয়া!

এর থেকেই বোঝা গেল সে কি ভীষণ ছেলে। সারারাত মাথা ঘামিয়েও তাকে জব্দ করবার উপায় দেখলুম না। পরদিন সকালে ছোটমামা বলল—'কি রে ভোঁদা, মুখ শুকনো কেন? পেট কামড়াচ্ছে বুঝি? রোজ বলি অত খাস নি!'

যা বুদ্ধি এদের! বললুম—'যে বিষয় কিছু বোঝ না সে বিষয় কিছু বলতে এস না।'

নটবরকে না পারতে পারি, তাই বলে যে অন্যদেরও এক কথায় চুপ করিয়ে দিতে পারি না, এ কথা যেন কেউ না মনে করে।

হাবুটার কাছ থেকেও কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। নিজের বেলা ত খুব বুদ্ধি খোলে, কিন্তু আমি যখন সব খুলে বলে পরামর্শ চাইলাম, সে উল্টে বললে—'তুই আর তোর নগা না বগা, দুটি মাণিকজোড়। আমার কাছে যে বড় পরামর্শ চাইতে এসেছিস; ওরে ছোঁড়া, আগে পরামর্শ নেবার মতন একটু বুদ্ধি গজা!'

নাম সিঁটকে চলে এলুম। হ্যাঁ! জানে ত কেবল হি হি করে হাসতে আর কাল গায়ে লাল জামা চড়িয়ে সং সাজতে! সাধে কি মুনিঋষিরা ওদের বিষয় ঐ সব লিখে গেছেন!

ইস্কুলে গিয়ে দেখি ছেলেটা আজ ফার্স্ট বেঞ্চে গিয়ে বসেছে। একদিনেই দেখি মাস্টারদের বেশ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল! বোকার মতন মুখ করে থাকলে

সবাই অমন পারে। আর বুঝি আন্দাজে কতকগুলো সোজা সোজা প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়েছিল। পড়ত ওর ঘাড়ে আমাদের সব শক্ত শক্ত প্রশ্নগুলো তবে দেখা যেত।

যাই হোক, একদিনেই নাম করবার তার কিছু এমন তাড়াহুড়ো ছিল না।

নগা বললে—'ব্যাটা খোসামুদে!'

ছেলেটা শুনে বললে, 'ছিঃ হিংসে করতে নেই, পরে কষ্ট পাবে।'

রাগে নগা হাতের মুঠো খুব তাড়াতাড়ি খুলতে ও বন্ধ করতে লাগল। গেল বছর যদি ওর টাইফয়েড না হত নিশ্চয় সেদিন একটা কিছু হয়ে যেত।

এমনি করে কদ্দিন যেতে পারে! শেষটা একদিন গবুই এক বিষম ফন্দি বার করল। গবুটা দেখতে রোগা পটকা, আর প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে লাষ্ট হলে কি হবে ছেলেটার খুব বুদ্ধি আছে। সেদিন ক্লাশে এসেই সে নগাকে কানে কানে কি বলল! তাই না শুনে উৎসাহের চোটে নগা অঙ্কটঙ্ক ভুল করে কোণে দাঁড়িয়ে একাকার! তাতে বরং একদিক দিয়ে সুবিধাই হল, নগা কোণে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে মতলবটা দিব্যি পাকিয়ে নিল।

সেইদিনই টিফিনের সময় নটবরকে ডেকে নগা বলল—'ভাই নটবর, যা হবার তা হয়ে গেছে; একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে, হেডমাস্টারকে তাই একটু সাহায্য করা চাই। তুমি ক্লাশের ভাল ছেলে, তুমি বললে দেখাবেও ভাল; তা ছাড়া তোমার মত গুছিয়ে কেই বা বলতে পারে?'

নটবর খুশি হয়ে বলল—'তা ত বটেই! ক্লাশের অর্ধেক ছেলে তোৎলা, আর বাকিগুলো একেবারে গবচন্দ্র।'

নগা আশ্চর্য রকম ভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে তেমনি ঠাণ্ডা হয়ে বলল—'তা, তুমি গিয়ে তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে বলবে যে তাঁর বাবার শ্রাদ্ধে তুমি কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে সাহায্য করত চাও। এই একটু সম্মান দেখাবার জন্য আর কি? বুঝলে ত? ভাল করে বুঝিয়ে বোলো, এই কাল ওঁর বাবা মারা গেছেন কিনা।'

নটবর হাঁ করে শুনে বলল—'আহা তাই নাকি? তোমরা ভেব না, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। তোমরা একটু অপেক্ষা করে থাকলে ফল টের পাবে।'

বলে হেডমাস্টারের ঘরের দিকে চলে গেল। তার ঐ 'টের পাওয়ার' কথাটা আমার ভাল লাগল না। 'টের পাওয়া' বলতে আমরা অন্য মানে বুঝি। সে যাই হোক গে।

ক্লাশের ঘণ্টা পড়বামাত্র নটবর ছুটতে ছুটতে এসে বলল,—'হেডমাস্টার রাজি হয়েছেন। তোমাদের কজনকে এক্ষুনি ডেকেছেন কি সব কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য। তোমরা কি করে জানলে, তাও জিজ্ঞেস করছিলেন। মনে হল

খুব খুশি হয়েছেন। তোমরা এক্ষুনি যাও।'

আমরা প্রথম ত অবাক্। শ্রাদ্ধের কথাটা গবুর সম্পূর্ণ বানানো। কোথায় নটবর ইয়ার্কি দেবার জন্য মার খাবে, না সত্যি হেডমাস্টারের বাপের শ্রাদ্ধ! এ রকম কিন্তু আরও হয়। আমি একবার একটা অচেনা ছেলেকে মজা দেখবার জন্য বলেছিলাম—'কি হে, চাটগাঁ থেকে কবে এলে?'

সে বলল—'কাল এলাম; তুমি কি করে জানলে?' আমি অবিশ্যি আর কিছু ভেঙেগ বলি নি।

যাই হোক, আমরা ত গেলাম। দেখলাম হেডমাস্টার গোমড়া মুখ করে ফার্স্ট ক্লাশের ছেলেদের ইংরিজি খাতায় লাল পেন্সিলের দাগ কাটছেন। আমাদের দেখে খেঁকিয়ে বললেন—'কি, ব্যাপার কি তোমাদের? ক্লাশ নেই নাকি, এখানে যে বড় দঙগল বেঁধে এসেছ?'

নগা গলা পরিষ্কার করে বলল—'আজ্ঞে, আপনার বাবার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে এসেছি। এই আমরা—'

এইটুকু বলতেই হেডমাস্টারের এক ভীষণ পরিবর্তন হল। মুখটা লাল হয়ে বেগুনী হল, হাতের পেন্সিলের মোটা শিষ মট করে ভেঙেগ গেল, গোঁফ-চুল সব খাড়া হয়ে গেল, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তার চোটে সার্টের গলার বোতাম ফট করে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল। কি রকম একটা শব্দ করে আস্তে আস্তে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমরা এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিলাম, এবার হঠাৎ একটা বিকট সন্দেহ হল। নটবর আগাগোড়া মিছে কথা বলেছে। হেডমাস্টার ডাকেন নি। সে হয় ত দেখাই করে নি!

হেডমাস্টার গর্জন করে উঠলেন, জানলার খড়খড়ি কেঁপে উঠল। আমরা ছিটকে বাইরে এসে পড়লাম; তিনি ফেলে দিলেন কি আমরাই পালিয়ে গেলাম, আজও ঠিক জানি না। কাঁপতে কাঁপতে ক্লাশে ঢুকেই শুনলাম, পণ্ডিতমশাই নটবরকে বলছেন—'সে কি নটবর, হেডমাস্টারের ভাইপো তুমি, সে কথা এদ্দিন বল নি!'

নটবর বললে—'বাবা বলেন ও সম্পর্কটা কিছু ঢাক পেটাবার মত নয়। তা ছাড়া ইস্কুলটা বাজে। এইমাত্র কাকাকে সেই কথা বলে এলাম। তিনি ত রেগে কাঁই।'

এমন সময় দরোয়ান এসে বলল—'নগুবাবু আর ভোঁদাবাবুকে বেত খেতে হেডমাস্টারবাবু ডাকছেন।'

তাই শুনে পণ্ডিতমশাই বললেন—'আর হ্যাঁ, বেত খেয়ে এসে আধ ঘণ্টা বেঞ্চে দাঁড়াবে, লেট করে ক্লাশে এসেছ।'

তাই বলি পৃথিবীটাই অসার!

যুধিষ্ঠির

আশাপূর্ণা দেবী

—স্যার বোধহয় বাড়ি খুঁজছেন?

বাসে উঠতে যাচ্ছি, পিছন থেকে কে যেন কাকে বলে উঠলো কথাটা!

চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, আর কাউকে নয়, আমাকেই। আমারই মুখের পানে তাকিয়ে এক ভদ্রলোক সহাস্যকণ্ঠে তাঁর প্রশ্নমালা আউড়ে যাচ্ছেন—বাড়ি খুঁজছেন তো? ভাড়াটে বাড়ি? সম্পূর্ণ শেপারেট্ আর একটু সস্তার মধ্যে—কেমন?—খাস্ শহরের মধ্যে না হ'লেও ক্ষতি নেই, কি বলেন? কলকাতার একটু আশেপাশে—হাওড়া হোক, যাদবপুর হোক যে কোনো জায়গায়? শুধু একটু আলাদা, সম্পূর্ণ শেপারেট্, তাই না? বড়ো অশান্তি পাচ্ছেন ফ্লাট্ বাড়িতে—

আমি থতমত খেয়ে উত্তর দিতে ভুলে যাই।

ভদ্রলোককে জীবনে কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ছে না, অথচ দেখছি—আমার নাড়ি-নক্ষত্র সবই ওঁর জানা।

আমি যে বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি—একদম আলাদা অথচ সস্তাটস্তা গোছের একখানা বাড়ি, হাওড়া থেকে যাদবপুর, শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট যে কোনোখানে। শুধু একদম শেপারেট্! বাড়ির চিন্তাই যে এখন আমার ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছে, এতোকথা ওর জ্ঞানগোচরে এলো কি করে?

বোকা বনে চুপ করেই আছি। ভদ্রলোক একটু থেমে আবার বলতে থাকেন—ফ্ল্যাট্‌বাড়িতে পাঁচজনের সঙ্গে বাস করতে করতে জীবনে আপনার ধিক্কার এসে গেছে কেমন? আজ একেবারে বেরিয়েছিলেন 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,' এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে—তা শরীর পতনটাই হলো!—আবার এখন সেই ভেড়ার গোয়ালে ফিরতে হবে ভেবে ট্রামের তলায় পড়তে ইচ্ছে করছে নয় কি?—হয়তো—বাড়ি গিয়ে দেখবেন—ইতিমধ্যে কলের জল নিয়ে, বা কুচো-কাচা ছেলেপেলের ঝগড়াঝাঁটি নিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের গিন্নীর সঙ্গে আপনার বাড়ির মেয়েদের বেশ একচোট্ হয়ে গেছে!—দু'পক্ষের মুখ তোলো হাঁড়ি।—কি বলেন স্যার, ঠিক্ ঠিক্ মিলে যাচ্ছে কি না?

এতোক্ষণে আমার মুখে কথা ফোটে।

কোনো রকমে বলি—কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনতে পাচ্ছি না? কখন কোথাও দেখেছি বলেও তো—

—'মনে পড়ছে না'—এই তো? কোথা থেকে পড়বে? দেখলে তো পড়তো!

কিন্তু তাতে অবাক হবার কি আছে? হোল্ ওয়ার্লডের প্রত্যেকটি লোককে কি দেখে রেখেছেন আপনি? দু'শো তেরো কোটি লোককে? চেনেন সব্বাইকে? তবে?—ভদ্রলোক একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন—চিনতেন না, এখন চিনলেন, ক্রমে আরো কতো চিনবেন।

আমি ইতস্ততঃ করে বলি—কিন্তু আপনি কি হাত গুনতে জানেন?

ভদ্রলোক দরাজ গলায় হেসে ওঠেন—হাত আপনার দেখলাম কখন, যে হাত গোনার কথা উঠছে? মুখ দেখতে জানি স্যার, মুখ দেখতে জানি! এ দুনিয়ায় কে কার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছে? তেমন করে চাইতে জানলে, মনের কথা টের পাওয়া যায় বৈ কি। আপনার মুখের চেহারা দেখেই বুঝেছি বাড়ি খুঁজছেন—

একটু হেসে বলি—মুখের চেহারা খারাপ তো কতো কারণেই হয় লোকের, আমার যে মণিব্যাগ হারায়নি, তাই বা জানলেন কি করে?

আর একবার পথের লোককে চমকে দিয়ে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক। ঘাড়টাকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দু'দিকে দোলাতে দোলাতে বলেন—মণিব্যাগ হারালে কি আর ঊর্ধপানে নজর থাকতো আপনার? গাড়িচাপা পড়বার ভয় ভুলে আকাশমুখী হয়ে পথ হাঁটতেন?—মণিব্যাগ হারালে আপনার দৃষ্টি থাকতো—আনাচে কানাচে ফুটপাথের ধারে! খুঁজতেন—গ্যাসপোস্টের গোড়া, ডাস্টবীনের কোল। হাত গুনতে হয় না স্যার, সামান্য বুদ্ধি খরচা করতে হয়।—রাস্তার দু'ধারে 'দোহাত্তা' ইয়া বড়ো বড়ো বাড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে আপনার হাড় জ্বালা করছিলো না কি, একটাতেও 'টু লেট্' ঝুলছে না দেখে?

টু লেট্।

আমি হেসেই উত্তর দিই—ও ভাষাটা এখনো বেঁচে আছে না কি পৃথিবীতে? 'টু লেট্' না দেখে হাড় জ্বালা নয়, ভেবে অবাক হচ্ছিলাম—এতো লোকও আছে পৃথিবীতে? যেখানে যতো ঘরবাড়ি আছে, প্রত্যেকখানা ভরে যাবার মতো লোক!

—বিলক্ষণ! বলেন কি মশাই? ভরে যায়, ছেড়ে ধরে না যে! ঘরবাড়িতে আর ক'টা লোক থাকতে পায়? ফুটপাথে পড়ে থাকে না? পরের বাড়ির রোয়াকে? গাড়িবারান্দার নিচে? স্টেশন প্লাটফর্মে?—না দেখে থাকেন তো দেখবেন একদিন রাত্তিরের কলকাতাকে!—আপনি তো তবু মাথা গুঁজে আছেন।

—ওই আনন্দেই এখনো পাগল না হয়ে বেঁচে আছি—বলে আমি সামনের বাস্‌টাকে হাত তুলে থামাই।

কথায় কথায় দু'খানা বাস ছেড়েগেছে।

ভদ্রলোকও আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েন। কেমন একটু কৌশলে এক-জন আরোহী ভদ্রলোককে ঠেলেঠুলে নিজে গুছিয়ে বসে আমাকে ইশারায় আর এক জায়গায় ইঞ্চি কয়েক জমি দেখিয়ে দেন।—ইশারার অর্থ 'ছুঁচ্ হয়ে ঢুকে ফাল্ হয়ে বোসো।'

বসি না অবশ্য, দাঁড়িয়েই থাকি।

সেই একগাড়ি লোকের সামনেই আবার শুরু হয়—বাড়ি পাওয়া শক্ত, তবে একেবারে হতাশ হবারও কিছু নেই, বাড়ির সন্ধান আমি আপনাকে দিতে পারি, ভালো বাড়ি। ঠিক যেমনটি চান, 'বামুনের গরু, খায় কম, দুধ দেয় বেশি।

মনটা আশান্বিত হয়ে ওঠে। তবে কি লোকটা বাড়ির দালাল?

সপ্রশ্ন ভাবে তাকাই।

—বাড়ি আছে। আমারই নিজের পিসেমশাইয়ের বাড়ি, তবে ওই—একটু দেহাতে।—ওই যাকে আপনারা শহরতলী বলেন।

আমি উৎফুল্ল হয়ে বলি—তাতে কি? অসুবিধে হবে না। কিন্তু এখন দেখা যায় না? কতো দূরে?

—তা' দূরে একটু আছে বৈ কি। আজ না হোক কাল দেখবেন? বহুত বেলা হয়ে গেছে আজ। চলুন আমিই বরং আপনার বাড়িটা দেখে যাই, কাল এসে নিয়ে যাবো।

—তাই ভালো।

আমার সঙ্গে সরাসরি আমার বাড়িতে ঢুকে পড়েন, আমার ঘরবাড়ি সব কিছু দেখেশুনে আমার ভাড়ার সংখ্যা শুনে চোখ কপালে তুলে যথেচ্ছ নিন্দে করেন, আর মার সঙ্গে 'মাসীমা' পাতিয়ে যান।

পরদিন এসে বাড়ি দেখাতে নিয়ে গেলেন।

নাঃ সত্যিই ভদ্রলোক পরোপকারী বটে। জানা নেই শোনা নেই এমন ভাবে আমার মুখের দিকে চাওয়া।

আপনার লোকেও করে না।

আর যা বলেছিলেন, বাড়িটা 'বামুনের গরুই' বটে। হোক—যাদবপুর ছাড়িয়ে আরো একটু ভেতরে, তবু—স্বপ্নে কোনো দিন ভেবেছি, মাত্র আটাশ টাকায় জলজ্যান্ত আস্ত একখানা বাড়ি পাবো? চার চারখানা শোবার ঘর, দালান, উঠোন, আলাদা রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, কি নয়?

দেড়খানা ঘরে আছি, শোবার ঘরেই রান্না, বাহান্ন টাকা ভাড়া দিই!

—কেমন? বলেছি কিনা? ভদ্রলোক একটু বিজয় গর্বে হাসেন। দেখছেন তো একেবারে সোজা দক্ষিণ খোলা—

আমি কৃতজ্ঞ হয়ে বলি—সত্যি আমার কী উপকার যে করলেন! আজকাল-কার দিনে ভাবাই যায় না এ রকম। দেখুন—আপনি আমায় জানেন না চেনেন না—

—বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! চেনার জন্যে কি আর সময় লাগে দাদা? চোখ থাকলে এক নজরেই চেনা যায়।

মাকে 'মাসীমা' বলে পর্যন্ত আমাকে আর 'স্যার' না বলে 'দাদাই' বলছেন।

বাড়ি দেখে এসে এ বাড়ির বাড়িওয়ালাকে নোটিশ দিলাম!

ভগবান যে এমন দিন দেবেন তা আর আশা ছিলো না।

চাকরিতে রিজাইন আর বাড়িওয়ালাকে নোটিশ নিজে থেকে দিতে পারার মতো সুখ জগতে আর ক'টা আছে?

ক'দিন পরে একটা শুভদিন ঠিক করে যাত্রার কথা।

যাদবপুর ছাড়িয়ে নতুন বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করা আর সম্ভব হয় না, ওই ভদ্রলোকের হাতেই ছ'মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে দিই।

সত্যি কথা বলতে কি, পাপের মন আমাদের, দিয়ে পর্যন্ত বেশ একটু অস্বস্তি পাচ্ছিলাম। অমন হিতকারী লোকটা, আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে, মুখের ওপর বলতে পারি না 'রসিদ দিন।' অথচ টাকা জিনিস, তাও নেহাত দু'চার টাকা নয়!

আজ বাড়ি ঢুকতেই মা একখানা 'রেভিনিউ' স্ট্যাম্পমারা রসিদ হাতে তুলে দিয়ে বললে—যুধিষ্ঠির দিয়ে গেলো।

—যুধিষ্ঠির, যুধিষ্ঠির আবার কে?

—ওমা সে কিরে? যে তোর এতোটা উপকার করলো তার নামটুকুও জানিস না? ওই ভালো মানুষের ছেলেটি! রসিদটা দিয়ে হেসে হেসে বললো—আপনার ছেলেটি কিন্তু নেহাত কাঁচা, ধরুন যদি আমি টাকাগুলো নিয়ে সটকে পড়তাম? আমি ঠগ কি জোচ্চোর জানা আছে কিছু? কলকাতার শহরে জোচ্চোরের অভাব আছে?—ভারি আমুদে ছেলে।

মনে মনে লজ্জা পাই।

নিজের কাঁচামির জন্যে নয়, কিছু আগের সন্দেহের জন্যে।

সত্যি আজকালের দিনে এমন লোক প্রায় দুর্লভ!

শুধু দুর্লভ কেন, এমন চরিত্র বোধ করি দেবদুর্লভ। বাড়ি উঠে যাবার দিন প্রমাণ পেলাম তার।

বাড়িওঠার ঝঞ্ঝাট যে কি, সেটা যে উঠেছে, সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। তবু বুদ্ধিমানেরা আন্দাজ করতে পারেন। সেই বিরাট ঝঞ্ঝেটে ব্যাপারটার একটু আঁচড় মাত্র আমার গায়ে লাগলো না। সব করলেন যুধিষ্ঠির-দা।

(দাদাই বলছি রসিদ পাওয়ার পর থেকে।)

লেপের চালি খোলা থেকে ভাঁড়ারের শিশি, বোতল সামলানো পর্যন্ত—সব উনি। আর সে কী বিরাট মাল! দুখানা ঠেলাগাড়িতে ধরতে চায় না. ঠেলে ওঠে। দেড়খানা ঘরে এতো জিনিস ছিলো কোথায়, ছিলো কি করে ভেবেই পাচ্ছি না।

মা কেবল বলতে থাকেন—গতজন্মে তুমি নিশ্চয় আমার নিজের বোনপো ছিলে বাবা, কী ছেলে—

যুধিষ্ঠির-দা বিছানার বাণ্ডিলে দড়ি কসতে কসতে কপালের ঘাম মুছে বললেন—থাক থাক মাসীমা, সুখ্যাতিটা বাজে খরচ করে ফেলবেন না। শেষে হয়তো—এই যুধিষ্ঠিরের মুণ্ডুপাত না করে জল খাবেন না। আমার ঠাকুমা বলতেন—'গুণের কথা আজ বোলোনা গুণ জানবে কাল। কেউ হাসবে, কেউ কাঁদবে, কেউ পাড়বে গাল।' প্রবীণ লোকদের কথা পাকা কথা!

ঠেলা গাড়িতে মাল বোঝাই হয়েছে, আর ট্যাক্সিতে মানুষ।

মা বলেন—যুধিষ্ঠির তোমার যে বড়ো কষ্ট হবে বাবা, এই প্রচণ্ড রোদ্দুরে মালপত্তরের সঙ্গে ঠেলা গাড়ি চেপে অতোখানি রাস্তা যাওয়া—আমরা তো দিব্যি হাওয়া গাড়ি চেপে এক দণ্ডে চলে যাবো। বড়ো লজ্জা করছে—

যুধিষ্ঠির-দা হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠেন—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, লজ্জা কিসের মাসীমা? ওতো বোকার লক্ষণ। এই তো দেখুন না আমার শরীরে লজ্জা আছে? মালপত্তরের সঙ্গে যেতে তো হবে কাউকে? আমি গেলে আমার কষ্ট, ভায়া গেলে ভায়ার কষ্ট। তবে? সত্যি বলতে—ভায়ার যতোটা হবে, আমার ততোটা নয়, আমার এ কষ্ট গায়েই লাগে না! অভ্যাস আছে কি না। তবে যদি—অবিশ্বাস করে সাবধান হন আলাদা কথা।—ধরুন আমি যদি মালপত্তর নিয়ে যথাস্থানে না পেঁছিই? ভেগে পড়ি!

মা বলেন—কি যে বলো বাবা।

গিন্নী, আমি আর ছেলেমেয়েরা হাসতে থাকি।

হাসবেন না ভায়া, হাসবেন না। বলে—যতো হাসি ততো কান্না, বলে গেছে রাম শর্মা—কলকাতার শহরে কতো রকমের জোচ্চোর আছে জানেন? বলে. যুধিষ্ঠির-দা লাফিয়ে ওঠেন ঠেলার ওপর।

হাওয়া গাড়িতে চেপে আমরা তো হাওয়ার মতো গিয়ে পেঁছিলাম। গিয়ে

বোকা বনে বসে থাকি বাড়ির রকে, বাড়ির চাবি নেওয়া হয় নি যুধিষ্ঠির-দার কাছ থেকে।

তখনো বুঝিনি ঠেলা গাড়িতে চেপেও 'হাওয়া' হওয়া যায়।

বুঝলাম বসে থাকতে থাকতে সন্ধ্যার পর।

সন্ধ্যার পর আবার পুরনো বাড়িতে ফিরে এসে দেখি ইতিমধ্যেই আমাদের সেই দেড়খানা ঘর ধোয়া মোছা হয়ে নতুন ভাড়াটে এসে গেছে।

আমাদের মালপত্রের বালাই নেই, শুধু কুড়িখানা হাত পা নিয়ে খোলা দাওয়ায় বসে আছি পাঁচজনে, মা, আমি, ছেলেমেয়ে, গিন্নী। ভগবানের অশেষ দয়া আর আমাদের অশেষ ভাগ্যি যে গয়নার বাক্সটা রক্ষে পেয়েছে। ওটা বরাবর গিন্নীর হাতে হাতে ছিলো!

প্রবীণ লোকদের কথা পাকা কথা!

যুধিষ্ঠির প্রবীণ না হলেও পাকা কথার মানুষ, তার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে ফলে যায়। বসে থাকতে থাকতে মা হঠাৎ এক সময় গতজন্মের বোনপোকে গাল পাড়তে সুরু করেন, মুণ্ডুপাতের যতো রকম 'ছন্দবন্ধ' আছে সমস্ত প্রয়োগ করে করে।

গিন্নী নীরবে আঁচলে চোখ মুছছিলেন, সান্ত্বনা দিয়ে বলি—যাকগে গয়নার বাক্সটা যে রক্ষে পেয়েছে এই ঢের।

গিন্নী হঠাৎ লোকলজ্জা ভুলে ডুকরে কেঁদে উঠে নিবেদন করেন—বাক্স রক্ষে পেলে আর কি ছাই হবে, গয়নাগুলো যে সব তেঁতুলের হাঁড়িতে!

—তেঁতুলের হাঁড়িতে! তেঁতুলের হাঁড়িতে গয়না!

এর চাইতে আর—বেশি—কি বলবো?

গিন্নী ফের কাঁদেন—হ্যাঁগো যুধিষ্ঠির বটঠাকুর বলেছিলেন—'কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভারদের বিশ্বাস নেই, সোনারুপো ট্যাক্সিতে না নেওয়াই ভালো হাঁড়ি কলসীতে রাখা সবচেয়ে নিরাপদ, কেউ সন্দেহ করবে না।'—সর্বস্ব পুরে দিয়েছি তেঁতুলের হাঁড়িতে।

—তবে খালি বাক্সটা বয়ে বেড়াচ্ছো কেন?

চীৎকার করে উঠি আমি।

—খালি নয়, খালি নয়—পাঁচবছরের মেয়ে খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে—ওতে আমার কাঁচের পুতুলগুলো ভরে নিয়েছি।—কেমন ঠকালে?

কপালে দুই হাত তুলে যুধিষ্ঠির-দাদার উদ্দেশে প্রণাম করি। সার্থকনামা নমস্যব্যক্তি, এতে কি কোনো সন্দেহ আছে?

দার্শনিকের পাল্লায়

বিমল দত্ত

তোমরা কি কখনো কোন দার্শনিকের পাল্লায় পড়েছ? আমি কিন্তু একবার পড়েছিলাম। রেলে যাচ্ছিলাম ডায়মণ্ড-হারবার। থার্ড ক্লাসের কামরায় ছিলাম আমরা দুজন—দার্শনিক বজ্রবাঁধন ও আমি।

ট্রেন যেই কলকাতা ছাড়লো অমনি দার্শনিক বজ্রবাঁধনের মুখের ফস্‌কা গেরো খুলে গেল। আমার দিকে ঘনিষ্ঠ ভাবে ঘেঁষে এসে পরম অমায়িক ভাবে জ্বালাতন শুরু করলে। বললে, জানো কি, যদি এই রেল আর মোটেই না থামতো তো কি হতো?

আমি ভয় পেয়ে আঁতকে উঠে বললাম, সে কি? থামবে না কি রকম? ডায়মণ্ড-হারবারের টিকেট কেটেছি যে!

বজ্রবাঁধন বললে, ঐ তো দোষ তোমাদের—Cerebral anaemia—মস্তিষ্কে রক্তশূন্যতা—এতটুকু চিন্তা করো না! আমার ছোট ভাই চন্দ্রকাঁদনেরও ঐ দোষ! এই রেল যদি না থামতো তো এ অনন্ত কাল চলতে থাকতো—কার সাধ্য একে থামায়?

খানিক ভেবে বজ্রবাঁধন বললে, যখন এই সব বিষয় চিন্তা করি তখন মাথা আমার লাট্টুর মত বন্‌-বন্‌ করে ঘুরতে থাকে।—বজ্রবাঁধন চুপ করে বসে ভাবতে লাগলো।

রেল একঘেয়ে শব্দ করে ছুটতে লাগলো—ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ খ্যাটাখ্যাট্‌—ক্যাচা-ক্যাচ্‌ খ্যাটাখ্যাট্‌—

বজ্রবাঁধন আবার শুরু করলে, তা ছাড়া মৃত্যু বলে কিছু যদি না থাকতো তবে হাজার হাজার বছর আমরা বেঁচে থাকতুম—সোজা কথা?—বজ্রবাঁধন চিন্তিত ভাবে দূরে মাঠের দিকে চেয়ে কি ভাবতে লাগলো।

আমি এক বিঘৎ পরিমাণ হাঁ করে বললাম, তাও কি স-ম্‌-ভ-ব?

বজ্রবাঁধন বললে, তা নয়তো কি? রাত যদি না থাকতো তো সারা রাতই দিন থাকতো—ঘুম যদি না থাকতো—রাত দিন মানুষকে জেগে বসে থাকতে হতো। অনিদ্রা বলে কোন রোগই থাকতো না। তোমরা ভেবে দেখ না—নয়তো এ সব কি ভয়ানক ভয়ানক দার্শনিক তত্ত্ব।

ট্রেন বালিগঞ্জে এসে দাঁড়ালো। একজন ভিখিরী এসে বজ্রবাঁধনের কাছে পয়সা চাইলে—বাবু, বড় খিদে পেয়েছে—একটা পয়সা।

বজ্রবাঁধন বললে, কি বললে? খিদে পেয়েছে? আচ্ছা খিদে কেন পায় জানো?

ভিখিরী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। বজ্রবাঁধন আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচিয়ে বললে, দেখলেন তো। সব Cerebral anaemia—মস্তিষ্কে রক্ত-শূন্যতা—দারিদ্র্যের চেয়ে ওটাই হচ্ছে আরো বেশী মারাত্মক ব্যাধি।

ভিখিরীটা বললে, সত্যি বাবু, খিদে পেয়েছে।

বজ্রবাঁধন ঘাড় নাড়তে নাড়তে দার্শনিক বুলি আওড়াতে লাগলো—পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু না-ও পেতে পারে? যদি খিদে সত্যিই পেয়ে থাকে তা হলে কিছু খাওয়া একান্তই প্রয়োজন—আর যদি না পেয়ে থাকে? একবার ভেবে দেখেছো কি যে খাদ্য তাহলে তোমার কাছে বিষ—অসুখ অনিবার্য। ডাক্তারি রিপোর্ট পড়োনা তাই, নয়তো দেখতে পেতে যতো লোক খাদ্যাভাবে মরে তার চেয়ে অনেক বেশী লোক খাদ্যাধিক্যে মরে। কথাগুলো ভেবে দেখো—বুঝলে?

ভিখিরীটা আবার বললে, বাবুমশাই, আমার পাঁচটি ছেলেমেয়ে—

—সম্ভব পাঁচটিও হতে পারে—পঞ্চাশটিও হতে পারে। আমি কি করে জানবো? লোকে বলে এখান থেকে সূর্য ৯৫,০০০,০০০ মাইল। আমি কিন্তু বলিনা—আমি তো মেপে দেখিনি—হয়তো দু'ফিট কম হতে পারে বা পাঁচ মাইল বেশি। তা ছাড়া—

গার্ড হুইস্‌ল্‌ দিলে। ট্রেন সশব্দে স্টেশন পার হয়ে গেল। ভিখিরী হতাশ ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে।

খানিক ভেবে বজ্রবাঁধন আবার শুরু করলে, ভেবে দেখেছো কি যে চোখ না থাকলে দেখা যায় না—জিভ্‌ না থাকলে কথা কওয়া যায় না—চাঁদ না উঠলে চাঁদের আলো হয়না—তেতো জিনিস মিষ্টি লাগে না—ঝাল জিনিস টক লাগেনা কেন? আমার মামা গন্ধমাদন একজন মস্তবড় দার্শনিক। সে আমায় একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে আজো তার উত্তর মিললো না।

আমি বললাম, প্রশ্নটা শুনতে পাই কি?

বজ্রবাঁধন বললে, শুনতে দোষ নেই, ভারি জটিল। সেটা এই—কোকিল ডাকে কু-হু-হু, কাক ডাকে কা-কা-কা, চড়াই চিটির পিটির, কেন বলতে পারো?

ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করলাম যে বাস্তবিক প্রশ্নটা আমার বুদ্ধির নাগালের বাইরে।

আবার স্টেশন এলো। এবার একজন মোটা ভদ্রলোক আমাদের কামরায় উঠে পড়লেন। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। সেই আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে ৯২৮০০৪৫৩টা মশা বিনা টিকেটে আমাদের কামরায় উঠে পড়লো। দিব্যি করে বলতে পারি যে তারা একটা হাফ টিকেও কাটেনি এমনি জোচ্চোর। তার ওপর আবার নির্লজ্জের মত কানের কাছে ব্যাঞ্জো বাজাতে লাগলো। লজ্জাও

করে না। মোটা ভদ্রলোকটি পুঁটুলিতে মাথা রেখে ভোঁস্-ভোঁস্ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে রইলাম আমি, বজ্রবাঁধন আর সেই ৯২৮০০৪৫৩টা রক্ত-শোষক মশার ফৌজ।

বজ্রবাঁধন বসে বসে খানিক সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ভাবনা ভেবে আবার পোঁ ধরলে, আচ্ছা বলতে পারো বৃষ্টি পড়তে শুরু করে একেবারে নাগাড়ে বেয়াল্লিশ বছর ধরে বৃষ্টি হয়না কেন?

আমি এবার মরিয়া হয়ে বললাম, কারণ, তার আগেই বৃষ্টি থেমে যায়।

বজ্রবাঁধন চটে-মটে বললে, দর্শন জিনিসটা অত সহজ নয়? বুঝতে হয়—ভাবতে হয়—আমাদেরই ব্রেন্ড্ মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরে যায়! আর তোমরা বেশ আছো চিন্তার বালাই নেই—পরম নিশ্চিন্ত—ঐ দেখো একজন পড়ে পড়ে ঘুম মারছে।

মোটা ভদ্রলোকটি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, কি? আমার চিন্তার বালাই নেই? পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছি? জানো, আমার পুঁটুলির মধ্যে কি আছে?

আমি কৌতুহলী হয়ে বললাম, কি?

ভদ্রলোক গড়-গড় করে বলে গেলেন—চিন্তাতরঙ্গিনী—ভাবনা-তত্ত্ব-বারিধি-দর্শনের সুদর্শন চক্র—

বজ্রবাঁধন ভড়কে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, মশায়ের পেশা?

ভদ্রলোক বললেন, আমার পেশা হচ্ছে—আপাততঃ দার্শনিক পেষা অর্থাৎ পেষণ করা।

বজ্রবাঁধন আঁতকে উঠে বললে, আঁঃ!

ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম দীননাথ তর্কচঞ্চু।

বজ্রবাঁধন বললে, ও আপনিই সেই বিখ্যাত তর্কপঞ্চু?

তর্কপঞ্চু বললেন, আপনি তো একটা আকাট মুখ্যু দেখছি—তর্কপঞ্চু আবার কথা হয়? তর্কচঞ্চু—তর্কচঞ্চু!

বজ্রবাঁধন বললে, কি? তর্কপঞ্চু কথা হয় না? তর্কপঞ্চু তর্কপঞ্চানন অর্থাৎ পাঁচ মুখে যে তর্ক করে।

তর্কচঞ্চুও দমবার পাত্র নয়। বললে, আর তর্কচঞ্চু মানে—তর্করূপ চঞ্চু অর্থাৎ ঠোঁট দিয়ে যে অন্য সব দার্শনিকদের ঠুক্রে ব্যতিব্যস্ত করে।

আমার ওপর বিচারের ভার পড়লো। বললাম, দেখুন, একটা চঞ্চু বটে কিন্তু তাতেই পঞ্চাননের কাজ করে—সুতরাং দু'জনেরই জিত—অর্থাৎ সমান-সমান।

তর্কচঞ্চু বললেন, আচ্ছা এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও—

দিন নেই রাত নেই
দিনে রাতে কাজ নেই
রাতে দিন দিনে রাত
দার্শনিক কুপোকাত। —এর মানে কি?

বজ্রবাঁধনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। এ কি বিদ্ঘুটে গোলমেলে প্রশ্ন রে বাবা! সে বিড়বিড় করে আওড়াতে লাগলো। কখনো আবেগ কম্পিত সুরে—কখনো উত্তেজনাময় তীব্র সুরে—কখনো ভাবনায় গাঢ়-গম্ভীর সুরে সে এই ভয়ঙ্কর মারাত্মক শ্লোক আউড়ে তার মানে করতে লাগলো।

দিন নেই, রাত নেই—কিচ্ছু নেই। যাক্ আপদ গেলো। আচ্ছা, তাহলে আবার দিনে-রাতে কাজ থাকবে না কি করে? দিনই যদি না থাকলো, রাতই যদি না থাকলো—তো আর তাতে কাজ থাকবেই বা কি করে?

ঠিক! এ পর্যন্ত বেশ বোঝা যাচ্ছে। হুঁ—এতো স্পষ্ট। জলবৎ তরল। কিন্তু তার পরই বিষ্ণু গোঁজ! রাতে দিন, দিনে রাত—সে আবার কি? রাতে দিন, দিনে রাত—অর্থাৎ রাত আর দিন উল্টে গেছে। কিন্তু যা নেই তা আবার ওল্টাবে কি করে? ঐ তো খট্‌কা, বিষম খটকা! ঐখানেই গোল-মাল—দার্শনিক যে কোনো হদিস্ পায় না—য়্যাঁ! তবে কি সত্যিসত্যিই কুপোকাত নাকি? উঁহু—ভাবতে হবে—বিচার করতে হবে। অত সহজে হাল ছাড়লে চলবে না।

গাড়ি একটা স্টেশনে এসে থামলো। কুলি হাঁক দিলে—চ্যাংড়ি পো-তা-া-াঃ—

বজ্রবাঁধন তন্ময় হয়ে শ্লোক আওড়াচ্ছিলো—

দিন নেই রাত নেই
দিনে রাতে—আঃ চ্যাংড়ি পোতা?

আমি যে যাদবপুর যাবো!—বলেই লাফিয়ে উঠে চলন্ত ট্রেন থেকে স্টেশনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্ধকারে দৌড়ুল। গাড়ি ফুল স্পীডে চলতে লাগলো।

তর্কচঞ্চু বেঞ্চির ওপর উবু হয়ে বসে পুঁটুলিটা খুলে ফেললেন। দেখলাম তাতে চিন্তা-তরঙ্গিণী, সুদর্শন-চক্র—কিচ্ছু নেই—এক ঠোঙা টাটকা জিভে গজা! তর্কচঞ্চু জিভেগজায় কামড় দিয়ে বললেন, দেখলে তো দার্শনিকের ওষুধ—বিষস্য বিষমৌষধম্—হ্যাঁ হ্যাঁ একেবারে বিষম ওষধ দিয়ে দিয়েছি—রাতে আর ফেরবার গাড়ি নেই। হণ্টনে ফিরতে হবে যাদবপুর। তার ওপর এই বিদ্ঘুটে শ্লোক— দিন নেই রাত নেই

দিনে রাতে কাজ নেই
রাতে দিন দিনে রাত—
হুঁহুঁ, দার্শনিক কুপোকাত। হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ—

গোপীচাঁদের কবিতা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বাৎসরিক পরীক্ষার সময়। সকলেরই মতো গোপীচাঁদও বেশ লেখাপড়া করছিল। হঠাৎ একদিন মা সরস্বতীর কি কৃপা হল জানি না, পদ্যপাঠ পড়তে পড়তে গোপীচাঁদের মাথায় পদ্য-লেখার খেয়াল চাগিয়ে উঠল। তার কাকার 'সুধাসিন্ধু' নামে এক কবিতার বই ছিল। তারই থেকে প্রথম লাইনটা চুরি করে, তারপর নিজের দুটো একটা কথা কোন রকমে জোড়াতাড়া দিয়ে একটা কবিতা খাড়া করলে।

বড় উৎসাহ করে সে কবিতাটা লিখেছিল। কিন্তু সেই কবিতাই হল তার কাল। বেচারা কবিতা লিখলে কিন্তু কবিতা শোনবার মানুষ খুঁজে পায় না। কোন্ সকাল থেকে সে কবিতাটা পকেটে নিয়ে ঘুরছে কিন্তু কাউকেই জুৎসই করে সেটা শুনিয়ে উঠতে পারছে না। গোড়ায় ভেবেছিল হেডমাস্টার মশাইকে শুনিয়ে আসবে। সাহসে ভর করে কোন রকমে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। কম্পিত-হস্তে পকেট থেকে কাগজটা বার করতেই হেড-মাস্টার মশাই বলে উঠলেন—'কি ও, ছুটির য়্যাপ্লিকেশন? ও সব হবে টবে না, সরে পড়।' আর দ্বিরুক্তি না করে গোপীচাঁদ লম্বা দিলে। তার মনে হল—আঃ, ভগবান আমায় বাঁচিয়ে দিলেন! কিন্তু সে আশা ছাড়লে না। সে ভাবলে পণ্ডিত মশাই সুরসিক লোক, তাঁর কাছে একবার চেষ্টা করা যাক। এই ভেবে সে পণ্ডিত মশায়ের কাছে গেল।

পণ্ডিত মশাই যে কত বড় সুরসিক তা বুঝতে গোপীচাঁদের দেরি হল না। কবিতা শোনাবার প্রস্তাব শুনেই পণ্ডিত মশাই দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন—'যন্ন ভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা!'

অর্থাৎ যা হবার নয় তা কখনোই হতে পারে না। তোমার নাম হল গোপী-চাঁদ; তুমি এসেছ কাব্য শোনাতে?

গোপীচাঁদকে সেখান থেকেও সরে পড়তে হল।

ক্লাসঘরের এক কোণে বসে নরোত্তম ভালমানুষের মতো ব্যাকরণের আড়াল দিয়ে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছিল। গোপীচাঁদ শেষটা তাকেই পাকড়াও করলে। গোপীচাঁদ উৎসাহ করে পড়ে যেতে লাগল—

'বন্ধ হল হট্টগোল নেমে আসে অন্ধকার রাশি।
কন্ধকাটা বংশ যত উদ্গারিছে ভীম অট্টহাসি—'

ঐটুকু পড়া হতেই নরোত্তম বলে উঠল—'আরে দূর দূর, ঐ আবার কবিতা!

থাম্‌ থাম্‌!' বলে ডিটেকটিভ উপন্যাসে মন দিলে। গোপীচাঁদ বললে—'আগে সবটা শোনো, তবে তো ভাল লাগবে।' বলে সে আবার কবিতা আওড়াতে গেল। কিন্তু নরোত্তম চেঁচিয়ে মেচিয়ে—'আমার একজামিনের পড়ার গোলমাল করছে। হেডমাস্টার মশায়কে বলে দেব।' বলে, ইস্কুল-বাড়ি মাথায় করে তুললে।

এমনি ভাবে গোপীচাঁদ যেখানেই যায় সকলেই দেয় খেদিয়ে। শেষটা সে ঠিক করলে কবিতাটাকে ছাপিয়ে ফেলবে—দেখি তাহলে লোকে কেমন না পড়ে!

ইস্কুলের ছুটির পর গোপীচাঁদ খুঁজে খুঁজে এক ছাপাখানায় গিয়ে উপস্থিত। ছাপাখানার ম্যানেজারবাবু খালি গায়ে একটা টুলের উপর বসে বেগুনভাজা না কি খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন—'কি চাই?'

—'আজ্ঞে এই কবিতাটা ছাপাতে এসেছি।'

—'বিয়ের পদ্য?'

—'না, এমনি—'

—'তবে কি কোন অভিভাষণ?'

—'না না. এমনি একটা, এই দেখুন না—' বলে গোপীচাঁদ কাগজটা এগিয়ে দিলে।

ম্যানেজারবাবু মনোযোগ দিয়ে কবিতাটা পড়ে বললেন—'বেশ দিয়ে যান।'

গোপীচাঁদ বললে—'ছাপা যাবে তো?'

—'তা যাবে. তবে কয়েক জায়গা কিছু কিছু বদল করতে হবে। কবিতাটা সুন্দর হয়েছে কি না! একটুকুর জন্যে কেন খারাপ হতে যাবে, বুঝলেন?'

গোপীচাঁদ খুশী হয়ে বলে উঠল—'তা কি রকম বদলটা করবেন দেখেই যাই না।'

—'এই দেখুন—এই পাঁচ লাইনের মধ্যে আপনি কতগুলো ন্‌-এ-ধ্‌-এ আর ট্‌-এ-ট্‌-এ ব্যবহার করেছেন—বন্ধ. অন্ধকার, হট্টগোল. অট্টহাসি, কন্ধকাটা, পিট্টান. বিন্ধিয়াছে. ধুন্ধুমার, রন্ধ্র, গন্ধ আসে রন্ধনের! আমাদের স্টকে একটির বেশী 'ন্ধ' নেই 'ট্ট' গোটা দুই আছে।'

—'তাহলে কি করা যায়?'

—'কিছু ভাবনা নেই, আমি সব ঠিক করে দেব, বন্ধকে করে দেব বাঁধা. অন্ধকারকে আঁধার, হট্টকে হাট, অট্টকে আঁট, কন্ধকে কাঁধ. পিট্টানকে দৌড়. রন্ধ্রকে ছেঁদা—এমনি সবগুলোই ঠিক হয়ে যাবে, কেবল ঐ ধুন্ধুমার আর গাঁট্টাটাকে বাগানো যাবে না—ও দুটো ঐ রকমই থাকবে!'

—'কিন্তু তাহলে কবিতাটা দাঁড়াবে কি রকম মশাই?

বাঁধা হল হাটগোল, নেমে আসে আঁধার রাশি
তারপর—কাঁধকাটা বংশ যত উদ্গারিছে ভীম আঁটহাসি——এর কি কোন মানে হয় মশাই ?'

—'বেশ তো মানে যদি করতে চান, ঐ 'হট্টগোল' আর উদ্গারিছে ও কথা-দুটো বড় কটমটে, ও জায়গায় করে দিই—

বাঁধা হল ছাতা-ছড়ি নেমে আসে আঁধারের রাশি।
কাঁধ'পরে বাঁশ ফেলে উঠাও হে মোট-ঘাট
বেজে গেল গাড়ি-ছাড়া বাঁশী !

বেশ মানেও হল, সুন্দরও হল !'

—'আর এইখানটা ?—

রন্ধ্র দিয়ে সুমধুর গন্ধ আসে রন্ধনের যেন ?'

—'ওটা হবে—ছেঁদা দিয়ে সুমধুর সেণ্ট আসে রান্নার যেন ! আর যদি মানে করতে চান—

রাঁধা-বাড়া ফেলে দিয়ে গাড়িটায় চড়ে পড় ত্বরা—

এই করুন। যদিও এতে ড-এ শূন্য ড়-এর একটু আধিক্য হল, কিন্তু আমাদের স্টকে ড়-এর অভাব মোটেই ঘটবে না।'

গোপীচাঁদ বললে—'তার চেয়ে বলুন না আপনি একটা নতুন কবিতা লিখে আমার নামে ছাপিয়ে দেবেন।'

—'বেশ তো আমার কবিতা যদি আপনার পছন্দ না হয় আমাদের স্টকে বেশ ভাল ভাল ফরমাইসি বিয়ের কবিতা, বিদায়-গাথা, স্তোক-পদ্য, বিজ্ঞাপনের ছড়া নানা জিনিস আছে। আপনি যে কোনটা পছন্দ করে নিতে পারেন।'

গোপীচাঁদের এ অপমান আর সহ্য হল না। সে ছাপাখানা ছেড়ে বেরিয়ে এল। বাইরের চৌকাঠে পা দিয়েছে এমন সময় এক ভীষণ হুঙ্কার দিয়ে 'তবে রে ইস্টুপিড্' বলে কে তার ঘাড়ে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল। গোপীচাঁদ চেয়ে দেখে হেডমাস্টার মশাই !

আমতা-আমতা করে গোপীচাঁদ বললে—'আজ্ঞে, আমি তো কিছু দোষ করিনি !'

—'দোষ করিসনি তো কি ? ব্যাটা, কোশ্চেন আউট করবার মতলব ? তাই বলি আজ সকাল থেকে আমার ঘরের কাছে ঘুর ঘুর করে কেন ? যেন কিছুই জানেন না—ছুটির য়্যাপ্লিকেশান নিয়ে এসেছেন। সব ফিচলেমো বুদ্ধি ! কোত্থেকে এ ছাপাখানার খোঁজ পেলিরে ইস্টুপিড ? কে তোকে বলেছে এই-খানে আমাদের কোশ্চেন ছাপা হবে ?'

—'আজ্ঞে, আমি আমার এই কবিতাটা ছাপাতে এসেছিলুম. আর তো কিছুই জানি না!'

—'কই দেখি'—বলে হেডমাস্টার মশাই কাগজটা ছিনিয়ে নিলেন। প্রথম লাইনটা পড়েই তাঁর চোখ কপালে উঠল! কি সর্বনেশে ছেলে রে বাবা—'বন্ধ হল হট্টগোল নেমে আসে অন্ধকার রাশি' এ তো একেবারে এবারের ইংরিজির কোশ্চেনে অনুবাদের জন্যে পড়েছে! তারপর এই সমস্ত কথা—কন্ধকাটা, অট্টহাসি, গাঁট্টা, রন্ধ্র, ধুন্ধুমার এ সমস্তই তো এবারের কোশ্চেনে আছে! হেডমাস্টার মশাই অত করে 'সুধাসিন্ধু' থেকে খুঁজে খুঁজে কথাগুলো বার করলেন—আর এ ব্যাটার কাছে সমস্ত ফাঁস! হেডমাস্টার মশাই জ্বলে উঠে বললেন—'তোকে আমি জেলে দেব।'

গোপীচাঁদ ভয়ে সেখান থেকে দৌড় দিলে!

সেদিন রাত্রে গোপীচাঁদের বাবা এসে গম্ভীর মুখে বললেন—'এই দেখ্ তোদের হেডমাস্টার মশাই লিখে পাঠিয়েছেন—'গোপীচাঁদ কোশ্চেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। শাস্তি-স্বরূপ তাকে এবার প্রোমোশন দেওয়া হবে না।'

ম্যাজিক

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রসা রোডে হঠাৎ দেখা। বছর পাঁচেক আগে যখন আমাদের বাড়ি আসতেন, তখন ওঁর চেহারা ছিল আরো জমকালো—চুলগুলো ছিল আরো ঘন এবং আরো মিশমিশে কালো। ইতিমধ্যে চেহারায় যেন অল্প একটু বয়সের ছাপ পড়েছে। আমাকে দেখেই সোল্লাসে বলে উঠলেন, আরে অমল যে! আছিস্ কেমন?

আস্তে আস্তে প্রণাম করে বললাম, এমনি ত ভালই আছি কাকাবাবু, কিন্তু সংসার প্রায় অচল হয়ে পড়েছে—একটা কাজ-কর্ম না হলে আর চলছে না!

সহানুভূতি দেখিয়ে তিনি বললেন, তুই ত বি-এ পাশ করেছিলি, না? তা এতদিন কিছু না করে বসে আছিস্?

বললাম, মেজোকাকার সঙ্গে তাঁর কারবারে বসছিলাম—হঠাৎ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হল, কারবার বন্ধ হয়ে গেল!

ঘাড় নেড়ে বললেন, সে ত জানি সবই। বাস থেকে পড়ে গিয়েছিল, কোথায় যেন—

আসানসোলে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ! আমি ঠিক সেই সময়ই রওনা হয়ে গেলাম কিনা ইউ-কে'তে, তাই আর খবর নিতে পারিনি। তারপর সারা ইউরোপ-আমেরিকা চষে এই ত দিন তিনেক হল ফিরেছি!

এখন আপনি কোথায় আছেন কাকাবাবু?

আর কোথায় থাকবো বল? গ্র্যান্ড হোটেলেই আছি। ক'দিন পরেই চলে যাবো আম্বালায়—বুঝতেই পারছিস, দেশ স্বাধীন হয়েছে, অথচ স্বাধীন দেশের ভার নিতে পারে এমন মানুষ বেশী গড়ে ওঠেনি। তাই আমরা যে ক'জন আছি, গবর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া তাদের ধরেই হরদম টানাটানি করছেন!

কেমন সঙ্কোচ বোধ হতে লাগলো। তবু সাহস করে বললাম, কপালের জোরেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কাকাবাবু—আমাকে একটা চাকরি করে দিতেই হবে আপনাকে!

সস্নেহে পিঠে থাবা মেরে বললেন, স ত দেওয়া কর্তব্যই আমার। তোর কাকা ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু কি জানিস? ছোটোখাটো কাজ-কর্ম কোথায় কখন খালি হয় সে খবর ত আমার কাছে পৌঁছয় না—খবর আনতে

পারিস যদি, তাহলে অবশ্যই করে দিতে পারি। কারণ চেনা-শোনা বা খাতির ত একটু আছে সব মহলেই।

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে খবরের কাগজের কাটিং এক টুকরো বের করে তুলে দিলাম তাঁর হাতে। বললাম, এই ইউনিভার্সেল এক্সচেঞ্জ কোম্পানি—এখানে আপার ডিভিসন ক্লার্ক নেবে একজন।

কাগজটার ওপর বার দুই চোখ বুলিয়ে বললেন, পিতু, মানে পীতাম্বর চৌধুরীর অফিস—তাই বল!'

চেনা আছে না কি?

চেনা মানে? অফিস গড়েই দিয়েছি ত ওর আমি। বাল্যবন্ধু, একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে খেলা—তোর কাকারই মতন আর কি!

আমি কৃতার্থ হয়ে বললাম, তাহলে একটু বলে দিন কাকাবাবু—মাইনে ভালো, শুনেছি ওখানে কাজ করেও নাকি সুখ আছে!

তিনি আর একবার পিঠে হাত বুলালেন। বললেন, এখন ত যাচ্ছি গবর্নরের ওখানে—জানিনা কেন ডেকেছেন তিনি। কাল যাবো তোর জন্যে—তা একটা দরখাস্ত—

টাইপ করা দরখাস্ত একটা পকেটেই ছিল—বের করে দিলাম। তিনি সেটা নিয়েই ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকলেন, গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, নিশ্চিন্তে থাকিস—কাজ তোর করে দিয়ে তবে আমি আম্বালায় যাবো। পিতু আমার বিশেষ ভক্ত—সে তোকে না নিয়ে পারবে না।

ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল। আমি কিন্তু সেই দিকেই বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

হঠাৎ দেখা ডাঃ মল্লিকের সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে চাকরির হিল্লে! ভাগ্যের যোগাযোগ একেই বলে! মেজো কাকা বলতেন, ডাঃ মল্লিক হলেন যাদুকর—তাঁর কাছে অসম্ভব কিছু নেই! নিশ্চয় তাঁর যাদুদণ্ড আমার বরাতে সাফল্যের ফসল নিয়ে আসবে।

একে একে তিন মাস পার হয়ে গেল—চাকরি ত নয়ই, কোন সারাশব্দও এলো না ইউনিভার্সেল এক্সচেঞ্জ থেকে। ব্যাপার কি? গবর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসরকারী এডভাইসার ডাঃ সঞ্জীবন মল্লিক এম-এ, ডি-লিট, এফ-সি-এস স্বয়ং দরখাস্ত নিয়ে গেছেন—তার ওপর পিতু, মানে পীতাম্বর চৌধুরী তাঁর ছোটবেলার বন্ধু, অফিসই গড়ে দিয়েছেন তাঁর স্বয়ং ডাঃ মল্লিক!

ঠিক করলাম গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়ে একটু খোঁজ নোব—এখন কোথায় আছেন

কাকাবাবু, আম্বালায়, না দিল্লীতে, না আর কোথাও? তারপর চিঠি দোব। অত বড় কাজের লোক, তাঁর কি আর সামান্য ঘটনা মনে থাকে? কিংবা সাহস করে একদিন ইউনিভার্সেল এক্সচেঞ্জেই যাবো?

সকাল বেলা বসে বসে ভাবছি, এমন সময় দোরে একখানা দামী মোটর দাঁড়ালো এবং তার ভেতর থেকে বেরিয়ে, বিলিতি পোশাক-পড়া এক ভদ্রলোক এসে উঠলেন আমাদেরই বাড়ির রোয়াকে। তারপর কড়া নেড়ে আস্তে আস্তে ডাকলেন, অমলেন্দুবাবু আছেন?

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দোর খুলে দিলাম।

আমাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, অমলেন্দুবাবু আছেন?

আমি সবিনয়ে জানালাম, আমারি নাম অমলেন্দু।

তিনি বললেন, আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ময়দানে কারুর একটা পেন কুড়িয়ে পেয়েছেন বলে? আমারও একটা পেন হারিয়েছে ঐ ময়দানেই, তাই খোঁজ করতে এসেছি আমারটাই কি না!

ভদ্রলোককে ঘরে এনে বসালাম।

তিনি বললেন, হলদে রঙের পুরানো মডেল পার্কার ডুওফোল্ড—ক্লিপটা একটু ঢিলে, হোল্ডারের গায়ে খোদাই করা একটা 'এম' লেখা আছে! মনু আমার ডাক-নাম।

আর বলতে হল না, বুঝলাম কলমটা এঁরই। সুটকেশ থেকে বের করে তাঁর হাতে দিয়ে দিলাম।

কলমটা পেয়েই তিনি কপালে ঠেকালেন, তারপর কৃতজ্ঞতায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন অমলেন্দুবাবু আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম। এ কলম আমাকে দিয়েছিলেন আমার মা—যেদিন আমি বিলেত যাই। ফিরে এসে আর দেখা হয়নি মার সঙ্গে—এই কলমটা কাছে থাকলে তাই আমার মনে হয়—যেন মা'র আশীর্বাদ সঙ্গে সঙ্গে চলেছে আমার! এটা হারিয়ে ক'দিন কি দুঃখেই যে ছিলাম।

এই মাতৃভক্ত প্রবীণ ভদ্রলোকের কথায় অভিভূত হয়ে গেলাম আমি। কারণ হতভাগ্য বেকার হলেও, মায়ের ওপরে অসীম টান যে আমারও।

ভদ্রলোক বললেন, আপনার মতো উদার-হৃদয় ব্যক্তিকে কিছু বলতেও লজ্জা করছে—তবু যদি কোন উপকার করতে পাই আপনার, তাহলে—

বললাম, আপনার হারানো কলম আপনাকে পেঁৗছে দিতে পেরেই আমি সুখী—এর ভেতর উদারতার কিছু নেই। তবে বেকার গ্র্যাজুয়েট অন্নকষ্টে আছি—খেটে খাবার মতো একটা কাজ যদি দয়া করে করে দেন আমাকে—

নিশ্চয়, নিশ্চয়, আজই বিকাল চারটায় আসুন আমার অফিসে—পি. চৌধুরী, ডিরেক্টর—ইউনিভার্সেল এক্সচেঞ্জ, ১২ নম্বর পার্ক স্ট্রীট, দো-তলায়।

চমকে উঠলাম। পি. চৌধুরী, ইউনিভার্সেল এক্সচেঞ্জ? এইবার দ্বিতীয়বার ভাগ্যের যোগাযোগ—এবার আর বরাত না খুলে যায় না!

সত্যি সত্যি চাকরি হল। আপার ডিভিসন ক্লার্ক—মাইনে ও ভাতায় প্রাপ্যের পরিমাণ মন্দ নয়।

মিঃ চৌধুরী বললেন, প্রায় তিনমাস ধরে পোস্টটা খালি রয়েছে—ঠিক পছন্দ মতো লোক মেলেনি; বুঝতে পারছি, আপনার জন্যেই ছিল!

সশ্রদ্ধ বিনয়ে বললাম, আজ্ঞে, এই পোস্টের জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম আগেই বিজ্ঞাপন দেখে!

তাই নাকি?

আজ্ঞে, আপনার বাল্যবন্ধু ডাঃ মল্লিক—

ডাঃ মল্লিক?

হ্যাঁ, সঞ্জীবন মল্লিক, এম-এ, ডি-লিট, এফ-সি-এস—

কপাল কুঁচকে বললেন, মিঃ চৌধুরী, ঠিক ত মনে করতে পারছি না! নিশ্চয় আছেন কোন বন্ধু—এখন স্মরণ হচ্ছে না। যাই হোক, বলুন—

বললাম, আমার দরখাস্ত তিনি নিজে জমা করে দিয়ে গেছেন—বলেছিলেন, কাজ আমার হবেই, তাঁর কথা আপনি না রেখে পারবেন না। আপনার অফিস তিনিই অর্গানাইজ করে দিয়েছিলেন—

তবে কি বীরু? জানি না তার আসল নাম সঞ্জীবন কি না! বন্ধু-বান্ধবদের পোশাকী নাম আবার সব সময় জানা থাকে নাা। আচ্ছা দাঁড়ান, খোঁজ নিচ্ছি!

চাকরিপ্রার্থীদের দরখাস্তের ফাইল চেয়ে পাঠালেন তিনি!

একের পর এক আবেদনপত্র উল্টে যাচ্ছেন তিনি—টেবিলের বিপরীত দিক থেকে আমি শুধু তাকিয়ে দেখছি।

হঠাৎ একখানা হাতে লেখা দরখাস্তের ওপর থেমে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, কি বললেন, সঞ্জীবন মল্লিক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি ত আর কারুকে রেকমেণ্ড করেননি, নিজেই প্রার্থী হয়েছেন এই পদের জন্যে। লিখেছেন, তিনি আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট হলেও ভালো ইংরেজী জানেন, টাইপও শিখে নিতে পারবেন! একখানা সার্টিফিকেটও এই সঙ্গে দিয়েছেন আমার বন্ধু গৌরহরি মিত্র এডভোকেটের।

এডভোকেট মিত্র আমার ছোটকাকার বন্ধু—ছোটকাকা হচ্ছেন সাহিত্যিক জ্ঞানানন্দ রায়!

তাই নাকি? তবে ত তুমি আমার ঘরের ছেলে হে। জ্ঞান, গৌর আর আমি—আমরা হলাম বিদ্যাসাগর কলেজের তিন মূর্তি, সবাই বলতো থ্রি মাস্কেটিয়ার্স!

সদ্য চাকরি লাভের আনন্দে ডগমগ হয়ে নেমে এলাম। দরজার কাছেই বিস্ময়করভাবে দাঁড়িয়ে আছেন—আর কেউ নয়—স্বয়ং ডাক্তার মল্লিক।

প্রণাম করে বললাম, চাকরিটা হল কাকাবাবু—প্রায় দুশো পঁয়ত্রিশ মতো পাওনা।

হবেই ত, হবেই ত, পিতু আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু—আমার কথা কি সে ফেলতে পারে?—আচ্ছা চলি রে!—বলতে বলতেই লিফ্টে ঢুকে পড়লেন তিনি। তারপরেই হুস্ করে ওপরে ওঠে গেলেন। কর্মব্যস্ত লোক।

অথ সিংহ ঘটিত

ভবানী মুখোপাধ্যায়

আমার এই গল্পটা বন্ধুজনেরা বিশ্বাস করতে চায় না। সকলে মনে করে এটা একেবারে একটা আষাঢ়ে গল্প। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি আমার এই সিংহঘটিত কাহিনীটি একেবারে নির্ভেজাল এবং খাঁটি।

ঘটনাটি ঘটেছিল সৌরাস্ট্রে। রাজকোট থেকে প্রায় সাতষট্টি-আটষট্টি মাইল দূরে কন্‌কারা স্টেশনের কাছাকাছি থাকি, সেখান থেকে নজরবাগ গিছ্‌লাম। বন্ধু অরবিন্দ দেশাই সাহেবের বাড়ি সাপ্তাহান্তিক ছুটি যাপনে।

দেশাইএর বাড়ি পেঁাছতে অনেক বেলা হয়ে গেল, প্রায় দুপুর দুটো। চাকর কান্থাইয়ালাল এসে দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'মাইজী এখন শুয়ে আছেন।'

আমি বললাম, 'থাক, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি ওখানেই বসছি। ঘুম ভাঙলে খবর দিয়ো।' এই বলে ড্রয়িং রুমের কৌচে দেহটা মেলে দিলাম।

সত্যি, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিনা বলতে পারি না, তবে ক্লান্তিতে চোখটা বন্ধ করেছিলাম। যখন চোখ খুললাম—দেখি সামনেই সেই 'সিংহ',—স্বয়ং পশুরাজ। বিভিন্ন সময়ে চিড়িয়াখানা বা সার্কাসে যে সব ভদ্র ধরনের সিংহ সাধারণতঃ দেখা যায়, এটি যে সেই জাতীয় নয় তা আমি এক নজরেই বুঝেছিলাম—প্রায় চার ফুট উঁচু আর চওড়াও সেই রকম। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে, বেশ গদাই লস্করী চালে প্রায় আমার কৌচটার কাছে এসেই যেন বিশ্রাম করবে ঠিক করলো। পিছনটা আমার দিকে রইল। আমি হকচকিয়ে নড়ে বসলাম, কিন্তু এতদ্বারা আমার অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হল না। বরং সিংহের লেজটা আমার ডান হাতের উপর এসে পড়ল।

নির্বিকার চিত্তে সেইভাবে পুচ্ছটি উচ্চে তুলে সিংহ মহাশয় নিঃশব্দে বসে রইলেন। পরিস্থিতি অধিকতর গুরুতর দাঁড়ালো, আচমকা নড়া-চড়া করার ফলে আমার ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হলো, এবং সিংহের লেজের ওপর বেশ চাপ পড়ল।

এইভাবে প্রায় আধ মিনিটকাল কাটলো—তারপর সিংহ তার পুচ্ছটি আমার হাতের চাপ থেকে মুক্ত করে একটু নড়ে বসল, এইবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সিংহটা কুকুরের মত লেজটা একটু বিব্রত ভঙ্গীতে নাড়তে লাগল। আমি দৌড়ে পালাতে পারতাম; কিন্তু যেদিকেই যাই ঐ ভয়ংকর পশুটার দেহের যে কোনো একটা অংশ না মাড়িয়ে পালাবার পথ নেই। আমার চোখের

প্রায় দুইঞ্চি সামনেই বসে আছে এক বিরাট সিংহ। উভয়েই যেন 'দুজনে মুখোমুখি ,গভীর দুখে দুখী' আর আমার 'নয়নে জল ঝরে অনিবার'।

দীর্ঘকাল ধরে নানা গ্রন্থে সিংহসম্পর্কে কতকথাই না পড়েছি, একে একে সব কথা স্মরণে জাগে। কি একটা গ্রন্থে পড়েছি সিংহের নখরাঘাতে একটা সামান্য ক্ষত হলেই একেবারে ব্লাড্ পয়েজনিং হবে, ফলে দূষিতরক্তজনিত কালব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শমন সদনে যেতে হবে। আর একবার পড়েছিলাম—সিংহ তার শিকারের পিঠটা ভেঙে নিজের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে গহ্বরে গিয়ে ধীরে সুস্থে তার জলপান সমাধা করেছিল,—তখনও নাকি লোকটা সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিল। তারপর পড়েছিলাম—সোজা একদৃষ্টিতে যদি সিংহের চোখে চোখ রাখতে পারো, তাহ'লে সেই চোখোচোখির ফলে সিংহ আর আক্রমণ করতে সাহস করেনা। বোধহয় চক্ষুলজ্জা হয়।

মুস্কিল হল এই যে, এই সব কাহিনী কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে পড়েছি না গোপালভাঁড়ের কাহিনীর ভেতর আছে তা স্মরণ করতে পারলাম না। যাইহোক, এইভাবে নীরবে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিই বা করার আছে! আমার এই কৌশল এমনই সাফল্য লাভ করলো--যে সিংহটা ফুটখানেক সরে বসল।

এইভাবেই বসে রইলাম, এইসময় যদি আমি হঠাৎ না হেঁচে উঠতাম তাহ'লে কি যে হ'ত বলতে পারি না। একদৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থাকলেই আমার ভারি হাঁচি পায়। ডাক্তাররা অবশ্য বলেন এরকমটা হয় না। কিন্তু তাঁরা যা খুসী বলুন—আমি যদি রোদে দাঁড়িয়ে বা চোখটা ভালো করে মেলে তাকাই তাহ'লেই হেঁচে উঠি। ভীষণ ভাবে হাঁচি। এবং হাঁচলেই বাঁচি। এখনও তাই হ'ল, সোজা সিংহের মুখের ওপর আমার বোম্বাই হাঁচি বর্ষিত হ'ল।

আশা করেছিলাম সিংহটা এইবার লাফিয়ে উঠে সোজা আমাকে আক্রমণ করবে। কিন্তু জন্তুটা যা করল অতঃপর, তা আরো খারাপ। সোজা উঠে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যভরে হাই তুলে তার থাবা দুটো আমার হাঁটুর উপর রাখলো। মনে পড়লো কোথায় যেন পড়েছি সিংহ মৃতদেহ আক্রমণ করে না—তার 'পশুরাজ' উপাধিটার এটিও অন্যতম কারণ। ফলে আমি মৃতদেহের মত চুপ করে পড়ে রইলাম, ধীরে ধীরে মূর্ছা ও পতন।

এই গুরুতর সংকটময় মুহূর্তে এই একমাত্র কর্ম যা আমি করতে পারতাম—আমার মনে হয় সিংহটাকে বোকা বানাবার জন্য আমার 'মড়ার' ভূমিকার অভিনয়টা নিখুঁত হয়েছিল। চোখ খুলতে সাহস হয়নি। কিন্তু বেশ বুঝলাম, সিংহটা তার থাবা উঠিয়ে নিল, নাক দিয়ে আমার মুখের উপর সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কানটা শুঁকলো—তারপর অতি শান্তভঙ্গীতে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিঞ্চিৎ আত্মস্থ হয়েই আমি দরজার কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে চীৎকার করে উঠলাম, 'সিংহ! সিংহ!'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মিসেস দেশাই ছুটে এলেন। আমার তখন গলা ভেঙে গেছে, মুখ থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে না—'সিংহ' কথাটাই উচ্চারণ করতে পারছি না।

এই ব্যাপারে যে হাস্যকর কিছু আছে—তা অন্ততঃ আমার মনে হয়নি, কিন্তু শ্রীমতী লীলাবতী দেশাই, অর্থাৎ আমার বন্ধুপত্নী হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ছেন। বোধকরি আমার মুখে বিরক্তির ছাপ ছিল, কারণ মিসেস দেশাই মার্জনা ভিক্ষার ভঙ্গীতে বললেন, 'মাফ করবেন, কিন্তু কোনো ভয় নেই, আমাদের কান্থাইয়ার উচিত ছিল আপনাকে আগেই সতর্ক করা।'

তারপর দরজাটা খুলে মিহি সুরে ডাকলেন, 'টমি! টমি!'

টমি অতি ধীর পদক্ষেপে ঘরে এল।

বেশ ছোটোখাটো শান্ত শিষ্ট জন্তু। কিন্তু আমি জোর গলায় বলতে পারি এখন ছোট হয়ে গেলেও এটা সেই সিংহটাই, শুধু তার সংক্ষেপিত সংস্করণ।

জ্যান্ত ঠাকুর

মৌমাছি

'হাড় কিপ্পন! হাড় কিপ্পন! নাম করলে হাঁড়ি ফাটে।'

'আরে হাঁড়ি ফাটে কি বলছিস? খেন্তি পিসি বলে,—কোলের কাছে বাড়া ভাত—নামটি করা, আর সঙ্গে সঙ্গে থালাটি একেবারে লোপাট!'

'বেটার আবার ভণ্ডামি দেখেছিস! গলায় তুলসীর মালা, নাকে তেলক, গায়ে ছ্যাট্‌কা ম্যাট্‌কা ছাপ। সকালবেলা গঙ্গা নাওয়া! সন্ধ্যাবেলা তুলসী তলায় সে কি পেন্নামের ঘটা?'

'আরে! পল্টুটা সেদিন আবার কি বলছিলো জানিস? সে নাকি দেখেছে তুলসী তলায় পেন্নাম করে কর্তা রোজ রাত্রিতে ঐ অন্ধকার বটগাছ তলায় ঐ পোড়ো মন্দিরে যায়। গিয়ে অন্নপূর্ণার কাছে হাঁউমাঁউ করে কাঁদে আর অং বং মন্তর বলে—সে ভারি মজার মন্তর—

"অন্নপূর্ণা ধনং দেহি
কাঁড়িং কাঁড়িং টাকাং দেহি
দিস্তেং দিস্তেং নোটং দেহি।"

হোঃ হোঃ হোঃ-একটা হাসির রোল উঠলো। আড্ডা সরগরম! ন্যাপলা, কোচে, বুবু, টবু ইত্যাদি সব ধনুর্ধরই হাজির! রাগটা ঐ '—' কর্তার ওপর, আরে তাকে নিয়েই তো যতো আলোচনা—

ছোকরা বাবুরা সব একেবারে চটে লাল। কিপ্‌টে বুড়োটা নাকি ওদের সেদিন দাঁত খিঁচিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে—অপরাধ ওরা লাইব্রেরীর বই কেনবার জন্যে চাঁদা চাইতে গেছলো। ওদের সবাইকার মাথায় কেবল ফন্দি ঘুরছে, কেমন করে বেটা কিপ্‌টেকে জব্দ করা যায়। তারই ফন্দি-ফিকির চলছে।

হঠাৎ গোপলাটার মুখে, '—' কর্তার ঐ রাত্তির বেলা পোড়ো মন্দিরটাতে যাওয়ার কথা শুনে, সবাই যেন বেশ একটু হালকা হয়ে গেল। তাই অতো হাসি; হাঃ-হাঃ-হাঃ- হোঃ-হোঃ-হোঃ।

মতলব পাকা, প্ল্যান সব ঠিকঠাক—লাগে তুক্ না লাগে তাক্!

'—' কর্তার পরিচয় নন্দীগাঁয়ে কে আর না জানে? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আপনার বলতে তার কেউ নেই। থাকবার মধ্যে একটা ইঁটের পাঁজর-বার-করা একতলা ভাঙা বাড়ি; কিন্তু লোকে বলে ঐ ভাঙা বাড়িতেই মাটির তলায় নাকি পোঁতা আছে তার মস্ত বড়ো লোহার সিন্দুক। তাতে টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি। বাসন-কোসন ভর্তি! বন্ধকী কারবার করে। সুদ নেয় গলা টিপে। পাড়ায় গুজব,

তার টাকার কাঁড়িতে ছ্যাৎলা পড়ে গেছে; কিন্তু হলে কি হয়, '—' কর্তার টাকার নেশা একটুও কমেনি, নইলে কি আর রোজ রাতদুপুরে অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়ে ধন্না দেয়।

'—' কর্তা সেদিনও সন্ধ্যের পর অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়ে, বসে বসে মন্তর আওড়ায়। ঢিপ্ ঢিপ্ করে গুণে গুণে পেন্নাম করে একশো আটবার।

জপ করতে করতে হঠাৎ শুনতে পেলো, মেয়েলি গলায় মন্দিরের ভেতর কে * যেন কথা বলছেন! গাটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে—কর্তার!

'—' কর্তা কান পেতে শুনলেন। মনে হলো স্বয়ং মা'ই যেন কথা বলছেন! তবে কি দেবী জেগেছেন? ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে ধূপের গন্ধ আসে! কর্তা আরও ঘাবড়ে গেলেন।

'মা! মা!' বলে '—' কর্তা চোখ বুজে কাঠ হয়ে বসলেন। ঠাকুর জ্যান্ত হয়েছেন! কর্তা ভয়ে ভক্তিতে একেবারে আড়ষ্ট কাঠ। মন্দিরের ভেতর থেকে ভারি গলায় আওয়াজ এল—

'শোন গৌরী! তুমি বড় নিদয়া, যে গরীব বামুন রোজ তোমার পুজো করে, তাকে কেন অত কষ্ট দাও? ধনরত্ন তাকে কেন দিচ্ছো না!'

মেয়েলি ঢঙে জবাব আসে—'প্রভু! ওকে ধনরত্ন নিশ্চয়ই দোব, তবে সময় হয়নি কিনা, তাই এতোদিন দিই নি। কালকে যখন ও পুজো করতে আসবে, ওকে আমি মেলাই টাকা-কড়ি দোব, ওর বরাত দোব ফিরিয়ে।'

'—' কর্তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—মা অন্নপূর্ণা পুরুত বামুনটাকে কাল অনেক টাকা দেবেন! আহা! আমি যদি পেতুম ঐ টাকাগুলো। ভাবে, পুরুত ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে, কোনও রকমে বাগানো যায় না টাকাগুলো! বাস্তু ঘুঘুর মাথায় বুদ্ধিও এসে জোটে—সঙ্গে সঙ্গে ফন্দি ফিকির তখনই তৈরি।

'—' কর্তা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলো। এক শ' টাকার নোট ট্যাঁকে গুঁজে নিঝুম রাত্তিরে হনহন ক'রে পুরুত ঠাকুরের বাড়ির দিকে রওনা হলো। রাতদুপুরে হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি! শুনে পুরুত ঠাকুর বিছানা ছেড়ে ধড়-মড়িয়ে উঠল। দুয়ার খুলে দেখে—'—' কর্তা—ব্যাপার কি!

পুরুত ঠাকুরের হাতদুটো ধরে '—' কর্তা তাঁর মুঠোর মধ্যে এক শ' টাকার নোটখানা গুঁজে দিলেন। বললেন—'ভেতরে চলো ঠাকুর, তোমার সঙ্গে গোটাকতক জরুরি কথা।'

পুরুত ঠাকুরতো অবাক! একি '—' কর্তা আমায় এক শ' টাকা দেবেন! ভাবে স্বপ্ন দেখছি নাকি? তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনের পল্‌তেটা বাড়িয়ে দেয়, দেখে—না এ যে সত্যি!

'—' কর্তার হাতে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিতে যায়, বলে—'আজ্ঞে এ টাকা

নিয়ে আমি কি করবো? আমিতো ধার চাই না, শোধ করতে পারবো না।'

'—' কর্তা বলেন—'ঠাকুর, ও টাকা তোমায় আর শোধ করতে হবে না। ওর বদলে শুধু তামা তুলসী ছুঁয়ে শপথ করো যে, কালকে সারাদিনে তোমার যা পাওনা থোওনা হবে—তার সব আমার!'

পুরুত ঠাকুরতো অবাক! একি রে বাবা! কালকে কি আর এমন হাতি-ঘোড়া, সোনা-মোহর পাবো? বড়ো জোর গোটা পাঁচেক পয়সা, কলাটা, মুলোটা, আর আলোচাল বাতাসা! তারই জন্যে '—' কর্তার মতো কিপ্পন লোক রাত দুপুরে ছুটে এসেছে! একেবারে এক শ' টাকা দিতে চাচ্ছে! ব্যাপার কি? নিশ্চয়ই ওঁর মাথা খারাপ হয়েছে!

পুরুত ঠাকুর ভালোমানুষ, কিছুতেই টাকা নেবে না। '—' কর্তাও কিছুতেই ছাড়বেন না, একেবারে নাছোড়-বান্দা।

পুরুত ঠাকুর শেষকালে সাতপাঁচ ভেবে, তামাতুলসী ছুঁয়ে শপথ করলে 'কালকে সারাদিনে যা পাবো তা—ওরফে '—' কর্তার পাওনা।'

'—' কর্তার মুখে আর হাসি ধরে না। যাবার সময় পুরুত ঠাকুরকে বলে যান, 'ভোর চারটেয় আমি আসবো, তুমি তৈরি হয়ে থেকো ঠাকুর।'

'—' কর্তা চলে যায়, পুরুত ঠাকুরের চোখে আর ঘুম আসে না, ভেবেই আকুল।

দেখতে দেখতে রাত কাবার। কাক কোকিল সবে ডেকেছে। পুরুত ঠাকুর চান সেরে নিতে না নিতেই '—' কর্তা এসে হাজির হলেন।

'—' কর্তা পুরুত ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে বসলেন।

বেলা বাড়ে, দু'চার জন তাদের মানৎ মানসিকের পুজো দিয়ে যায়। '—' কর্তা মন্দিরের রোয়াকে বসে বসে সব দেখেন, আর ভাবেন—মা কখন আসবেন? মা' কথা কি মিথ্যে হবে? দাও মা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, আমাকে না দাও পুরুত ঠাকুরকেই দাও। পুরুত ঠাকুর উঠতে গেলেই—কর্তা বাধা দেন বলেন, 'ব্যস্ত কি ঠাকুর! ফল মূল খেয়ে আজ না হয় একটু বেশিক্ষণই পুজো করলে! দক্ষিণাটাতো কম দিইনি।'

বেলা বারটা বাজে, ওদিকে কর্তা যে খেতে যাবার নামটি করেন না। পুরুত ঠাকুর দেখে মহাবিপদ! এসব দেখে শুনে পুরুত ঠাকুর তাই ধরেই নিলে যে সারাটা দিন উপোস যাবে।

যাক্ রক্ষে! '—' কর্তা পুরুতকে ডেকে বলেন, 'ঠাকুর! মা'র পেসাদ থেকে দু'চারখানা বাতাসা আমাকে দাও, আর দু'চারখানা নিয়ে তুমিও একটু জল খাও।' এমনি করে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে পাঁচটা ছটা বেজে যায়, আমাবস্যে রাতের সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। ঝিঁ-ঝি পোকারা ডাক শুরু করলে।

আশপাশের ঝোপঝাড়ে উশখুশ্ শব্দ। আরও খানিক রাত বাড়লো। পুরুত-ঠাকুরের ব'সে ব'সেই এক ঘুম হয়ে যায়। ঠাকুরের আরতিও সারতে হলো কর্তার তাগিদে।

হঠাৎ চারধারের ঝোপঝাড় থেকে বিকট হাসির রোল। হাঃ—হাঃ—হাঃ হোঃ—হোঃ।

নাকি সুরে কে একজন বলে—

"আমরা হলুম ভৃঙ্গী নন্দী
ওসব যাদু মোদের ফন্দি।"

চোখ খুলতেই কর্তা সামনে চেয়ে দেখে—দূরের ঝোপে টর্চের আলো—একেবারে শিব আর দুর্গার আবির্ভাব। 'মা! মা!' বলেই কর্তা মূর্চ্ছা।

কর্তা অমন করে মূর্ছা যেতেই পুরুত ঠাকুরও ভয় পেয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। এসেই দেখেন শিবদুর্গার মূর্তি দৌড়াচ্ছে। ছেলেদের চেনা গলায় চাপা হাসির শব্দ! পুরুত ঠাকুরের বুঝতে দেরি হলোনা ব্যাপারটা। উনিও সেই ফাঁকে সরে পড়লেন।

পরদিন সকালে ন্যাপলা, কোচে, বুবু ওরা সবাই ভারি ব্যস্ত। আম বাগানে চড়ুই-ভাতির যোগাড়। সবাই যখন জুটলো—মণ্টু তখন সেই শিবের পার্ট ভারি গলায় বলে—'শোন গৌরী, তুমি ভারি নিদয়া!'

মিনমিনে পেঁচো মিহি গলায় জবাব দেয়, 'প্রভু ওকে ধনরত্ন দোব!'

ন্যাপলা ধমকে দেয়—'থাম, থাম! খুব হয়েছে, বেশি ওস্তাদি করতে হবে না।'

মণ্টু বলে—'ওঃ দাড়ি গোঁফ পারিনি বলে বুঝি? আমি আর পেঁচো না হলে বাবুদের বিদ্যে যে কতো, তা বোঝো যেতো।'

গোপ্লা অমনি বলে ওঠে—'যে যাই বলো বাপু, বাহাদুরিটা আমারই ষোল আনা। কর্তার মন্দিরে যাওয়ার খবরটি না দিলে, কি করতে শুনি?'

ন্যাপ্লা বলে—'খুব হয়েছে বাহাদুরি! বলি নন্দ পুরুতের কাছ থেকে চাঁদাটা আদায় করার কি হলো?'

বুবু অমনি ঝট্ করে পকেট থেকে এক শ' টাকার নোটখানা বার ক'রে ন্যাপ্লার নাকের সামনে ধ'রে বলে—'এই দেখ নন্দঠাকুর বলেছে—কর্তার দেওয়া ঐ এক শ' টাকার সে এক পয়সাও নেবে না—ওই দিয়ে লাইব্রেরীর ছোটদের বিভাগের বই কেনা হবে।'

এমন সময় হেবো হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দেয়—'ওরে '—' কর্তা একেবারে ক্ষেপে গেছে। চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে এদিকে আসছে—'

চড়ুই-ভাতি চড়ক গাছে উঠে যায়! হাঁড়ি-কুড়ি, মুড়ি-বেগুনি সব ফেলে সকলে একেবারে সোজা দৌড়।

কিম্ভূতের গল্প

বিমল মিত্র

মাংস তখন সেদ্ধ হচ্ছে। বেশ চন্‌চনে খিদে। চারদিকে আমরা গোল হয়ে কাঞ্চনদা'র গল্প শুনছি। আরম্ভ হয়েছিল মহাভারতের গল্প নিয়ে। তারপর শুরু হোল ইতিহাসের গল্প। তারপর দেশ-বিদেশের গল্প।

শেষে ফট্‌কে বললে—এবার একটা ভূতের গল্প বলো কাঞ্চনদা'—

রাত বারোটা বাজতে চললো।

পণ্টা উঠে গিয়ে মাংসটা একবার পরখ করে দেখে এল। হোল কি মাংসটার। ঝাড়া দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল মাংসের আর সেদ্ধ হবার নাম নেই।

সবারই খিদে পেয়ে গেছে। বিরাট বাগান-বাড়িটার হলঘরে আমরা বসে আছি। কলকাতা থেকে দশ মাইল উত্তরের একটা বাগান। এত রাত্রে শেষ পর্যন্ত যদি মাংসটা সেদ্ধ না হয়—শুধু ভাত আর নুন খেয়ে পেট ভরাতে হবে।

তা' কাঞ্চনদা'র গল্প শুনলে মানুষ সত্যিই খিদে ভুলে যায় বৈকি। কাঞ্চনদা' আরম্ভ করলেন ঃ

একটা নতুন ধরনের ভূতের গল্প বলি শোন্‌—

সেবার পুজোর পরই সবাই মিলে রাঁচিতে গিয়েছি। কাকীমার হজমের গোলমাল, ভালো খিদে হয় না বলে ডাক্তার রাঁচিতে হাওয়া বদলাতে বলেছে। সঙ্গে আছেন কাকাবাবু, কাকীমা, খুড়তুতো ভাই পলটু আর বিলটু। আমার ছোড়দা আর ছোট বৌদি আর আমি।

দু'দিন দু'রাত বেশ নির্বিবাদে কাটলো—তৃতীয় দিন সন্ধ্যেবেলা পর্যন্তও বেশ কাটলো। গোলমাল বাধলো রাত্তির বেলায়—রাত ঠিক দেড়টার সময় থেকে উৎপাত শুরু হোল। পাশের হলঘরের দিক থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আসতে লাগলো।

খড়র্‌—খড়র্‌—খড়র্‌—যেন বাগানের শুকনো অশথ্‌ পাতা মাড়িয়ে কে অতি সাবধানে হাঁটছে—তারপর হাঁটতে হাঁটতে ঘরের ভেতরে এল যেন।

সমস্ত দিনই সকলের পরিশ্রম হুড্রু ফল্‌স্‌এর রাস্তায় পাহাড়ের ওপর পিকনিক করতে যাওয়া হয়েছিল সবাই মিলে। সারাদিন বেড়ানো, গ্রামোফোন বাজানো, ছোড়দার ফোটো তোলা, তারপর খাবারের বাক্স খুলে বিকেল বেলাই পেট ভরে খাওয়া হয়েছে। ফিরে এসে রান্না তৈরি হয়ে থাকারই কথা।

কিন্তু এসে দেখা গেছে ঠাকুরটার অসুখ। রান্না চড়ায় নি। ঘরে শুয়ে শুয়ে জ্বরে ধুঁকছে।

একটু সকাল সকালই সবাই শুয়ে পড়েছি।

কাকাবাবু আর কাকীমা শুয়েছেন হলঘরের এক পাশে ছাদে ওঠবার সিঁড়ির দিকে। ছোড়দা আর ছোট বৌদি পশ্চিমের ঘরে। আমি একলা একটা ঘর পেয়েছি। আর পলটু আর বিলটু শুয়েছে আমারই পাশের ঘরে।

সন্ধ্যে আটটার পরেই সবাই যে-যার ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়েছি।

সেই আটটা থেকে এখন—এই রাত দেড়টা পর্যন্ত চোখে ঘুম নেই। ঘড়িতে ন'টা, সাড়ে ন'টা, দশটা, সাড়ে দশটা—একে একে সব ক'টা বাজা'র শব্দ শুনতে পেয়েছি। প্রত্যেকটি মুহূর্ত চোখের সামনে দিয়ে ঢিমে তালে বয়ে চলেছে, এমন সময় আবার সেই আওয়াজ—খড়র্—খড়র্—খড়র্—খড়র্—শুকনো পাতার ওপর হেঁটে চললে যেমন শব্দ হয়—ঠিক তেমনি। ভয়ে সমস্ত শরীর ছমছম করে উঠলো।

এতক্ষণ খুব খিদে পাচ্ছিল। অর্থাৎ রাত্রের খাওয়াটা হয়নি আজ—খিদে তো পাবেই। কিন্তু ঠাকুরের অসুখ—কে রাঁধে! কাকীমা বললেন—এই তো বিকেল বেলাই সব পেট ভরে গিল্লে—আজ রাত্রে আর খাওয়ার হ্যাংগামে দরকার নেই—কাল বরং ভোর বেলা লুচি আর আলুভাজা ক'রে দেব—

কাকীমার কথার ওপরে কেউ কথা বলবে এমন লোক আমাদের বংশে নেই। তার কারণ কাকাবাবু নিজেই কাকীমাকে বাঘের মত ভয় করেন।

কাকাবাবু বললেন—তা' তো বটেই, এই তো খেলাম গান্ডেপিন্ডে—আর মিছিমিছি কষ্ট করে দরকার নেই তোমার রাঁধবার—

অর্থাৎ রাঁধতে হলে কাকীমা আর ছোট বৌদিকেই রাঁধতে হয়।

কাকীমা প্রস্তাব করলেন আর কাকাবাবু প্রস্তাব সমর্থন করলেন—এর ওপর আর কার কি বলবার থাকতে পারে? সুতরাং হাত মুখ ধুয়ে যে-যার বিছানায় শুয়ে পড়া হয়েছে। কিন্তু শুধু শুয়ে পড়াই হয়েছে—আমার মোটেই ঘুম আসছিল না। পেটের তলা থেকে একটা ফাঁক যেন ওপরে উঠতে উঠতে গলায় এসে ঠেকে রয়েছে—

একবেলা না খেলে যে কী কষ্ট তা সেদিন জানলাম।

খিদের চোটে যখন সমস্ত রাতটাই কাবার হয়ে যাবার যোগাড়—যখন কাচের শার্সির ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানায়—ঠিক সেই সময় ওই শব্দটা—খড়র্—খড়র্ খড়র্—খড়র্—

অন্য ঘরে সব নিস্তব্ধ। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আসে শুধু। অর্থাৎ

সবাই ঘুমুচ্ছে। একলা খিদের চোটে আমারই ঘুম নেই। একবার উপুড় হয়ে শুই, একবার কাত হয়ে। কিছুতেই আর পোড়া খিদেটাকে জুত করতে পারছিনা।

আর একবার শব্দ হোল—খড়র্—খড়র্—খড়র্—তারপরেই শব্দ হোল কোঁৎ—

একটা অজানা ভয়ে শিউরে উঠছে শরীর। অজানা, অচেনা জায়গা—এ বাড়িটার পূর্ব ইতিহাসও জানি না। কে জানে কোনও অশরীরী আত্মার আসা-যাওয়ার ব্যাপার আছে কি না এখানে।

আওয়াজটা বেশ জোরেই হয়েছিল, কাকীমা জেগে উঠে বললেন—কে রে—কে—?

হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কারো কোনও সাড়াশব্দ নেই। এই একটু আগেই যে অস্বস্তিকর আওয়াজটা রাত্রির স্তব্ধতাকে ভেদ করে আশ-ঙ্কার উদ্রেক করছিল, তা আর নেই। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে পড়ে রইলাম।

কতক্ষণ কেটে গেল—

আবার সেই শব্দটা শুরু হয়েছে, কিন্তু এবার যেন অতি সন্তর্পণে, অত্যন্ত আস্তে। মনে হোল কাউকে ডাকবো নাকি! কিম্বা পলটু বিলটুর ঘরে গিয়ে শোব নাকি? কিন্তু সবাই তো ঘুমুচ্ছে। ওদের ঘুম মিছিমিছিই বা ভাঙাবো কেন। ও ঘরে ছোড়দা', ছোট বৌদি, কাকাবাবু সবাই এখন ঘুমে অসাড়। একটু আগে কাকীমার সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, এতক্ষণ কাকীমাও নিশ্চয়ই আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাইরের আকাশ থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই ঘর থেকে একটু একটু ভেতরের বারান্দাটাও দেখা যায়। তীক্ষ্ন নজর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। কোথাও কিছু দেখা যায় না।

হঠাৎ মনে হোল বিদ্যুৎ চম্‌কাবার মত যেন চম্‌কে উঠলো একটা আলো। কিন্তু সেটা মুহূর্তমাত্র। তারপরেই আবার সমস্ত অন্ধকার। ধুধু অন্ধকার চারিদিক। যেটুকু ঘুম আসবার ভরসা ছিল তাও গেল। শব্দটা এক একবার শুরু হয় আর থামে।

এবার একেবারে চীৎকার করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কে যেন আমার গলা বন্ধ করে দিলে। মনে হোল কে যেন নড়ছে ওখানে—ওই বারান্দার মধ্যিখানে।

কে? কে ও?—

চেহারাটা ঠিক যেন কাকাবাবুর মত। মাথার সামনের দিকে একটুখানি সুগোল টাক। কৌতূহল হোল। সত্যিই কি কাকাবাবু নাকি। শব্দটা ঠিক ওখান থেকেই তো আসছে। বিছানা ছেড়ে উঠলাম। রহস্যের সমাধান করতেই

হবে। জানালার ভেতর দিয়ে দেখলাম—পাশের খোলা বারান্দাটার মধ্যিখানে মেঝের ওপর কাকাবাবুই তো ব'সে। সামনে কতকগুলো কী সব রয়েছে, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না অন্ধকারে। কিন্তু এতরাত্রে কাকাবাবুই বা অমন করে ওখানে বসে করছেন কি! কাকাব্যবুর কি যোগ করা অভ্যেস আছে নাকি! নামাজ পড়ার ভঙ্গীতে কী করছেন কাকাবাবু এমন করে! আর অমন শব্দই বা হচ্ছে কিসের?

কাকাবাবুকে দেখে একটু সাহস পেলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় যেতেই কাকাবাবু দেখতে পেয়েছেন। প্রথমে একটু অবাক হয়েই গিছলেন বোধ হয়।

চুপি চুপি কাকাবাবু আমায় ডাকলেন—কে? কাঞ্চন? এদিকে আয়—আস্তে—তোর কাকীমা জেগে উঠবে—

ফিসফিস করে কথা।

কাকাবাবু আবার বললেন—ঘুম আসছিল না বুঝি? ঘুম আসবে কী করে? খিদে পেয়েছে তো? পাবেই তো!—আমারও ঘুম আসছে না, কিছু পেটে না পড়লে ঘুম আসবে না—

এতক্ষণ সামনে নজর পড়েনি। দেখি সেই অন্ধকারেই কাকাবাবু একটা শতরঞ্জি পেতে নিয়েছেন। বিস্কুটের টিন খোলা। ওপরের খড়খড়ে কাগজটা খোলবার শব্দই এতক্ষণ পাচ্ছিলাম তা'হলে!

কাকাবাবু বললেন—আর সবাই বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে—কেবল তোর আর আমার ঘুম নেই—খা, বিস্কুট খা—

মাখনের কৌটোটাও আনতে ভোলেন নি কাকাবাবু। ছুরি দিয়ে মাখন মাখিয়ে একটা মুচমুচে বিস্কুট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। নিজেও নিলেন একটা।

কাকাবাবু আবার বললেন—পেটে খিদে থাকলে ঘুম কি আসে?—তা বেশি জোরে চিবোস্ নি—কাকীমা আবার এখনি টের পেয়ে জেগে উঠবে—

কাকীমাকেই কাকাবাবুর পৃথিবীতে যত ভয়। কাকীমার মুখের সামনে কোনও কথার প্রতিবাদ করবার ভরসা নেই!

হঠাৎ কা'র যেন পায়ের শব্দ হোল। ফিরে দেখি ছোড়দা'।

ছোড়দা' কিছু বললার আগেই কাকাবাবু বললেন—চুপ, একেবারে চুপ—কাকীমা জেগে উঠলেই সর্বনাশ—তোরও হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল না কি?

ছোড়দা' বললে—ঘুম আসেই নি তার ভাঙবে কি! খিদের চোটে—

কাকাবাবু আস্তে আস্তে বললেন—তোর কাকীমার যেমন কাণ্ড—একটু

নিজে রাঁধতে হবে বলে সকলকে উপোস করিয়ে—যা হোক্ আয় বোস এখানে—শুধু শুকনো পাঁউরুটিই কামড়ে কামড়ে পেট ভরানো যাক—

ছোড়দা' এসে শতরঞ্চির ওপর বসলো। একটা মাত্র পাঁউরুটি, তাই শুকনো তিনজনে মিলে কোন রকমে পেট ভরানো।

হঠাৎ পুব দিকের দরজা খোলার শব্দ হোল। পলটু, বিলটু দু'জনেই আসছে নাকি!

কাকাবাবু হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—আস্তে আস্তে—অত শব্দ করিস নে—ওদিকে তোদের মা যে উঠে পড়বে—কি, ঘুম ভেঙে গেল অমনি?

—ঘুম আসেই নি মোটে খিদের জ্বালায়—ওরা বললে।

কাকাবাবু ভাবনায় পড়লেন। এই এতটুকু এক পাউণ্ডের এক টুকরো পাঁউরুটি পাঁচজনের কুলোবে তো! এখন পাথর খেলে পাথর হজম হয়ে যাবার যোগাড়।

কাকাবাবু বললেন—আমি ভাবলাম, আমি ছাড়া আর সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু সবাই যে এখন জেগে আছিস্ তোরা কি করে বুঝবো। এখন উপায়! কী করে এতগুলো পেট ভরানো যায়! এত খিদে শেষে যদি নাড়ি ভুঁড়ি সুদ্ধু হজম হয়ে যায়? কিন্তু খুব সাবধান—তোর কাকীমা যেন জেগে না ওঠে—

যেটুকু পাঁউরুটি ছিল তাই স্লাইস্ করে কাটা হোল। মাখন মাখানো হোল। সেই কনকনে শীতের রাত্রে খোলা বারান্দায় বসে, হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে উত্তর দিক থেকে—সবাইকে যেন একসঙ্গে ভূতে পেয়েছে। সেই ভূতে পাওয়াতে ঘুম আসছে না, শীত লাগছে না—এ ভূত বড় অদ্ভুত। কাকার বয়েস পয়ষট্টি বছর, পল্টু বিল্টুর বয়েস তেমনি আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট—সকলকে একসঙ্গে এ ধরেছে। একদিকে শীত আর একদিকে ঘুম, আর দু'এর ওপর খিদে—এই তিন মিলে সবাইকে এক-জায়গায় জুটিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ ছোট বৌদি এসে হাজির পেছন থেকে।

কাকাবাবু বললেন—বোস বৌমা, বুঝতে পেরেছি, তোমারও ঘুম আসেনি। আসবে কি করে? এই শীতে পেটে কিছু না পড়লে কি ঘুম আসে? যাক্—এই পাঁউরুটিটা দু'ভাগে ভাগ করে ফেল তো বৌমা—খুব আস্তে, ওই বিস্কুট-গুলো আমিই সব একা শেষ করে দিয়েছি, তখন তো জানিনা যে বাড়িসুদ্ধু লোক সবাই জেগে—নইলে কিছু রেখে দিতাম তোমাদের জন্যে—

ছোড়দা' বললে—একটু চিনি হ'লে ভালো হোত বেশ—

নিশ্চয়ই, চিনি না হ'লে কি পাঁউরুটি খাওয়া যায়—চিনি চাই বৈকি! কিন্তু খবরদার, কাকীমা যেন জেগে না ওঠে—জানতে পারলে বিপদ বাধবে।—অর্থাৎ

শুধু চিনি কেন—ভাত রেঁধে খাওয়া হলেও কাকাবাবুর আপত্তি নেই, শুধু কাকীমা জানতে না পারলে হোল।

এক খণ্ড পাঁউরুটি, তাকে ভাগ করতে কতটুকুইরা সময় লাগে। তবে শেষে গ্লাস দু'তিন জল খেলে পেটটা ভরলেও ভরতে পারে এবং তখন ঘুম আসবার আশা থাকলেও থাকতে পারে।

জলের কুঁজোটা আছে কাকীমা যে ঘরে শোন সেখানে। সেখানে গিয়ে জল গড়িয়ে খাওয়া চলবে না। কোনও অসাবধান মুহূর্তে একটু শব্দ করে ফেললেই ব্যস্! কাকীমা জেগে উঠে সে এক অগ্নিকাণ্ড বাধাবেন।

কাকাবাবু বললেন—তার চেয়ে কুঁজো গ্লাস সব এখানে নিয়ে এস কেউ—কাঞ্চন তুই যা—

আমি অন্ধকারে পা টিপে টিপে কুঁজো নিয়ে চলে এলাম।

ছোড়দা' বললে—চিনি?

ছোট বৌদি বললেন—চিনি তো ভাঁড়ার ঘরে আছে। ঠিক শেল্ফ্-এর কোণে প্রথম থাকে—

কাকাবাবু বললেন—তা' কাঞ্চন তুই যা—তুই একটু ধীর স্থির আছিস্ এদের মধ্যে—

শেষকালে আমাকেই চিনি আনতে যেতে হোল। হলঘর পেরিয়ে ভাঁড়ার ঘরে যেতে হবে। পা টিপে টিপে অন্ধকারে দিক ঠিক করে আন্দাজে ভাঁড়ার ঘর লক্ষ্য করে চলেছি। হঠাৎ যেন কা'র পা আচমকা মাড়িয়ে দিলাম। মাড়িয়ে দিয়েই এক নিমেষে ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে গেছি—পালিয়ে যেখান দিয়ে পেরেছি একেবারে জ্ঞান শূন্য হয়ে বাগানে গিয়ে থেমেছি—

শুনতে পাচ্ছি কাকীমার চীৎকার—কে, কে রে—কে পা মাড়িয়ে দিলে?—কে দৌড়ে পালালো—

কাকাবাবুর মাথায় বজ্রাঘাত। কাঞ্চনটা শেষে এই করলো। মাথা হেঁট করে বসে রইলেন। ছোড়দা, পল্টু, বিল্টু অপ্রস্তুত। ছোট বৌদি মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে পাঁউরুটি চিবোতে লাগলেন। এর শেষ কোথায় হবে কে জানে?

আর আমি? আমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছি। একে 'বিপরীত' খিদে তায় শীত, আবার গভীর রাত—রাত প্রায় দু'টো—

কাকীমা সহজে থামবার লোক নন। একটা ফয়সালা করে তবে ছাড়বেন। তড়াক্ করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছেন। উঠে নিজের ঘরের আলোর সুইচটা জেবলেছেন। কেউ কোথাও নেই। ও মানুষ কোথায় গেল? পলটু বিলটুর ঘরে আলো জেবলেছেন—বিছানা ফাঁকা! ওরা কোথায় গেল এত

রাত্রে। ছোড়দা'র ঘরের দরজাও খোলা। সে ঘরেও ঢুকে আলো জেবলে দেখলেন কাকীমা। ঘর ফাঁকা। আমার ঘরেও কাকীমা ঢুকেছিলেন। কেমন যেন হঠাৎ এক মিনিটের জন্যে একটু ভয়-ভয় করতে লাগলো কাকীমার। কোথায় গেল সব! তবে কি নিজে ছাড়া আর সবাই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

কাকীমা ছাড়লেন না।

শেষে এঘর-ওঘর, বারান্দা, ভাঁড়ার ঘর সব দেখতে লাগলেন। সব শেষে উত্তরের খোলা বারান্দায় এসে আলো জবালতেই চক্ষুস্থির! বেয়াক্কেলে বুড়ো মানুষ, ছেলেপিলে বৌমাকে পর্যন্ত নিয়ে অন্ধকারে ঠাণ্ডায় বসে বসে পাঁউ-রুটি চিবোচ্ছে। এত খিদে, এত পেটের জবালা!

মাথা কাকাবাবুর হেঁটই ছিল—আরো হেঁট হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ হতবাকের মত চেয়ে থেকে কাকীমা বললেন—তোমাদের যদি এতই খিদে তবে রান্না করলেই হোত—মিছিমিছি এই খিদে নিয়ে তোমরা সবাই খেতে চাইলে না—আর এখন দিব্যি পাঁউরুটি কামড়াচ্ছ—

কাকাবাবু এবার মাথা তুললেন—হ্যাঁ ঠিকই তো বলেছ—তখন তো বউমা বললেই পারতে খোলাখুলি যে রাত কাটবে না—

—তুমি থামো—থামিয়ে দিলেন কাকীমা—এতো বয়েস হোল এখনও বেয়াক্কেলেপনা গেল না—তুমিও তো দেখছি খাচ্ছ—মুখে এক গাল ভর্তি রয়েছে—কে সকলকে ডেকে আসর জমালে শুনি—

কাকাবাবু কথা বলতে পেয়ে বেঁচে গেলেন যেন—ডাকতে হবে কেন? আমি কি কাউকে ডেকেছি? সবাই নিজে থেকেই এসেছে—বিশ্বাস না হয় বৌমাকে জিগ্যেস করো—

—আর বৌমাকে সাক্ষী মানতে হবে না—কাকীমা বললেন—এস বৌমা, উনুনে আগুন দাও তো—

—এখন, এত রাত্তিরে? কাকাবাবু প্রশ্ন করলেন।

—তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না। নাও, ওঠ বৌমা, উনুনে আঁচটা দিয়ে দাও, আমি খিচুড়ি চড়িয়ে দিচ্ছি—

সেই রাত আড়াইটের সময় উনুনে আগুন দেওয়া হোল। তারপর সকলের খাওয়া যখন শেষ হোল তখন রাত প্রায় চারটে। মুরগি ডাকতে শুরু করেছে। সন্ধ্যেবেলা যে-ভূত উৎপাত আরম্ভ করেছিল—রাত চারটের সময় সে ঠাণ্ডা হোল। আর এক মিনিট দেরি নয়। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলের নাক ডাকতে শুরু করলো। পরদিন সকাল ন'টার আগে আর কারুর ঘুম ভাঙলো না।

কাঞ্চনদা' গল্পটা শেষ করলেন।

ফট্‌কে বললে—এই কি তোমার ভূতের গল্প কাঞ্চনদা'—এতো খিদের গল্প—

কাঞ্চনদা' বললেন—খিদে যে ভূতের বাবা কিম্ভুত রে! ভূতে পেলে তবু তো ছাড়ে, কিন্তু কিম্ভুতে পেলে আর ছাড়ান-ছিড়েন নেই। ভূত থাকুক গে যাক্‌—ওই কিম্ভুতটা যদি না থাকতো তো পৃথিবীতে এই অশান্তি দাঙ্গা, যুদ্ধ কিছুই হোত না—কিন্তু তা বুঝি হবার উপায় নেই—

পণ্ডা উঠে দেখতে গেল মাংসটা সেদ্ধ হোল কি না। আজ মাংস যদি সেদ্ধ না হয় তো আজকেও আবার কিম্ভুতে ধরবে আমাদের সকলকে।

রাজা রাজড়ার কাহিনী

শৈল চক্রবর্তী

কথায় কথায় অনেকেরই ঝগড়া হয়। রাজায় রাজায় কিন্তু ঝগড়া মানেই যুদ্ধ। তাঁদের কথা কাটাকাটির পরই মাথা কাটাকাটি। তোমাতে আমাতে যদি কোনও কথায় তর্ক হয়, তারপরে হয়ত হবে চটাচটি এবং তারও পরে হয়ত কথাবার্তা বন্ধ হবে বা মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার কিন্তু অন্য রকম। তাদের এসব নেই, অন্ততঃ আগে ছিল না। সোজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে একজন হয়ত ধাওয়া করলো। তারপর ঝমাঝম যুদ্ধ—যতক্ষণ না একজন হেরে যায়। হারজিৎ না হলে রাজাদের মনে সুখ নেই, আহারে রুচি নেই, চোখে ঘুম নেই—সে এক কিম্ভূত অবস্থা!

তাই রাজাদের সব সময়ই থাকতে হতো তৈরি, তার মানে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে প্রায় সেজেগুজেই থাকতে হতো। কবে কোথা থেকে কোন্ রাজা চড়াও করে। কোথায় কখন কার কোনও বিষয়ে ত্রুটি হবে, আর সে ক্ষেপে ওঠে সৈন্য পাঠাবে। কিছুই বলা যায় না।

এমনি সমস্যা হয়েছিল একবার উল্কানাথমপুরের মহারাজার।

উল্কানাথমপুর ছোট হলেও বেশ জম্‌জমাট রাজ্য। নদনদী ছিল ভাল—চাষবাস ফসলটসল বেশ ভালই হতো। তার ওপরে রাজা একটু ইংরেজী শিখেছিলেন শখ ক'রে। তাই নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলতেন। পাশের রাজ্য বিড়বিড়পুর, সেখানকার রাজাও যথেষ্ট ঠাট্টা করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছিলেন—উল্কানাথমপুরের রাজার টাইটেল হওয়া উচিত ছিল উজবুক্। —যাই হোক, সকলের বিদ্রূপ শুনে এবং ঠাট্টা সহ্য করেও ইনি একটু আধুনিক হবার চেষ্টা করতেন। রাজ্যের রাস্তাঘাট ভাল করতে খরচপত্র করতেন। এসবের জন্যে আধুনিক সরঞ্জামও সংগ্রহ করতেন। নিজের জন্যে একখানি মোটর গাড়িও কিনেছিলেন।

সপারিষদ উল্কানাথমপুররাজ গভীর মনোনিবেশ সহকারে একদিন এক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, এমন সময় সংবাদ এল—বিক্রম-পট্‌পট্‌পুরের দূত এসেছে। সঙ্গে তার রাজপত্র।

পট্‌পট্‌পুর ছিল উল্কানাথমপুরের দক্ষিণ দিকের রাজ্য। সেখানকার রাজা একটু প্রাচীন-পন্থী ও শাস্ত্রজ্ঞ, যদিও তাঁর মেজাজটা খুব সুবিধের নয়। ইতিপূর্বে রাজ্য-সীমানায় একটি সুপুরিগাছ কাটা নিয়ে দুই রাজ্যে তুমুল বিবাদ বেধেছিল। বিক্রম-পট্‌পট্‌পুরের মহারাজ বিপুল সৈন্যভার নিয়ে

উক্কানাথমপুরে ধাওয়া করেছিলেন। অনেক কাণ্ড করে উক্কানাথমপুর সেবার রক্ষা পেয়েছিল।

সে হেন রাজার কাছ থেকে চিঠি!

উক্কানাথমপুররাজ বেশ বিচলিত হয়েছেন। মন্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে দিলেন—আমাদের বৈদেশিক নীতির কোনও গোলমাল হলো নাকি?

—না মহারাজ, সে রকম কিছু নয়—

—সে রকম নয় মানে, কোন্ রকম তবে?

—একটা পাখী নিয়ে কিঞ্চিৎ—

—কি পাখী?

—একটা কাঠ-ঠোকরা জাতীয় পাখী হবে, সেটা মারা পড়েছিল—

—কোথায়? কার হাতে?

—পাখীটার বাসা ছিল বিক্রম-পট্‌পট্‌পুরের একটি শিরীষ গাছে, পাখীটা উড়ে আমাদের রাজ্যে এসে পড়ে।

—তারপর?

—আমাদের রাজ্যের কোনও অর্বাচীন ছোকরার হাতের গুলতিতে সেটা মারা পড়ে। তাই নিয়ে উক্ত রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে একটু চাঞ্চল্য পড়ে যায়।

—তারপর?—রাজা অধীর না হয়ে পারেন না।

—তারপর আমরা একশ'টি তিতির পাখী পাঠিয়ে সে বিষয়ের মীমাংস করে নিয়েছি।

—আর কিছু ঘটনা ঘটেছে বলে জানা আছে তোমার? চিঠি খোলার আগে আমি সব জানতে চাই!

—না মহারাজ, আপনি চিঠি পড়তে পারেন।

দু'জন বাহক চিঠিখানি ধরে ধরে আনলো। আসলে চিঠিখানি রাজকীয় চিঠির মতই। আড়াই হাত লম্বা একটি গোল করে গুটিয়ে পাকানো জিনিস।

রানীকে খবর পাঠাও—রাজা নির্দেশ দিলেন : গুরুতর ব্যাপারে মেয়েদের বুদ্ধি অনেক সময় কার্যকরী হয়।

সেনা-বিভাগের দু'জন এগিয়ে এলো। চিঠির এক প্রান্ত ধরে টান দিল তারা। আর এক প্রান্ত আর দুজন ধরলো। দীর্ঘ চিঠি অত্যন্ত যত্ন সহকারে দক্ষতার সঙ্গে খোলা হলেও তিন-চার মিনিটের কম সময় লাগেনি। কেননা দৈর্ঘ্যে সেটি ছোট ছিল না। রাজার সিংহাসনের কাছ থেকে মন্ত্রণাকক্ষের দরজা অবধি বিস্তৃত হয়ে পড়লো সেটি। তার প্রান্তদেশে জুড়ে দেওয়া রেশমের ফিতেটি আরও দশ-বারো হাত হবে।

মন্ত্রণা-সভার সাতজন বিজ্ঞলোক তখন পাঠ্য বস্তুর সন্ধানে ব্যাপৃত হলো।

অনেক চেষ্টায় যা উদ্ধার করা হলো তার মর্ম হচ্ছে, বিক্রম-পট্‌পট্‌পুরের মহারাজ কাল উক্কানাথমপুরে আসছেন। ট্রেনে করেই আসবেন তিনি। ট্রেনের সময় এগারোটা পঞ্চাশ মিনিট, সেটাও দেওয়া আছে।

খবরটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বে মোটেই ছোট নয়—হঠাৎ আসছেন কেন? সশরীরে নিজেই বা কেন? তা ছাড়া একেবারে কালই।

উক্কানাথমপুররাজ যৎপরোনাস্তি বিপর্যস্ত বোধ করলেন। দেখ আর কিছু লেখা আছে কিনা।—তিনি সন্ত্রস্তভাবে উচ্চারণ করেন : দেখ, আগায় তলায় আশে পাশে কোনও কিছু জুড়ে দেওয়া আছে কিনা।

—আজ্ঞে না, মহারাজ!

—কোনও ফুটনোট বা পুনশ্চ থাকতেও পারে।

—আজ্ঞে না।

—চারটে কোণ দেখেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিছু নেই?

—না।

—কোথায় কোনও কালির আঁচড় টাঁচড়, ফুটকি, ঘষা দাগ আছে নাকি দেখেছ?

—না মহারাজ, পরিষ্কার কাগজ।

—তাহলে আরও ভাবনার কথা। কারণটা যে জরুরী তাতে সন্দেহ নেই। যুদ্ধঘটিত না হয়ে যায় না।

সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাজা রানীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নিতে ভুললেন না।

সিংদরজায় বিরাট ঘণ্টায় বিরাট ঢং-ঢং করে বিপজ্জনক আওয়াজ বেজে উঠলো। সেনা-বিভাগের সতেরো জন নায়ক ঊর্ধ্বশ্বাসে দরবারে এসে হাজির।

কোন্ দিকে যুদ্ধ মহারাজ?—সবার মুখে আতঙ্কের প্রশ্ন।

রাজা বললেন—না, যুদ্ধ না ঠিক—তবে—আঙুল দিয়ে পাকানো চিঠিখানা দেখিয়ে দিলেন।

রাজার নির্দেশে যান-বাহন বিভাগের মন্ত্রী হাজির হলেন দরবারে। অনেকক্ষণ গোপন পরামর্শ হয়ে স্থির হলো—রাজার নিজস্ব মোটর গাড়িখানা সাজানো হবে—সঙ্গে তিনটি বাস্ (রিজার্ভড্ লেখা থাকে যেন) আর এগারোখানি ঘোড়ার গাড়ি তৈরি হবে। সিন-পেণ্টার আর শিল্পীদের যথেষ্ট রং দেওয়া হলো—তারা রাত্রির মধ্যে কড়া আলোয় গাড়িগুলো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে

রং লাগাবে। লাল আর হলদে রংটা যেন বেশি দেওয়া হয়, এমন হুকুম দেওয়া হয়ে গেল।

সকাল হতে না হতেই বিচিত্র গাড়ির শোভাযাত্রা উল্কানাথমপুর স্টেশনের দিকে চলতে লাগলো। সবাই বললো, বিক্রম-পট্‌পট্‌পুরের মহারাজাধিরাজের যোগ্য অভ্যর্থনা বটে! সারা রাত্রি রাজার চোখে ঘুম নেই, রানীর হাতে ব্যথা পাখার বাতাস করে। সকালে রাজা বললেন—আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। ঠিক ১১টা ৫০ মিঃ হলে আমায় যেন জাগানো হয়।

সারা রাজবাড়ি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার হতে লাগলো। মেথর-ঝাড়ুদারদের জানানো হলো এক মাসের বোনাস পাবে তারা।

উল্কানাথপুরের স্টেশনেও সাজগোজের ত্রুটি হলো না। সবাই ভাবলো, যুদ্ধের চেয়ে একটু খাটা ভাল, কাজে ফাঁকি দিতে কারুরই সাহস হলো না।

এগারোটা বাজতেই রাজা এপাশ থেকে ওপাশ ফিরে তিনটি হাই তুললেন।

রানী বললেন—একটু সরবৎ খাবে?

নাঃ,—রাজা হাত নেড়ে বললেন ঃ আবার যদি ঘুম পায়। পঞ্চাশ মিনিট সময় ত আছে মোটে, পঞ্চাশ মিনিট আর কতক্ষণ! আমার গিনি সোনার বোতামগুলোয় একটু ব্রাসো লাগিয়ে নিই বরং।

কিন্তু ব্রাসোর শিশি হাতের কাছে পাওয়া গেল না।

কী বিভ্রাট! সময় চলে যাচ্ছে তরতর করে। ইতিমধ্যে দশ মিনিট কুড়ি সেকেন্ড অবলীলাক্রমে কেটে গেছে।

রাজা মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। সত্যিই রাজবাড়িতে এ হেন অমার্জনীয় কান্ড! চীৎকার করে বললেন তিনি—আমার এটা-ওটা জিনিসের ম্যানেজার কোথা?

বলির পাঁঠার মত ম্যানেজার এলেন, কিন্তু বিশেষ কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না তিনি। তাঁর কথায় বোঝা গেল, ইঁদুরে কি বাঁদরে সেই শিশিটা সরিয়েছে, সম্প্রতি ঐ ধরনের দুর্বৃত্ত জীবের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সুতরাং অপরাধটা কীটপতঙ্গ-বীজাণুনাশন বিভাগের সেক্রেটারীর।

যাহোক ক্ষুণ্ণ হলেও রাজার চোখ ঘড়ির দিকেই পড়ে ছিল। এ-গারো-টা—পঞ্চাশ—

রাজা বোতামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিন্তা জোর করেই ভুলতে চেষ্টা করলেন, রুমাল দিয়েই তাদের মার্জনা করতে করতে বারান্দায় এসে হাজির হয়েছেন। রানীও তাঁর পাশে যথোচিত অভিজাত ভঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট—পনরো মিনিট টিক্-টিক্ করে চলে গেল। রাস্তায় কোনও চাঞ্চল্য—কোনও জনতার জয়ধ্বনির লেশমাত্র কানে এলো না।

রাজা পিছন ফিরে পার্শ্বচরকে বললেন—স্টেশনে গেছে ত সব গাড়ি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মোটর গাড়িখানার টায়ার-টিউব ঠিক আছে ত?

—আজ্ঞে সেটা সরবরাহ বিভাগের ব্যাপার—

—শিল্পীর খোঁজ নাও।

এদিকে দেখতে দেখতে বেলা দুটো বেজে গেল। রানী বললেন—আবার চায়ের জলটা বসিয়ে আসি।

ইতিপূর্বে তিনি তিনবার চায়ের জল বসিয়েছেন আর তিনবারই জল ফুটে শুকিয়ে গেছে।

রাজা বললেন—এত দেরি হবার ত কথা নয়। না খেয়ে আমিই বা কতক্ষণ দাঁড়াই? কিন্তু এটা মস্ত বড় পরীক্ষা দেখছি একটা—অবহেলা করবারও জিনিস নয়। আমার মনে হয়, আর বেশি দেরি হবে না। রানী, তুমি এবার চায়ের লিকার করতে পার। আমি বাজি রাখতে পারি দুটো পঁচিশে আসবেই আসবে।

তোমার ত কথা!—রানী জবাব দিলেন ঃ আমি বলছি দুটো বাইশে না এসে যাবে না।

রাজা বললেন—কিন্তু লিকার হবে কি? আর ত—

—সে কথা আর তোমায় বলতে হবে না, আমি চা ছেড়ে দিয়ে এসেছি এর আগেই।

কিন্তু দেখতে দেখতে দুটো বাইশও বেজে গেল—তিনটে বাজতে বেশী দেরি নেই।

রাজা ততক্ষণে ভেঙে পড়েছেন এক চেয়ারে। কতক্ষণ আর দাঁড়ানো যায়? তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণাও আছে ত! নাঃ, নিশ্চয়ই কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে যায় নি—

কিন্তু ইত্যবসরে যেন কিসের কোলাহল শোনা গেল। সত্যিই ত জনতার উল্লাস বলে মনে হচ্ছে!

বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে রাজা ও রানী দেখতে থাকেন। দেখতে দেখতে রাজার চোখে জল এসে যায়—ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁর পেটে মোচড় দিচ্ছিল।

কিন্তু দূরে যা দেখলেন তাতে তাঁর মূর্ছা যাবার কথা। ভাগ্যিস রানী ছিলেন পাশে।

ধীর মন্থর গতিতে তাঁর লোকলস্কর আসছে,—ব্যাগপাইপএর দল, ঢোল-কাঁসির দল, তারপর পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, তারপর বাস্‌গুলো! আগন্তুক মহারাজাধিরাজের সহচর পার্শ্বচরে ভর্তি হয়ে ঘোড়ার গাড়িগুলো ঢিমে কদমে চলছে। সর্বশেষ আসছে রাজার নিজস্ব ফোর্ড মোটর। কিন্তু, ও কি? তাঁর

মোটরকে ঠেলে আনছে সাতজন লোক! তারই ভিতরে তাঁর সম্মানীয় অতিথি বিক্রম-পট্‌পট্‌-মহারাজ!

রাজসভায় বিক্রম-পট্‌পট্‌পুরের রাজাধিরাজের জন্যে সাজানো সিংহাসন নির্দিষ্ট ছিল। বিরাট প্রশস্তি পাঠ হলো, কিন্তু উল্কানাথমপুররাজের মনটি সর্বদা ধুক্‌ধুক্‌ করছে। এত করেও যুদ্ধকে ঠেকাতে পারলেন না তিনি। তাঁর প্রিয় বাহন লৌহযান মোটর গাড়ি তাঁকে এভাবে অপদস্থ করলো! ছিঃ ছিঃ!

যাই হোক, সম্মানীয় মহারাজাধিরাজের আচরণ কিন্তু খুবই ভদ্রোচিত বলেই মনে হচ্ছিল।

—আমি আপনার এই সমবরধনায় খুবই পি-পি-পিরিত হলাম (রাজাধিরাজের ঠোঁটে যুক্ত অক্ষর আর র-ফলাগুলো ঠিক আসতো না)। আহা, কি মনোহর চক্‌কর্‌যান আপনি পাঠিয়েছিলেন!

—অপরাধ মার্জনা করবেন।—উল্কানাথমপুররাজ যৎপরোনাস্তি বিনীত হয়ে পড়েন: ওটা—

—না না, এরূপ বাহনে আমি জীবনে এই প-প-পরথম চাপলাম। মনুষ্য-চালিত এ হেন অভিনব যান আমি কদাপি উপভোগ করিনি।

উল্কানাথমপুররাজের তখন শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল। না জানি কী কঠোর মন্তব্য শুনবেন তিনি এরপর। তাঁর অবস্থা দেখে মন্ত্রী জিনিসটা শোধরাবার চেষ্টা করলেন—প্রবলপ্রতাপান্বিত মহারাজের কাছে এ মারাত্মক ত্রুটির জন্যে আমরা মর্মে মর্মে মৃতপ্রায় হয়েছি। এটি নিছক ভুল—

—ভুল, আহা, এ ভুল করে আপনারা আমায় সর্মাধিক আনন্দ দিয়েছেন। আমি যেন গি-গি-গিরিহ মধ্যে বিচরণ করলাম। আর ধীরে ধীরে দিরিশ্যাবলী দেখতে দেখতে এসেছি। ঘোটক, গরধব, উষটর চালিত যান আমি চেপেছি। কিন্তু মনুষ্যচালিত যানে আমি বিশেষ সম্‌মানিত বোধ করেছি।—তাঁর কপালে ঘাম দেখা দিল।

তখনই চা-পান-কক্ষে যাবার আয়োজন হলো। চায়ের আসরে রানীই চা সরবরাহ করলেন। লিকার সত্যিই দোয়াতের কালির মত হয়ে পড়েছিল। প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ চা খেয়ে বললেন, এমন কফি তিনি বহুদিন খাননি। রানী কিন্তু এক চুমুক মুখে দিয়েই পিছন হেঁটে বাইরে ছুটলেন।

উল্কানাথমপুররাজ এক ফাঁকে তাঁর নিজস্ব মোটর-চালকের সঙ্গে দেখা করে জানলেন যে, তাঁর গাড়ি-বিভ্রাটের কারণই হলো পেট্রোল।

কেন? পেট্রোল নিতে ভুল হয় কেন?—রাজা শাসকসুলভ স্বরে কৈফিয়ত চান।

—না মহারাজ, পেট্রোল ঠিকই নিয়েছিলাম, তবে স্টেশনে গিয়ে দেখি,

পেট্রোলে প্রচুর ভেজাল। কোন্ দুরাত্মা তার মধ্যে পরিস্রুত জল ঢেলে রেখেছে। আমার মনে হয় সরবরাহ বিভাগ এবম্বিধ দুষ্কার্যের জন্য দায়ী।

রাজার মুখ দিয়ে শুধু একটি বাক্য নিঃসৃত হলো—হুম্!

প্রচুর আপ্যায়নে সম্মানীয় রাজাধিরাজ যৎপরোনাস্তি আপ্যায়িত হয়ে খুশী হলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি ফেরবার সংকল্প করলেন। যাবার সময় তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, সেই মনুষ্য-চালিত বাহনেই তিনি যাবেন, তাঁর খুশীর প্রমাণ স্বরূপ যাবার আগে নিরানব্বুই বছরের এক সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে গেলেন।

উল্কানাথমপুরে ঢাক-ঢোল-ঝল্লরী বেজে উঠলো কীর্তনের সুরে।

চোর ধরা

কুমারেশ ঘোষ

ভোরের ঘুমটা আচমকা ভেঙে গেল। পিসিমা ঘরে এসে বললেন : হ্যাঁরে, একি শুনচি?

কি?—তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসলাম।

তুই কিশোরীকে ছাড়িয়ে দিবি নাকি?

অবাক হলাম। বললাম : না তো!

তবে যে লোক আসচে কাজের জন্যে!

অন্যদিন ঘুমের জের কাটতেই লাগে প্রায় পনরো মিনিট। আজ পিসিমার কথায় চোখ একেবারে ছানাবড়া। ঘুম গেল মাথায় চড়ে। বললাম : আমার কাছে লোক আসচে কাজের জন্যে?

হ্যাঁ।

কে বললে তোমাকে?

কে আবার, কিশোরী। আমাকে কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসে বললে, হ্যাঁ, পিসিমা, এ বাড়িতে আমার আর থাকা চলবে না? জিজ্ঞেস করলাম, কেন রে? বললে, দু'জন লোক এসেচে নিচে, এ বাড়ির কাজের জন্যে। তারা নাকি কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এসেচে।

বিজ্ঞাপন?

কিশোরী তো তাই বললে। আর তারা নাকি নিচে বসে আছে তোর সঙ্গে দেখা করবে ব'লে।

আমি তড়াং করে খাট থেকে নেমে বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে তরতর করে নেমে গেলাম নিচে। দেখি, সত্যিই দু'জন আধাবয়সী লোক, উষ্ক-খুষ্ক চেহারা—বসে আছে বেঞ্চে। একজনের হাতে খবরের কাগজ। আমি ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালো তারা।

কী চাই? গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

চাকরি। একজন নরম গলায় বললো।

আজ কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এসেচি।—আর একজন বললো হাতের কাগজ-খানা দেখিয়ে।

দেখি কাগজখানা?—তার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলাম কাগজখানা।

এই দেখুন।—পেন্সিলে দাগ দেওয়া জায়গাটা দেখিয়ে দিলো সে।

পড়লাম। সত্যিই লেখা রয়েছে কর্মখালি বিভাগে : গৃহকর্মের উপযোগী

লোক চাই। থাকা খাওয়া ছাড়া মাসিক কুড়ি টাকা মাহিনা। এবং শেষে আমার নাম-ঠিকানা!

আমি তো থ'। আমার নাম-ঠিকানা দিয়ে এ বিজ্ঞাপন দিল কে? আর লোকই বা আমার দরকার, কে বললে? যা বাব্বা। এখন এদের কি বলি?

এমন সময় কাগজী লোকটি বললো ঃ দেখুন স্যার, আমাকে যদি রাখেন তো—

আর আমাকে রাখলে বিশেষ—খালি হাতে লোকটিও বলতে যাচ্ছিল, থামিয়ে দিলাম তাকে।

বললাম ঃ নাম-ঠিকানা দিয়ে যাও, পরে জানাবো।—বলেই পেন্সিলটা ড্রয়ার থেকে বার করে লিখে নিলাম সব।

তারা চলে গেল। আমি উপরে উঠে এলাম।

ভাবছি অবাক হয়ে, এ আবার কি ব্যাপার? এমন সময় চা হাতে সামনে এসে দাঁড়ালো কিশোরী। টেবিলে চা-টা রেখে শুকনো মুখে বললো ঃ এক-জন বাবু ডাকছেন।

বাবু? বাবু আবার কেন?

জানি নে।

আচ্ছা, বসতে বল, যাচ্ছি। আর হ্যাঁ, শোন্।

কিশোরী দাঁড়ালো।

বললাম ঃ তোর চাকরি যাবে কি রে? পিসিমাকে তুই বলেছিস নাকি? ও বিজ্ঞাপন আমার দেওয়া নয়। তবে কে দিয়েছে বুঝিছি নে। আচ্ছা, তুই যা, বলগে বসতে।

কিশোরী চলে গেল। আমি বরাতের চা-টা বাদ না দিয়ে গলাধঃকরণ করে নিচে গিয়ে দেখি বাইরের ঘরে এক কোণে খাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে বসে আছেন আমাদের ঝণ্টুদা!

নিচু গলায় বললেন ঃ বসো বসো বলছি!

বসলাম চেয়ারটায়। মনের মধ্যে তোলপাড় হতে লাগলো ঃ সকাল বেলা আজ হলো কি? যত অদ্ভুত ব্যাপার। পুলিসের ভয়ে ঝণ্টুদা লুকিয়ে আছে নাকি? বললাম ঃ কী ব্যাপার, বলুন তো?

আর বলো না।—ঝণ্টুদা বললেন ঃ মহাবিপদ!

রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম ঃ কী বিপদ! পুলিস-ফুলিসের হাঙ্গামা নাকি?

অনেকটা তাই!

অ্যাঁ! বলেন কি? আপনি শেষকালে—

না, না,—ঝণ্টুদা বলছেন ঃ আমি নই, তবে আমারই ব্যাপার।

বলুন, বলুন—খুলে বলুন।—প্রায় অধৈর্য হয়ে বললাম।

ঝণ্টুদা বললেন ঃ তুমি সদর দরজার দিকে লক্ষ্য রাখো। কেউ এলেই টেবিলে একটি টোকা দিয়ে ইশারা করবে—আমি চুপ মেরে যাবো।

অবাক হয়ে বললাম ঃ বেশ।

আমি সদর দরজার দিকে চোখ রাখলাম, কান রাখলাম ঝণ্টুদার দিকে। ঝণ্টুদা প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন লোক এসেছিল এখানে!

হ্যাঁ, এসেছিল দুজন।

চাকরির জন্যে তো, কী রকম দেখতে? বয়স?

আধা বয়সি দুজনেই! কিন্তু তুমি কী করে জানলে?

ও চাকরির বিজ্ঞাপন আমি দিয়েছি তোমার নামে।

কেন? কেন?—বিস্ময়ের উপর বিস্ময়।

ঝণ্টুদা হাসলেন। বললেন ঃ বলছি, ভাই সব খুলে বলছি। দিন পনরো আগে আমাদের বাড়ির কাজের জন্য একটা লোক চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। একটা ১৫|১৬ বছরের ছোকরাও পেলাম। ছ'সাত দিন কাজও করলো বেশ, যা বলি তাই করে। সেদিন বাজারে পাঠিয়েছি টাকা দিয়ে, দেখি ন'টা বেজে গেল তবু ফেরবার নাম নেই। শেষে ভাতে ভাত খেয়েই অফিস বেরুবার সময় হাতঘড়িটা হাতে দিতে গিয়ে দেখি সেটা উধাও। ভাই সোনার ঘড়ি, বিয়েতে পাওয়া, আজ পনরো বছর হাতে পরে আসছি—সেদিন যেন কর্পূরের মত উবে গেল! আর বুঝতে বাকি থাকলো না, ঐ ব্যাটাচ্ছেলের কাণ্ড।

বললাম ঃ তা পুলিসে খবর দিলে না কেন?

পুলিস?—ঝণ্টুদা হাসলেন ঃ পুলিস চোর ধরে নাকি? চোর ধরিয়ে দিতে হয়।

তা কি ঠিক করেচো?

ঠিক করেচি, নিজেই ধরবো চোর?

তুমি ধরবে? কী করে?

বিজ্ঞাপন দিয়ে!

হাসলাম, বিজ্ঞাপন দিয়ে চোর ধরবে? পাগল তুমি।—বললাম ঃ তাই বুঝি আমার নামে ঐ ধরনের আর একটি বিজ্ঞাপন বার করেচো—

হ্যাঁ। ঐ রকম বিজ্ঞাপনে আবার হয়ত আসতে পারে সে। একবার লোভ পেয়েচে তো! জানো তো, লোভে পাপ, পাপে—

আমি টেবিলে টোকা মারতেই থেমে গেলেন ঝণ্টুদা। সদর দরজা ঠেলে ঢুকলো একটা জোয়ান লোক ঃ আপনার এখানে চাকরি আছে নাকি? পাওয়া যাবে স্যার।

ঝণ্টুদা আগেই উঁকি মেরে দেখে নিয়েছে। আমি কিছু বলবার আগেই তিনি গলাটি বাড়িয়ে বললেন ঃ না। সে চাকরি হয়ে গেছে।

লোকটি ম্লান মুখে চলে গেল।

ঝণ্টুদা বললেন ঃ ও নয়। মনে হচ্চে, সেও আসবে।

হেসে বললাম ঃ ঘোড়ার ডিম আসবে।

বলতে না বলতেই একটি ছোকরা হাজির হলো সদর দরজায়। দরজায় শব্দ হতেই ঝণ্টুদা উঁকি মেরে দেখতে গিয়ে দেখলেন শিকার সামনে। 'এই যে!' বলে বাঘের মত এক লাফে একেবারে ছোকরার ঘাড়ের উপর। এক হাতে তার হাত, আর এক হাতে তার গলা চেপে ধরে বললেন ঃ বার কর্ হারামজাদা ঘাড়ি।

ছোকরার মুখে কথা নেই। বুঝলো, জালে পড়েচে। আমি তো অবাক্।

ঝণ্টুদা বললেন ঃ কী, মুখে কথা নেই যে!—আমাকে বললেন, সদর দরজাটা বন্ধ করে দাও তো!

দিলাম বন্ধ করে দরজা।

ঝণ্টুটা শুরু করলেন তার পিঠে কিল চড় ঘুসি ঃ বল্ শীগ্গির কোথায় ঘাড়ি, নইলে মেরে ফেলবো।

ছেলেটা কেঁদে ফেললো ঃ ঘাড়িটা বিক্রি করেচি।

কোথায়?

শিয়ালদার এক দোকানে।

জিজ্ঞেস করলাম ঃ কত টাকায় বেচেছিস?

উত্তর দিলো ঃ পঞ্চাশ টাকায়।

ঝণ্টুদা বললেন ঃ পঞ্চাশ টাকার ঘাড়ি বুঝি ওটা? হারামজাদা, চল্ আমাদের সঙ্গে সে ঘাড়ি বার করচি!

অতএব গামছা দিয়ে পিঠমোড়া করে তার দু'হাত বেঁধে আমরা তাকে নিয়ে গেলাম থানায়। পথে সঙ্গ নিল বহুলোক আর তাদের বহু প্রশ্ন। বাঘে ছুঁলে যেমন আঠারো ঘা—এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেও তার জের চলে বহুদিন। অর্থাৎ থানা, পুলিস, দোকান, হাজত, ছোট ছেলেদের বিচারালয় ইত্যাদি ঘুরতে ঘুরতে জুতো ছিঁড়ে যাবার যোগার। তবে ঘাড়ি পাওয়া গেল না।

কিন্তু যা পাওয়া গেল তা ঠেকে শেখা জ্ঞান। যথা ঃ

১। অজানা লোককে বাড়িতে রাখতে নেই।

২। বুদ্ধির বড় কিছু নেই। আর,

৩। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

বিল্লুর বাবা যখন ফিরলেন, বিল্লু তখনো তার জ্যাঠামণির কাছে দিল্লীর গরম আর ট্রেনের ভিড়ের কথা কম করে পাঁচশবার শুনেও আবার শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠেছে। প্রণাম করে বিল্লুর বাবা বললেন, 'ভালো আছ তো বড়দা? মণিদার ছেলের খবর শুনে—'

'আর বলিস্ নে। ভেরি ব্যাড্—টাইফয়েডে একুশ দিনের দিন মারা গেলো।

বিল্লু আর তার বাবা ফাঁকা চোখে তাকিয়ে রইলো। মণিবাবু বিল্লুদের গ্রামের লোক। আত্মীয়ের চেয়েও বেশী। তিনিও দিল্লীতে থাকেন। এই বছর তাঁর ছেলে দিল্লী ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যাট্রিকে সেকেণ্ড হয়েছিলো। ব্যাচারার পাশের খবরই শুনেছিলো তারা, মৃত্যুর খবর শোনে নি।

আমতা আমতা করে বিল্লুর বাবা বললেন, 'কই, অসুখের খবর তো শুনি নি। মণিদা—আহা! বেচারার যে ঐ এক ছেলে! খুব মুষড়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই।'

বিল্লুর জ্যাঠামণি পিছন ফিরে স্যুটকেস গোছাচ্ছিলেন। বিল্লুর বাবার কথা শুনে ফিরে বললেন, 'মুষড়ে পড়বে কেন? তোর কি মাথার ঠিক নেই? ছেলে স্কলারশিপ পেলে কেউ মুষড়ে পড়ে? বিল্লু ভাল করে পাশ করলে তুই মুষড়ে পড়বি? সবাই তো আর তোর মতো বোকা হয় না।' তাঁর মুখে চোখে আন্তরিক বিরক্তের ছাপ : 'দিনকের দিন তুই যেন একটা কি হয়ে পড়ছিস্।'

'এই যে বললে মণিদার ছেলে মারা গেছে—'

'আহা মণি নয়, পানু তার পাশের বাড়িতে থাকে। তাকে তুই চিনিস্ না। পানুর ছেলে টাইফয়েডে মারা গেছে। মণির ছেলে সেকেণ্ড হয়েছে। কি শুনতে যে কি শুনিস্ তোরা—!'

বিল্লুর বাবার আতঙ্কিত মুখে চাপা হাসির রেখা দেখা দিলো। বিল্লুও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু সে ভেবে পেলো না সত্যিই তারা ভুল শুনেছিলো কিনা!

তিন দিন পরে বিল্লুর কলেজ খুললো। এই প্রথম সে কলেজে চলেছে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সবাইকে সে প্রণাম করলে। জ্যাঠামণিকেও। তিনি বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা, জ্ঞানী হও, গুণী হও। দেশের মুখ উজ্জ্বল কর, দশের মুখ উজ্জ্বল কর।—কিন্তু ভালো কথা, দুপুরের ট্রেনেই যে বর্ধমান যাচ্ছি। কলকাতার কাজ শেষ হয়েছে। বর্ধমান থেকেই সোজা চলে যাবো দিল্লী।'

'তা'হলে আপনার সঙ্গে কি যাবার আগে আর দেখা হবে না?'

'হবে—হবে, হতেই হবে। দুটো টুথ-ব্রাস আর কে, সি, দাসের টিনে-ভর্তি রসগোল্লা নিয়ে তুই ঠিক সাড়ে তিনটের সময় এগার নম্বর প্ল্যাটফর্মে পোঁছবি। তিনটে প'য়তাল্লিশে'র গাড়ি। মনে থাকবে তো?'

জিনিস কেনবার জন্যে একটা দশ টাকার নোট তিনি বিল্টুকে দিলেন। মণি-ব্যাগে ভরে বিল্টু কলেজে গেলো। ঠিক দুটোর সময় থেকে বেরিয়ে হ্যারিসন রোডের মণিহারি দোকান থেকে টুথ-ব্রাস কিনে সে এলো এস্‌প্লানেডে; সেখানে কে, সি, দাসের দোকান থেকে টিনে-ভরা রসগোল্লা কিনে ট্রামে চড়ে এল হাওড়ায়। তখন সোয়া তিনটে। প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে এগার নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকে ট্রেনটা তন্নতন্ন করে সে খুঁজলো। কিন্তু কোথাও তার জ্যাঠামণির চিহ্ন নেই। আগে এসে পড়েছে ভেবে একটা বেঞ্চিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল বিল্টু।

কিন্তু কোথায় তার জ্যাঠামণি? ট্রেন ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেলো, মাত্র আর পাঁচ মিনিট আছে—ট্রেন ফেল করবেন নাকি? ভুল করেন নি তো?

কথাটা মনে হতেই লাফিয়ে উঠে সে উল্টো দিকের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো রাঁচির ট্রেনটা খুঁজতে লাগলো।

যা ভেবেছিলো তাই। একটা ফাঁকা দেখে ইণ্টার ক্লাসের কোণের বেঞ্চিতে বিছানা খুলে হেলান দিয়ে বসে, তার জ্যাঠামণি গভীর মনোযোগের সঙ্গে উডহাউসের কি-একটা হাসির বই পড়ছেন আর মুচকে মুচকে হাসছেন!

হন্তদন্ত হয়ে কামরায় উঠে বিল্টু বললো, 'জ্যাঠামণি, একি? কোথায় যাচ্ছেন? কখন এলেন?'

'ঠিক পৌনে তিনটেয় এসেছি। ভাবলুম তুই বুঝি আর এলিই না! তোদের সব যেমন কাণ্ড! আচ্ছা ভুলো হয়েছিস যা হোক্।'

'কিন্তু এ গাড়ি যে রাঁচি যাবে।'

'রাঁচির গাড়ি রাঁচি যাবে তাতে এমন অবাক হচ্ছিস কেন?'

'এই যে বললেন বর্ধমানে যাবে?'

'বর্ধমানেই ত যাবো!—বেশ ফাঁকা দেখে কামরা পেয়েছি বলে বুঝি তোর পছন্দ হচ্ছে না?' তিনি একটু রসিকতা করতে চেষ্টা করলেন।

'না তা নয়। রাঁচির গাড়ি তো বর্ধমান যাবে না। বর্ধমানের গাড়ি ওই দেখুন সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফার্স্ট বেল পড়ে গেছে। ছাড়লো বলে।'

'তাই তো, তাই তো! এ যে ভয়ানক কথা! কুলি—এই কুলি—'

কোন রকমে বিছানাটা পাকিয়ে তাড়াহুড়ো করে, হোঁচট খেয়ে, বিষম খেয়ে—বিল্টু, তার জ্যাঠামণি আর কুলিতে মিলে যখন বর্ধমানের গাড়িতে মালপত্র তুললো তখন শেষ ঘণ্টা পড়ে গেছে, গার্ড-সায়েবের হুইসিল্ শোনা যাচ্ছে।

কোমরে ময়লা গামছা জড়ানো লাল ফতুয়া-পরা কুলি চকচকে সিকি সমেত হাতের তালু তার জ্যাঠামণির দিকে প্রসারিত করে বলছে, 'হুজুর, আপ মা-বাপ হুজুর, মালিক, চার আনা হুজুর—'

বিল্লু পায়ে হাত দিয়ে বিদায় প্রণাম সেরে নিতেই, খেঁকিয়ে উঠে তার জ্যাঠামণি বললেন, 'হুজুর মা-বাপ তো কি? চার আনা বহুৎ হুয়া। ভাগো। —যাবি না? আচ্ছা জ্বালা তো?' বলে আরো একটা দো-আনি ব্যাগ থেকে বার করে বিল্লুর হাতের তালুর ওপর রেখে বললেন, 'ভাগ্। আর বক্‌বক্ করিস্ নে।'

তারপর কুলির থুত্‌নিতে হাত দিয়ে সেই হাতটা নিজের ঠোঁটের কাছে এনে চুক্ করে একটা শব্দ করে বললেন, 'থাক বাবা থাক! অতবার প্রণাম কেন? হয়েছে হয়েছে! জ্ঞানী হও, গুণী হও। দেশের মুখ উজ্জ্বল কর, দশের মুখ উজ্জ্বল কর—' বলতে-বলতে তিনি চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়লেন।

বিল্লু আর কুলি পরস্পরের দিকে খানিক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। তারপর ফিক্ করে হেসে লাল ফতুয়াপরা লোকটা বিল্লুর হাতের তালু থেকে দো-আনিটা টপ্ করে তুলে নিয়ে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেলো।

কুট্টিমামার হাতের কাজ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চিড়িয়াখানার কালো ভালুকটার নাকে একদিক থেকে খানিকটা রোঁয়া উঠে গেছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে আমাদের পটলডাঙার টেনিদা বললে, বলতো প্যালা—ভালুকটার নাকের ও দশা কি করে হল?

আমি বললাম, বোধ হয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে, তাই—

টেনিদা বললে, তোর মুণ্ডু!

—তা হলে বোধ হয় চিড়িয়াখানার লোকেরা নাপিত ডেকে কাটিয়ে দিয়েছে। মানুষ যদি গোঁফ কামায়, তা হলে ভালুকের আর দোষ কী?

—থাম্ থাম্—বাজে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করিসনি।—টেনিদা চটে গিয়ে বললে,—যদি এখন এখানে কুট্টিমামা থাকত, তা হলে বুঝতিস সব জিনিস নিয়ে ইয়ার্কী চলে না।

—কে কুট্টিমামা!

—কে কুট্টিমামা!—টেনিদা চোখ দুটোকে পাটনাই পেঁয়াজের মতো বড় বড় করে বললে, তুই গজগোবিন্দ হালদারের নাম শুনিস্নি?

—কখনো না—আমি জোরে মাথা নাড়লাম ঃ কোনোদিনই না। গজগোবিন্দ! অমন বিচ্ছিরি নাম শুনতে বয়ে গেছে আমার।

—বেটা! খুব যে তড়পাচ্ছিস দেখছি! জানিস, আমার কুট্টিমামা আস্তো একটা পাঁঠা খায়? তিন সের রসগোল্লা ফুঁকে দেয় তিন মিনিটে?

—তাতে আমার কী! আমি তো তোমার কুট্টিমামাকে কোনোদিন নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছি না! প্রাণ গেলেও না।

—তা করবি কেন! অমন একটা জাদরেল লোকের পায়ের ধুলো পড়বে তোর বাড়িতে—অমন কপাল করেছিস নাকি তুই? পালা জ্বরে ভুগিস আর সিঙি মাছের ঝোল খাস্—কুট্টিমামার মর্ম তুই কি বুঝবি র‍্যা? জানিস, কুট্টিমামার জন্যেই ভালুকটার ওই অবস্থা?

এবারে চিন্তিত হলাম।

—তা তোমার কুট্টিমামার এসব বদ্ খেয়াল হল কেন? কেন ভালুকের নাক কামিয়ে দিতে গেল খামোকা? তার চাইতে নিজের মুখ কামালেই তো ঢের বেশি কাজ দিত!

—চুপ কর্ প্যালা, আর বাজে বকালে রদ্দা খাবি—টেনিদা সিংহনাদ

করল! আর তাই শুনে ভালুকটা বিচ্ছিরি রকম মুখ করে আমাদের ভেংচে দিলে।

টেনিদা বললে, দেখলি তো! কুট্টিমামার নিন্দে শুনে ভালুকটা পর্যন্ত কেমন চটে গেল!

এবার আমার কৌতূহল ঘন হতে লাগল।

—তা ভালুকটার সঙ্গে তোমার কুট্টিমামার আলাপ হল কি করে?

—আরে সেইটেই তো গল্প। দারুণ ইনটারেস্টিং।—হুঁ হুঁ বাবা, এসব গল্প এমনি শোনা যায় না—কিছু রেস্ত খরচ করতে হয়। গল্প শুনতে চাস—আইসক্রীম খাওয়া।

অগত্যা কিনতেই হল আইসক্রীম।

চিড়িয়াখানার যেদিকটায় অ্যাটলাসের মূর্তিটা রয়েছে, সেদিকে বেশ একটা ফাঁকা জায়গা দেখে আমরা এসে বসলাম। তারপর সারসগুলোর দিকে তাকিয়ে আইসক্রীম খেতে খেতে গল্প শুরু করল টেনিদা।

আমার মামার নাম গজগোবিন্দ হালদার। শুনেই তো বুঝতে পারছিস ক্যায়সা লোক একখানা। খুব তাগড়া জোয়ান ভেবেছিস বুঝি? ইয়া ইয়া ছাতি—অ্যায়সা হাতের গুল? উঁহু, মোটেই নয়। মামা একেবারে প্যাঁকাটির মতো রোগা—দেখলে মনে হয় হাওয়ায় উলটে পড়ে যাবে।- তার ওপর প্রায় ছ'হাত লম্বা—মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, দূর থেকে ভুল হয় বুঝি একটা তালগাছ হেঁটে আসছে। আর রঙ! তিন পোঁচ আলকাতরা মাখলেও অমন খোলতাই হয় না। আর গলার আওয়াজ শুনলে মনে করবি—ডজন খানেক নেংটি ইঁদুর ফাঁদে পড়ে চিঁ চিঁ করছে সেখানে।

সেবার কুট্টিমামা শিলিগুড়ি ইস্টিশনের রেলওয়ে রেস্তোরায় বসে সবে দশ প্লেট ফাউলকারী আর সের তিনেক চালের ভাত খেয়েছে, এমন সময় গোঁ গোঁ করে একটা গোঙানি। তারপরেই চেয়ার-ফেয়ার উলটে একটা মেমসায়েব ধপাস্ করে পড়ে গেল কাটা কুমড়োর মতো।

হৈ—হৈ—রৈ—রৈ! হয়েছে কী, জানিস্? চা-বাগানের এক দঙ্গল সাহেব-মেম রেস্তোরায় বসে খাচ্ছিল তখন! মামার খাওয়ার বহর দেখে তাদের চোখ তো উলটে গেছে আগেই, তারপর আবার দশ প্লেট খাওয়ার পরে মামা যখন আরো দু প্লেটের অর্ডার দিয়েছে, তখন আর সইতে পারেনি।

—ও গড় হেল্প মি, হেল্প মি—বলে তো একটা মেম ঠায় অজ্ঞান! আর তোকে তো আগেই বলেছি—মামার চেহারাখানা কী বলে—তেমন ইয়ে নয়!

মামার চক্ষু স্থির!

দলে গোটা চারেক সাহেব—কাশীর ষাঁড়ের মতো তারা ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা!

কুট্টিমাম ভাবলে, ওরা সবাই মিলে পিটিয়ে বুঝি পাট্‌কেল বানিয়ে দেবে! মামা জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে পৈতে খুঁজতে লাগলো—দুর্গা নাম জপ করবে! কিন্তু সে পৈতে কি আর আছে? পিঠ চুলকোতে গিয়ে কবে তার বারোটা বেজে গেছে।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে দুটো সাহেব তখন এগিয়ে আসছে তার দিকে। প্রাণপণে দেঁতো হাসি হেসে মামা বললে, ইট ইজ্‌ নট মাই দোষ স্যার—আই একটু বেশি ইট স্যার—

কুট্টিমামার বিদ্যে ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত কিনা, তাও তিনবার ফেল। তাই ইংরেজি এর বেশি আর এগুলো না।

তাই শুনে সায়েবগুলো ঘোঁ—ঘোঁ—ঘুঁক্‌—ঘুঁক্‌—হোয়া হোয়া করে হাসল। আর মেমেরা খিঁ—খিঁ—পিঁ—পিঁ—চিঁ—হিঁ—হিঁ করে হেসে উঠল। ব্যাপার দেখে শুনে তাজ্জব লেগে গেল কুট্টিমামার।

অনেকক্ষণ হোয়া—হোয়া করবার পরে একটা সাহেব এসে কুট্টিমামার হাত ধরল! কুট্টিমামা তো ভয়ে কাঠ—এই বুঝি হ্যাঁচকা মেরে চিৎ করে ফেলে দিলে! কিন্তু মোটেই তা নয়, সায়েব কুট্টিমামার হ্যান্ডশেক করে বললে, মিস্টার বেঙ্গালী, কী নাম তোমার?

কুট্টিমামার ধড়ে সাহস ফিরে এল। যা থাকে কপালে ভেবে বলে ফেলল নামটা।

—গাঁজা-গাবিন্ডে হ্যাল্ডার?

বাঃ, খাসা নাম। মিস্টার গাঁজা-গাবিন্ডে, তুমি চাকুরি করবে?

চাকরি! এ যে মেঘ না চাইতেই জল! কুট্টিমামা তখন টো-টো কোম্পানির ম্যানেজার—বাপের, অর্থাৎ আমার দাদুর বিনা পয়সার হোটেলে রেগুলার খাওয়া-দাওয়া চলছে। কুট্টিমামা খানিকক্ষণ হাঁ করে রইল।

সায়েবটা তাই দেখে হঠাৎ পকেট থেকে একটা বিস্কুট বের করে কুট্টিমামার হাঁ-করা মুখের মধ্যে গুঁজে দিল। মামা তো কেশে বিষম খেয়ে অস্থির! তাই দেখে আবার শুরু হল ঘোঁ-ঘোঁ—হোঁয়া-হোঁয়া—পিঁ-পিঁ—চিঁ—হিঁ-হিঁ! এবারে মেম পড়ে গেল চেয়ার থেকে।

হাসি-টাসি থামলে সেই সায়েবটা আবার বললে, হ্যালো মিস্টার বেঙ্গালী, আমরা আফ্রিকায় গেছি, নিউগিনিতে গেছি, পাপুয়াতেও গেছি। গরিলা, ওরাং, শিম্পাজী সবই দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো এমন একটি চিজ কোথাও চোখে পড়েনি! তুমি যদি আমাদের চা-বাগানে চাকরি নাও—তাহলে এক্ষুনি তোমায় দেড়শো টাকা মাইনে দেব। খাটনি বিশেষ কিছু নয়—শুধু বাগানের কুলিদের একটু দেখবে আর আমাদের মাঝে মাঝে খাওয়া দেখাবে।

এমন চাকরি পেলে কে ছাড়ে? কুট্টিমামা তক্ষুনি এক পায়ে খাড়া।

সায়েবরা মামাকে যেখানে নিয়ে গেল, তার নাম জঙ্গলঝোরা টী এস্টেট্। মংপুর নাম শুনেছিস—মংপু? আরে, সেই যেখানে কুইনিন তৈরি হয় আর রবীন্দ্রনাথ যেখানে গিয়ে কবিতা-টবিতা লিখতেন? জঙ্গলঝোরা টী এস্টেট্ তারই কাছাকাছি।

মামা তো দিব্যি আছে সেখানে। অসুবিধের মধ্যে মেশবার মতো লোকজন একেবারে নেই, তা ছাড়া চারদিকেই ঘন পাইনের জঙ্গল। নানারকম জানোয়ার আছে সেখানে, বিশেষ করে ভালুকের আস্তানা। তা মামার দিন ভালোই কাটছিল। সস্তা মাখন, দিব্যি দুধ—অঢেল মুরগী। তা ছাড়া সায়েবরা মাঝে মাঝে হরিণ শিকার করে আনত, সেদিন মামার ডাক পড়ত খাওয়ার টেবিলে। একাই হয়তো একটা সম্বরের তিন সের মাংস মামা সাবাড় করে দিত, তাই দেখে টেবিল চাপড়ে উৎসাহ দিত সায়েবরা—হোয়া—হোয়া—হিং-হিং করে হাসত।

জঙ্গলঝোরা থেকে মাইল তিনেক হাঁটলে একটা বড় রাস্তা পাওয়া যায়। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে দার্জিলিঙে—বাসও পাওয়া যায় এখান থেকে। কুট্টি-মামাকে বাগানের ফুট-ফরমাশ খাটবার জন্যে প্রায়ই দার্জিলিঙে যেতে হত।

সেদিনও মামা দার্জিলিঙ থেকে বাজার নিয়ে ফিরছিল। কাঁধে একটা বস্তায় সের তিনেক শুট্‌কি মাছ, হাতে একরাশ জিনিসপত্তর। কিন্তু বাস থেকে নেমেই মামার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

প্রথম কারণ, সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এসেছে—সামনে তিন মাইল পাহাড়ী রাস্তা। এই তিন মাইলের দু মাইলই আবার ঘন জঙ্গল। দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুস্থানী চাকর রামভরসার বাস স্ট্যাণ্ডে লণ্ঠন নিয়ে আসার কথা ছিল, সেও আসেনি। মামা একটু ফাঁপরেই পড়ে গেল বই কি।

কিন্তু আমার মামা গজগোবিন্দ হালদার অত সহজেই দমবার পাত্র নন। শুট্‌কি মাছের বস্তা কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে মামা হাঁটতে শুরু করে দিলে। মামার আবার আফিং খাওয়ার অভ্যেস ছিল, তারই একটা গুলি মুখে পুরে দিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পথ চলতে লাগল।

দু' ধারে পাইনের নিবিড় জঙ্গল আরো কালো হয়ে গেছে অন্ধকারে। রাশি রাশি ফার্ণের ভেতরে ভূতের হাজার হাজার চোখের মতো জোনাক জ্বলছে। ঝিং-ঝিং করে ঝিঁঝির ডাক উঠছে। নিজের মনে রামপ্রসাদী সুরে গাইতে গাইতে কুট্টিমামা পথ চলেছে:

'নেচে নেচে আয় মা কালী
আমি যে তোর সঙ্গে যাব—

তুই খাবি মা পাঁটার মুড়ো
আমি যে তোর প্রসাদ পাব!'

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছিল তখন। হঠাৎ মামার চোখে পড়ল, কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা লোক সেই বনের ভেতরে বসে কোঁ কোঁ করছে।

আর কে! ওটা নির্ঘাৎ রামভরসা।

রামভরসার ম্যালেরিয়া ছিল। যখন-তখন যেখানে-সেখানে জ্বর এসে পড়ত। কিন্তু ওষুধ খেত না—এমন কি, এই কুইনিনের দেশে এসেও তার রোগ সারাবার ইচ্ছে ছিল না। রামভরসা তার ম্যালেরিয়াকে বড্ড ভালোবাসত। বলত, উ আমার বাপ-দাদার ব্যারাম আছেন। ওকে তাড়াইতে হামার মায়া লাগে।

কুট্টিমামার মেজাজ যদিও আফিংয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল, তবু রামভরসাকে দেখে চিনতে দেরি হল না। রেগে বললে, তোকে না আমি বাস্ স্ট্যাণ্ডে যেতে বলেছিলুম? আর তুই এই জঙ্গলের মধ্যে বসে কোঁ কোঁ করছিস্? নে—চল্—

গোঁ গোঁ আওয়াজ করে রামভরসা উঠে দাঁড়াল।

কুট্টিমামা নাক কুঁচকে বললে, ইঃ, গায়ের কম্বলটা দেখো একবার! কী বদখৎ গন্ধ! কোনোদিন ধুসনি বুঝি? শেষে যে উকুন হবে ওতে। নে—চল্ ব্যাটা গাড়োল! আর এই শুঁট্কি মাছের পুঁটুলিটাও নে, তুই থাকতে ওটা আমি বয়ে বেড়াব নাকি?

এই বলে মামা পুঁটলিটা এগিয়ে দিলে রামভরসার দিকে।

—এঃ হাত তো নয়, যেন নুলো বের করছে! থাক্, ওতেই হবে।—মামা রামভরসার হাতে পুঁটলিটা গুঁজে দিলে জোর করে।

রামভরসা বললে, গোঁ—গোঁ—ঘোঁক্!

—ইস্-স্! সাহেবদের সঙ্গে থেকে খুব যে সায়েবী বুলি শিখেছিস দেখছি! চল্—এবার বাসাতে ফিরে কুইনিন ইন্‌জেকশন দিয়ে তোর ম্যালেরিয়া তাড়াব। দেখব কেমন সায়েব হয়েছিস তুই।

রামভরসা বললে, ঘুঁক্ ঘুঁক্।

—ঘুঁক্ ঘুঁক্? বাংলা-হিন্দী বলতে বুঝি আর ইচ্ছে করে না? চল্—পা চালা—

কুট্টিমামা আগে আগে, পিছে পিছে শুঁটকি মাছের পুঁটলি নিয়ে রামভরসা। মামা একবার পেছনে তাকিয়ে দেখলে কেমন থপাস্ থপাস্ হাঁটছে রামভরসা।

—ওঃ—খুব যে কায়দা করে হাঁটছিস! যেন বুট পরে বড় সায়েব হাঁটছেন। রামভরসা বললে, ঘঁচাৎ!